জিজ্ঞাসা

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কলিকাতা
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত

১৩১১

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল। কয়েকটি প্রবন্ধের প্রচুর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। 'আত্মার অবিনাশিতা,' 'মাধ্যাকর্ষণ' 'মাক্সওয়েলের ভূত' 'প্রকৃতি-পূজা' এই চারিটি প্রবন্ধের নামেরও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে জ্ঞানিসমাজ যে সকল জাগতিক তথ্য নিরূপণের জন্য ব্যাকুল, তন্মধ্যে কতিপয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য বিষয় বিতণ্ডার ক্ষেত্র। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মত সঙ্কলনে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে ঐ সকল দুরূহ তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসামাত্র।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে বাহির হইয়াছিল। একই বিষয়ের আলোচনা ঘটায় বহুস্থলে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। তাহার পরিহারের উপায় দেখি নাই।

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা করি, সেই সূত্রের অনেক স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের দশ-বৎসর-ব্যাপী আলোচনায় লেখকের মতের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট অনুকম্পা প্রার্থনা করি।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩১০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

উৎসর্গ

দেব গোবিন্দসুন্দর,

পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে ; ভাগ্যহীন পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য অপেক্ষা কর নাই।

বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসারক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে ; কোটি মানবের হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া প্রবন্ধের ব্যাকের ত্রাস জন্মাইতেছে। যে দীপবর্ত্তিকা একমাত্র পথপ্রদর্শক সম্ভব, কোন্ বিধাতার দারুণ বিধি তাহা অকালে নির্ব্বাপিত করিল!

ভয় নাই, ভয় নাই ;—যে স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বচন যাত্রারম্ভে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি-প্রেরিত প্রতিধ্বনি আজিকার দিনে অভয়বাণীর কার্য্য করিবে।

ভয় নাই, ভয় নাই ;—কোন্ অদৃশ্য হস্ত কোথায় রহিয়া মঙ্গলময় লক্ষ্য দেশের নির্দ্দেশ করিতেছে ; তাহার অঙ্গুলিস্পর্শ এই অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্ত্তসঙ্কুল জগৎপ্রবাহের উপরি স্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি ; জগন্নিয়ন্তার কোন নিয়মে তাহা স্বকার্য্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝিলাম না।

মহাবাহো, তোমার উদ্ধত বাহুদ্বয় কোন্ ঊর্দ্ধদেশের অভিমুখে প্রসারিত ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে

না। আমার পূর্ব্ব-পিতামহ সূরিগণ দিব্যনেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেন, তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্।

জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্ত্তিভেদ। ত্বৎপ্রদত্ত সম্বল আজি ত্বদীয় চরণোপান্তে উৎসর্গ করিলাম।

পুত্র

শ্রীগ্রন্থকার

সূচী

জিজ্ঞাসা

সত্য

যে সকল জাগতিক ব্যাপারকে আমরা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সত্য নাম সর্ব্বত্র উপযুক্ত কি না, বিচার করিয়া দেখিলে অনেক স্থলেই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে আমরা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ সত্য বা পূর্ণ ধ্রুব সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা বিচারে সাপেক্ষ সত্যের, অপূর্ণ অধ্রুব সত্যের স্বরূপে প্রকাশ পায়। যাহাকে সনাতন সার্ব্বভৌমিক সত্যরূপে অকুণ্ঠিত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহার সত্যভাব সঙ্কীর্ণ-দেশব্যাপী অথবা সঙ্কীর্ণ-কাল-ব্যাপী দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে কোন্ ব্যাপারকে সত্য বলিব, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। সত্যের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই বোধ করি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই। শ্রীযুক্ত হর্বট স্পেন্সর প্রচলিত সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কোনটিই বিচারমুখে দাঁড়ায় না। স্পেন্সর নিজেও সত্যের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমরা যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না, তাহাই সত্য। যেমন কালের আরম্ভ ও আকাশের সীমা। কালের আরম্ভ আমাদের কল্পনায় আইসে না; আকাশের পরিধি আছে, তাহাও আমাদের কল্পনার অগোচর। সুতরাং কালের অনাদিতা ও আকাশের অসীমতা, এই দুইটী স্পেন্সরের সংজ্ঞামতে সত্য। আবার জড়ের সৃষ্টি

ও শক্তির নাশ, এই দুইটাও ঐ হিসাবে সত্য। দর্শন-শাস্ত্রে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না—অস হইতে সৎ জন্মে না ; জড় ও শক্তির অনাদিতা ও অনন্ততা, এই ব্যাপকত সত্যের অন্তর্গত। মোটের উপর 'কিছু-না' হইতে ইহাদের উৎপত্তি এবং 'কিছু-না'তে ইহাদের লয় আমাদের ধারণায় আইসে না ; সুতরা উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

আমাদের কল্পনায় আসে না, আমরা ধারণা করিতে পারি না,—এ বাক্যেই গোল থাকিল। যাহা আমাদের কল্পনায় আসে না, তাহ অন্যের কল্পনায় আসিতে পারে। আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি না আর কেহ যে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং যাহা আমাদের নিকট সত্য, তাহা সচ্ছন্দে অন্যের নিকট অসত্য হইতে পারে ; তাহাকে পূর্ণ সত্য, নিরপেক্ষ সত্য, এরূপে নির্দ্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের সীমা ছাড়িয়া যাইতে হয়। আকাশের সসীমতা আমরা কল্পনা করিতে পারি না ; হয় ত এমন জীব আছে, যাহাদের মানসিক বৃত্তি আমাদের অপেক্ষা পূর্ণ, তাহারা আকাশের অবধি কল্পনা করিতে সমর্থ ; শুধু র্থ কেন, হয়ত আমাদের কল্পিত অসীম আকাশকে তাহারা স্পষ্টই দ্ধ দেখিতে পায়। এরূপ জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু জ্ঞান লইয়া আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, এরূপ মান নাই। হেলমহোল্‌ৎজ্‌ ক্লিফোর্ড প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এইরূপ অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেখাইয়াছেন যে, বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকেও পূর্ণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে রী নহি।

ত্য অর্থে আমাদের পক্ষে সত্য ; নিরপেক্ষ নহে—
হে—আংশিক ; সার্ব্বভৌমিক নহে—প্রাদেশিক ;

সনাতন নহে—তাৎকালিক। স্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংজ্ঞাও বিচারের ধাক্কায় খণ্ডিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়।

আর একটা ব্যাপার বহুদিন হইতে এইরূপে সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহাকে ইংরাজিতে বলে Uniformity of Nature; বাঙ্গালায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি চিরদিন একই নিয়মে কাজ করে;—প্রকৃতির খেয়াল নাই। অর্থাৎ, অতিপ্রাকৃত ঘটনা,—যাহাকে ইংরাজিতে miracle বলে,—প্রকৃতিতে কোথাও তাহার স্থান নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহা লইয়া তর্কসংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছে; শীঘ্র যে সেই সংগ্রাম নিরস্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে মিরাকল শব্দের অর্থটা স্পষ্ট সম্মুখে রাখিলে, বিবাদের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসে। অসাধারণ ঘটনামাত্রই অতিপ্রাকৃত নহে, মিরাকল নহে। তাহা হইলে ফারাদে ও ক্রুক্‌স্‌, অথবা নিকলা তেস্‌লার আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলার ন্যায় অবিশ্বাস্য মিরাকল উহাদের আবিষ্কারকালে কিছুই ছিল না। সুতরাং অতিপ্রাকৃত অর্থে অসাধারণ নহে; অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী বা বিরুদ্ধচারী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অপূর্ণ, এবং চিরকাল অতি অপূর্ণই রহিবে। জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত আলোকিত প্রদেশের অপেক্ষা পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের প্রসার চিরদিনই অধিক থাকিবে। সুতরাং, এই ব্যাপার প্রাকৃত নিয়মের বহির্ভূত, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন কুলাইবে বোধ হয় না। এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রাকৃত, এরূপ নির্দ্দেশ কখনই চলিবে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ অসাধারণ, অপরিচিত, নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে তাহা সাধারণ, পরিচিত, নিয়মানুযায়ী স্বরূপে প্রকাশিত হইবে। আমাদের সঙ্কীর্ণবুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে,

প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হইলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। নিয়ম এই ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, ঐ ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু তাহার মীমাংসায় উপনীত হইবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই পর্য্যন্ত বলেন,—কালে প্রতিপন্ন হইবে, প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না। অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই, মিরাকলের স্থান নাই। প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে। প্রকৃতির চপলতা নাই;—ইহা একটা সত্য।

ফলে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা—নেচারে ইউনিফর্‌মিটি—একটা সত্য। এবং অতিপ্রাকৃতের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি সচরাচর যে আক্রমণ হয়, তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না। অভিনব অদ্ভুত ঘটনা, যাহাতে মানুষে বিশ্বাস করিতে চায় না, যাহা পূর্ব্বে কখন ঘটিতে দেখা যায় নাই, তাহা অলীক ও অমূলক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে প্রাকৃত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হয় না। কোন্ নিয়মের অনুযায়ী, তাহা শীঘ্র বাহির হইতে না পারে; কিন্তু কালে বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভূয়োদর্শন এইরূপ বলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতি পত্রে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সুতরাং প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা সত্য। কিন্তু কেমন সত্য? প্রকৃতিতে নিয়ম আছে, খেয়াল নাই। কে বলিল? ভূয়োদর্শন বলিয়াছে। নিয়মের লঙ্ঘন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সূর্য্য একই নিয়মে ঘুরিতেছে; নদী একই নিয়মে চলিতেছে; বায়ু একই নিয়মে বহিতেছে। আবার, প্রাচীন জ্যোতির্বিদের পরিচিত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি যে নিয়মে এতকাল চলিতেছিল, সেই নিয়মের হিসাবেই হালীর ধূমকেতু ঘুরিয়া আসিয়াছিল ও নেপচুনের অস্তিত্ব বাহির হইয়াছিল।

ভূয়োদর্শন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্য্য চলিতেছে,

হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ঠিক্ সেই নিয়মে চলিয়াছিল। আবার হাজার বৎসর পরে কেমন চলিবে, তাহাও আমরা গণিয়া বলিতে পারি। গণনা ও ঘটনা উভয়ে মিল ভিন্ন অমিল কখনও দেখা যায় নাই।

কিন্তু একটা কথা আছে; ভূয়োদর্শন, ভূয়োদর্শনমাত্র। ভূয়ঃ শব্দের অর্থে ভূয়ঃ; চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহুদেশ ব্যাপিয়া দর্শন; কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। এবং চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র! উভয়ের তুলনা হয় না।

মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা লক্ষ বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোষ্ট্রখণ্ডে আছে, তাহাই চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্চরের মেখলাতে আছে ও বরুণ গ্রহের পার্শ্বচরে আছে, লুব্ধক তারকা ও তাহার সহচরে আছে; কিন্তু সর্ব্বত্র আছে কে বলিল? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি ততদূর বিস্তৃত নহে; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্ব্বভৌমিকত্বরূপ বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র।

সূর্য্য আজ যেমন উঠিয়াছে, কাল তেমনই উঠিয়াছিল, পরশু তেমনি উঠিয়াছিল, আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তেমনি ভাবে উঠিতেছে, তোমার জীবনের আশী বৎসরেও সেই নিয়মে উঠিয়া আসিতেছে; এবং মানব জীবনের গত অযুত বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের গত লক্ষাধিক বৎসরও সেই এক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই দেখিয়া সাহস করিয়া বলিয়া থাকি, কালও সূর্য্য এই নিয়মে উঠিবে; দশ বৎসর, শত বৎসর, কি সহস্র বৎসর পরেও সেই নিয়মে উঠিবে। ইহারই নাম গণনা। গণনাও এ পর্য্যন্ত কখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় নাই। তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস। এ পর্য্যন্ত যত মানুষ জন্মিয়াছে,

তাহার অধিকাংশই মরিয়াছে। কাল পর্য্যন্ত যাহারা ছিল, তাহাদের অনেকে আজ নাই। তাই গণনা করিয়া বলি, আমি মরিব, তুমি মরিবে, যাহারা এখন আছে তাহারা সকলেই মরিবে, যাহারা জন্মিবে তাহারাও মরিবে। সাহসের সহিত আমরা গণিয়া বলি; গণনাও সফল হয়; তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এই সাহসের মাত্রা সময়ে সময়ে কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। দুঃসাহস অনেক সময় বিপদের মূল হইয়া দাঁড়ায়। নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বতের পাদদেশে অতিবিশ্বাসী মানুষ ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; একদিন অকস্মাৎ অগ্নিগিরি অগ্ন্যুদ্গার করিয়া ধ্বংস-কার্য্য সমাধানের পর তাহার অন্যায় সাহসের প্রতিফল দেয়। এখানে মানুষ তাহার ভূয়োদর্শন কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আমাদের ভূয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? কে বলিল, জগদ্-যন্ত্র গত শত বৎসর যাবৎ যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? সূর্য্য এত কাল যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সকলে মরিয়াছে বলিয়া আমাকেও মরিতে হইবে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সূর্য্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবতঃ আমাকেও মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় আছে। নিয়মের শিকল পর মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; আজ যাহা নিয়ম, কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে।

উত্তরে বলিতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব প্রতিপন্ন হইল না। ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ীর চাকায় মরিচা ধরিয়া চাকা থামিতে পারে, যে নিয়মে ঘড়ীর কাঁটা চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ রহিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল না। একটা সঙ্কীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাড়িয়া আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের বন্ধন

উপস্থিত হইল মাত্র। জগদ্-যন্ত্রকে এইরূপে ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত ঘটিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জগদ্-যন্ত্র আপাততঃ বিকল বোধ হইলেও বস্তুতঃ নিয়মের অধীনতা এড়াইতে পারে না। আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হয় মাত্র।

আমরাও বলিতেছি তাহাই। আমাদের ভূয়োদর্শন কেবল সঙ্কীর্ণ-দেশব্যাপক, সঙ্কীর্ণকালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায়। তদপেক্ষা ব্যাপকতর নিয়ম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎসম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কিছুই বলিতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে আমরা সাহসের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন পারি না, তখন গণনামাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনিশ্চিত না হইয়া পারে না। তবেই দেখা গেল, প্রকৃতি যে চিরকালই আমাদের বর্ত্তমান-জ্ঞানানুমত প্রচলিত পরিচিত নিয়মে চলিবে এরূপ বলিবার আমাদের অধিকার নাই।

প্রকৃতির কিয়দংশ চিরকাল গণনার বাহিরে থাকিবে; আমাদের গণনা সময়ে সময়ে ব্যর্থ হইবে। তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত পদ্ধতি দূষিত? বলা বাহুল্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতায় বিশ্বাস রাখিয়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার সমুদয় ভবিষ্যৎ গণনা সম্পাদন করেন। এই সত্য যদি অমূলক হয়, তবে বিজ্ঞানের কোন গণনাতেই বিশ্বাস স্থাপন চলে না। বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে।

আমরা ততদূর বলি না। কালের আদি নাই, আকাশের সীমা নাই, জড়ের বিনাশ নাই, শক্তির সৃষ্টি নাই, এই কথাগুলাও যেমন এক হিসাবে সত্য; প্রাকৃত নিয়মের ব্যত্যয় হয় না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে সত্য।

পরন্তু, বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত প্রণালী ও সাধারণ মানুষের জীবন-

যাত্রার প্রণালী মূলতঃ পৃথক নহে। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লই, না মানিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলে না। যিনি মানেন, তিনি জিতেন; যিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া যান। অনাগতবিধাতা ও যদ্ভবিষ্যের গল্প উপকথামাত্র নহে। জীবনসংগ্রামে অনাগতবিধাতার জয়, যদ্ভবিষ্যের অকালমরণ। মুখে যাহাই বলি, কার্য্যে আমরা প্রকৃতির চপলতায় বিশ্বাস করি না। নিশান্তে যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চিত জানিয়া আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বদিন হইতে করিয়া রাখি। হেমন্তে ফশল পাকিবে জানিয়া বর্ষারম্ভে চাষা ধান্য রোপণ করে। চিত্রগুপ্তের তলপ অনিবার্য্য জানিয়া জীবনবীমার টাকা দিয়া থাকি। প্রকৃতিকে চপল জানিলে কোন চেষ্টার দরকার হইত না। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস না থাকিলে এতদিন মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখিয়া ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত।

প্রকৃতির শাসন কঠোর শাসন। নিয়মে বিশ্বাস কর,—প্রকৃতির আদেশ। বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই। নিয়ম পালন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। মানবজাতি পণ্ডিতমূর্খনির্ব্বিশেষে মোটের উপর নিয়ম পালন করিতেছে; তাই এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায় জল উঁচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ প্রাণের দায়ে ইহাকেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনরক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, আত্মহত্যা যদি অকর্ত্তব্য হয়, ইহাও তবে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।

জগতে যতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা সত্য সকলের উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই।

জীবনযাত্রার আরম্ভ ইহাতেই বিশ্বাসে। এবং এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আরও কতকগুলা সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না, বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহারই নাম সত্য।

স্পেন্সরের প্রদত্ত সত্যের সংজ্ঞা অপেক্ষা এই সংজ্ঞাটা একটু ব্যাপকতর। তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই। জগদ্‌যন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য। মনে করিতে গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়।

মানবজীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ। মানবকে বাঁচিতে হয়, সেই জন্যই এটা সত্য, ওটা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মানবজীবনের বাহিরে সত্য নাই, মিথ্যা নাই। কি আছে বলা যায় না।

পাঠক যদি মনে করেন, সত্যের গৌরব লঘূকৃত হইল, তাহা হইলে উপায় নাই।

জগতের অস্তিত্ব

তর্কশাস্ত্রে লাঠির যুক্তি নামে একটা অমোঘ বিচারপ্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই এই কার্য্যের দ্বারা জগতে প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অতএব খ্রীষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; এইরূপে বিচার করিতে গেলে বিস্তর শ্রম স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, নতুবা লাঠি—এই প্রবল ন্যায়ের নিকট সকলকেই মাথা নোয়াইতে হয়; এবং বলা বাহুল্য খ্রীষ্টানেরা এই সংক্ষিপ্ত যুক্তিরই সবিশেষ পক্ষপাতী। শুনা যায় এই পরাক্রান্ত যুক্তিবলে প্রোটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিকের জীবন্তদেহের চিতাগ্নির আলোকে ইউরোপের তামসযুগের আঁধার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এই প্রচণ্ড যুক্তির সাহায্যে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ব্বরজাতির কঙ্কালাস্তীর্ণ অরণ্যভূমিতে ও মরুপ্রদেশে খ্রীষ্টপ্রচারিত মানব-প্রেমের বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত হইতেছে।

শুধু মানুষের অপবাদ দেওয়া যায় না। প্রকৃতি-মাতা স্বয়ং তাঁহার যত্নপালিত ক্ষীণকায় মানবসন্তানগুলির প্রতি এই কঠোর যুক্তির প্রয়োগে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহার কঠোর শাসনে আমাদিগকে এমন অনেকগুলি কথা মানিয়া লইতে হয়, যাহা অন্যরূপ বিচারপ্রণালীর সম্মুখে টিকে কি না সন্দেহ। সত্য বলিয়া স্বীকার কর, নতুবা জীবন-যাত্রা চলে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলের প্রবল অনুযোগ সত্ত্বেও ডারুইনের সময় হইতে জীবিকার ও জীবিকার মুখ্যসাধন উদরতর্পণের মাহাত্ম্য সহস্রগুণে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। জীব-জগতের সমুদয় অভিব্যক্তি স্থূলতঃ এই একমাত্র ব্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া আসিয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতেও সেই উদরপূরণের ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগিতার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। যাহা না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না, তাহাই সত্য, এইরূপে সত্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে আজিকালি কেহ কেহ সাহসী হইতেছেন। আজিকালি মাত্র; কেননা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিলে খ্রীষ্টানযাজকশাসিত নব জেরুসালেমে নির্দ্দেশকারীর জীবনযাত্রা বর্দ্ধিত না হইয়া সংক্ষিপ্ত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল।

যাহা হউক, সত্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিলে একটা কঠিন সমস্যার একরকম মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। সমস্যা আর কিছু নহে, জগতের অস্তিত্ব। সাধারণ মানবগণ অন্নপানাদির আহরণে এত নিবিষ্ট ভাবে ব্যাপৃত আছে যে, জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাহাদের মনোমধ্যে কস্মিন্ কালে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় না। কিন্তু কতকগুলি অতিবুদ্ধি লোকের আহারনিদ্রাদি অবশ্যকর্ত্তব্য যথাবিধানে সম্পাদন

করিয়াও এত অবকাশ অবশিষ্ট থাকে যে, জঠরজ্বালারূপ তীব্রানুভব জাগতিক ব্যাপার বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাঁহারা জগতের অস্তিত্বটা একবারে লোপ করিতে বসেন। প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ যে, সেই মার্গ ধরিয়া একটা স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য; অন্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা একবারে কাল্পনিক। প্রচলিত বিচারপ্রণালী উভয়বিধ সিদ্ধান্তেই নিরীহ মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান, বড় ভরসার স্থল নহে। বোধ করি, সেই জন্যই নিরাশ মনে লাঠির যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

যদি জগৎ থাকে, তবে উহার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এ কথাটারও আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আত্মা, জড়, শক্তি, গতি, বল প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের এমনি একটা স্তূপ আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে যে, মানুষকে পথহারা ও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন জগৎ এক, কেহ বলেন দুই। অপরে সংখ্যার এতাদৃশ স্বল্পতায় সন্তুষ্ট নহেন। কেহ বলেন জগৎ অনাদি, নিত্য; কেহ বলেন সাদি, সৃষ্ট। কাহারও মতে জগতের অস্তিত্ব আমার মনের সহব্যাপী। আমি যত দিন, জগৎও তত দিন। আবার অন্যের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ এই দুইটা কথার কথা। অতীত বর্ত্তমানকে নিয়মিত করে; বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া চলে; অতএব তিনই যুগপৎ বর্ত্তমান। দুই বৎসর হইল ব্রিটিশ এসোশিয়েশনের সম্মুখে অধ্যাপক লজ্ এইরূপ একটা আজগুবি কথার প্রবর্ত্তনা করেন। কেহ বলেন জগতের স্রোত একটানে নিরবচ্ছেদে বহিয়া আসিতেছে; আবার কাহারও মতে সেই স্রোত একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটানা প্রবাহ নহে। জোনাকি পোকার আলোকের মত, মনুষ্য হৃদয়ের স্পন্দনের মত, সেই স্রোত এই আছে,

এই নাই, এই আছে, এই নাই, এইরূপ করিয়া ক্ষণিক অস্তিত্ব ও ক্ষণিক নাস্তিত্বের পরম্পরামতে বহিয়া যাইতেছে। বায়োস্কোপের ছবি যেমন দ্রুতগতি পর পর বদলাইয়া যায়, দুইখানা ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝা যায় না; তেমনি জগতের দৃশ্যপট এত দ্রুতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, দৃষ্টি-ভ্রান্ত মানুষ মাঝের নাস্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের পাইতেছে না। যাহাই হউক, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের মূলে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইহাদিগকে টানিয়া আনার দরকার নাই।

জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইটা অংশ পাওয়া যায়। প্রথম আমি, ও দ্বিতীয় আমা-ছাড়া, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর যা কিছু আছে। "আমি" শব্দের অর্থ এস্থলে ঠিক্ সেই হস্ত-পদ-যুক্ত শরীরী জীব নহে, যাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্ত-মান। "আমি" শব্দের অর্থ এখানে আমার সেই ভাগ, যাহা অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে। অনুভূতি, চিন্তা, কামনা ইহাদের সমবায় ও পরম্পরাকে যদি চৈতন্য বলা যায়, তবে আমি অর্থে আমার চৈতন্যমাত্র। "আমা-ছাড়া"র অর্থ আমার চৈতন্য বাদ দিয়া জগতের বাকী সমগ্রটা, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার অনুভূতির বিষয়, আমার চিন্তার উদ্বোধক, আমার ইচ্ছার প্রয়োগক্ষেত্র: এই অর্থে বাহিরের জড় জগৎ ব্যতীত তুমি ও তোমার চৈতন্য এবং আমার ভৌতিক শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহিরে। জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব ও আমার বহিঃস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই দুই বুঝিতে হইবে।

প্রথম, আমার অস্তিত্ব। এই বিষয়টাতে দুই মত হইবার বড় উপায় নাই। কেন না, আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহা

অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অপর যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। পাঠকের দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমার বড় সংশয় নাই; নতুবা এই খানেই লেখনীকে বিরাম দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইতাম।

তার পর বাহিরের, অর্থাৎ আমা-ছাড়া জগতের কথা। এইখানেই যত গণ্ডগোল।

আপাততঃ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম। বাহিরের সহিত আমার সংস্পর্শে আমার জীবন। পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের কথা লইয়া জীবনের কাহিনী। যেখানে পরস্পর প্রতিঘাতের শেষ, সেইখানে জীবলীলার অবসান। বহির্জগতের খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, ইন্দ্রিয়গোচর। খানিকটা অনুমানগোচর। তোমার ভৌতিক শরীর আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, তোমার চৈতন্য আমার অনুমানগোচর। প্রত্যক্ষ ভাগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংস্পর্শ। সেই সংস্পর্শ হইতে তোমার অনুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তুমিটার অস্তিত্ব আমি টানিয়া লই। কিন্তু সংস্পর্শ বলিলে ভুল হয়। উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান যে, স্পর্শ বলিলে অভিধানের প্রতি বিশেষ অবিচার হয়। আমি তোমাকে কখন ছুঁই না; তোমার সাধ্য নাই যে আমাকে স্পর্শ করিতে পার; কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া আমি কারবার করি। সঙ্কেতগুলা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়। সঙ্কেতগুলা কোনরূপে তোমার নিকট হইতে আসিয়া আমার নিকট পৌঁছে। কিন্তু সেই সঙ্কেতের সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য নাই। টেলিগ্রাফের কেরাণী কাঁটার আক্ষেপ দেখিয়া স্থির করেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট বসিয়াছে। শাদা কাগজে কালির আঁচর দেখিয়া আমরা নিউটনের চিন্তাপরম্পরা বুঝিয়া লই। কিন্তু কাঁটার আন্দোলনের সহিত পার্লেমেণ্টের, অথবা ছাপা হরপের সহিত নিউটনের চিন্তাপ্রণালীর যে সাদৃশ্য, তোমার সহিত তোমার রূপরসগন্ধাদির সাদৃশ্য

তার চেয়েও কম। তোমার শরীর হইতে চারিদিকে আকাশে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কা আসিয়া চক্ষুর পটে লাগে। স্নায়ুযোগে সেই ধাক্কা মস্তিষ্কে নীত হইয়া মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে বিশেষ একরকম আন্দোলন উপস্থিত করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার রূপবিষয়ে আমার অনুভূতি জন্মে। আকাশের ধাক্কা মস্তিষ্কে পৌঁছান পর্য্যন্ত একরকম বুঝা যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের আন্দোলনের সঙ্গে রূপানুভূতির সম্বন্ধ ভাল বুঝা যায় না। সাদৃশ্য ত কিছুই নাই; সম্বন্ধ একটা আছে, সাহচর্য্য ও পারম্পর্য্য লইয়া। এই সম্বন্ধ লইয়া সঙ্কেত। যখনই সেইরূপ আন্দোলন, তখনই সেইরূপ অনুভূতি। তাই যখনই সেই অনুভূতি জন্মে, তখনি তার কারণস্বরূপ তোমার অস্তিত্ব অনুমান করি। অনুভূতিটা আমার অংশ, আমার চৈতন্যের এক কণিকা, চৈতন্য-প্রবাহের একটি ঢেউ; সুতরাং সত্য। তোমার অস্তিত্ব আমার অনুমান, আমার বুদ্ধিশক্তির একটা কারিগরি, একটা সৃষ্টি, একটা কল্পনা। এই কল্পনাটাতে আমার দৈনিক কাজকর্ম্ম চলিয়া যায়; তার উপর ভর করিয়া আমার জীবনের দৈনিক আয় ব্যয়ের বজেট তৈয়ার করি; সাবধান হইয়া চলিলে জীবনযাত্রা বেশ একরকম চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঠেকিতে হয়, প্রতারিত হইতে হয়। তখন ফাজিল অঙ্ক আসিয়া পড়ে। চিরজীবনটা সঙ্কেতের উপর ভর করিয়া চালাইয়া থাকি। সঙ্কেত লইয়া কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়। টেলিগ্রাফের কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন। কাঁটা নড়িল, সঙ্কেত পাওয়া গেল; কেরাণী মহাশয় সঙ্কেত পাঠ করিয়া একটা সংবাদও খাড়া করিলেন; কিন্তু তার মূলে সত্য নাই। পরে প্রকাশ হইল যে ঐরূপ সংবাদ কেহ পাঠায় নাই। বিশ্বাসঘাতী কাঁটা আপনা হইতে নড়িয়াছে। সেইরূপ রূপানুভূতি হইতে আমরা রূপবানের অস্তিত্ব অনুমান করি। কিন্তু এমনও ঘটিয়া থাকে যে রূপানুভূতি ঘটিল, কিন্তু রূপবান্ নাই।

মস্তিষ্কের ভিতরে আন্দোলন আপনা হইতেই সময়ে সময়ে ঘটে; রূপানুভূতি জন্মে, কিন্তু মস্তিষ্কের বাহিরে কোন রূপবান্ নাই। এইরূপে ভূতের গল্পের সৃষ্টি হয়। সাপ দেখিতেছি বলিলেই নিশ্চয় একটা সাপ বাহিরে আছে, তাহা সকল সময়ে বলা যায় না। স্বপ্নে আমরা এইরূপ যথাগত সঙ্কেত ও অনুভূতি লইয়া প্রকাণ্ড একটা ক্রীড়াময় জগৎ নির্ম্মাণ করি। স্মৃতি নামক মানসিক ব্যাপারের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা এইরূপ। অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে জ্ঞানবিভ্রাট, যত ইলিউশন্ বা হালুসিনেশন্ আছে, সকলেরই এই ব্যাখ্যা। হিপ্‌নটিক রোগীকে যাহা দেখিতে বলা যায়, বিনা ওজরে সে তাহাই দেখে। বিশ্বামিত্র ঋষি বহু আয়াসে নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আফিমের মাহাত্ম্য জানিতেন না, তাই তাঁহার এত তপস্যা; কিঞ্চিৎ মর্ফিয়া সাহায্যে তিনি বিনায়াসে বৃহত্তর জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন।

রূপানুভূতি সম্বন্ধে যাহা, অন্যান্য অনুভূতির সম্বন্ধেও তাহাই। সর্ব্বত্রই সঙ্কেত লইয়া কারবার। অনুভূতিগুলা আমাদের, সেগুলা সত্য পদার্থ; তাহাদের অস্তিত্বে সংশয় করিবার উপায় নাই, পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু তাহাদের কারণস্বরূপে অনুমিত বুদ্ধিসৃষ্ট বাহ্য জগৎ আমাদের কল্পিত, অর্থাৎ রচিত। সেই কল্পনায় ভর করিয়া চলিলে জীবনযাত্রা বেশ চলে দেখা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঠকিতে হয়। কেন চলে সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ মায়াজগৎ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে মানবচৈতন্যকে যথেচ্ছ-বিহারী দেখিয়া প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে কথা না তোলাই ভাল। স্থূল কথা এই, বাহ্য জগৎ যদি থাকে, তাহাকে আমি, অর্থাৎ আমার চৈতন্য, স্পর্শ করিতে অক্ষম। স্পর্শ করিতে যখন অক্ষম, তখন জোর করিয়া বলিতে পারি না, যে বাহ্য জগৎ আছে। বাহ্য জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত আমার মস্তিষ্ক নামক বস্তুর কল্পনা করি, এবং কল্পিত বাহ্যজগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মস্তিষ্কে

আন্দোলন কল্পনা করিয়া সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাহ্যজগৎকে আমি স্পর্শ করিতে পারি না; আমার কল্পিত মস্তিষ্কমাত্র কল্পিতস্নায়ুসূত্রযোগে কল্পিত বাহ্যজগৎকে স্পর্শ করে; অথচ বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করি; ব্যাখ্যার আবশ্যকতা, তাই সঙ্কেত থিওরি দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া লই। আমার মস্তিষ্ক আমার অংশ নহে; সেটা ভৌতিক প্রত্যক্ষ বিষয়, আমার চৈতন্যের বাহির; সুতরাং উহা বাহিঃস্থ আমা-ছাড়া জগতের অন্তর্ভুক্ত। মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি বা চৈতন্য জন্মে, তাহার ব্যাখ্যা নাই। শর্করায় পরমাণুসমাবেশের ব্যতিক্রমে মাদকতা ধর্ম্ম জন্মে; সেইরূপ জীবশরীরে পরমাণুসমাবেশের ব্যতিক্রমে চৈতন্য ধর্ম্ম জন্মে; এইরূপ যে একটা ব্যাখ্যা আছে, তাহা অশ্রদ্ধেয়। শর্করা ও শর্করার ধর্ম্ম উভয়ই আমা-ছাড়া, সুতরাং এক হিসাবে সজাতীয়। আমার মস্তিষ্ক আমার বাহিরে; কিন্তু আমার অনুভব, আমার চৈতন্য, আমার মধ্যে; সুতরাং এই হিসাবে বিজাতীয়। কাজেই এ যুক্তি টিকে না; একের সহিত অন্যের তুলনা হয় না।

বাহ্য জগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এবং মানুষমাত্রেই এক একটি সনাতন আফিমখোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। কথাটা শুনিতে ভাল লাগে না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার স্মারবত্তা ভাল বুঝা যায় না। আমি যদি বলি, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে আমার কথাটা কেহ উলটাইতে পারে না। স্বপ্ন কতকগুলি অনুভূতির সমবায় ও পরম্পরা মাত্র; জগৎও তেমনি কতকগুলি অনুভূতির সমবায় ও পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়ে প্রকৃতিগত কোনও তফাত দেখি না। আমি উভয়ত্রই বর্ত্তমান; বাহ্য জগৎ,—আমার বাহিরে আমার চৈতন্যের বিষয়ীভূত একটা কিছু, উভয়ত্র বর্ত্তমান। তবে স্বপ্নটা অলীক আর জগৎব্যাপারটা প্রকৃত কিসে

হইল ? বলিতে পার স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই, আর প্রত্যক্ষ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যক্ষ জগতে সমস্ত ঘটনাগুলি অবিরোধে একটা কাহিনী বা প্লটের স্বরূপে একটা উদ্দেশ্যের দিকে চলিতেছে, আর স্বপ্নে সমুদয় ঘটনাই পরস্পর অসঙ্গত। কিন্তু স্বপ্নে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তাহা আমরা সুপ্ত অবস্থায় কিছুতেই বুঝিতে পারি না ; তখন একটা বিচিত্র সুসঙ্গত অভিনয়, বিচিত্র প্লটই দেখিতে পাই। জীবন যদি স্বপ্নাবস্থা হয়, তবে জীবন সত্ত্বে এ স্বপ্নে সামঞ্জস্যের অভাব ধরিব কিরূপে ? বলিতে পার, একটা মাত্র অনুভূতি আমাদের ভ্রম জন্মাইতে পারে ; কিন্তু যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা অনুভূতি স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে ; চোখের ভ্রম স্পর্শে, স্পর্শের ভ্রম শব্দে নিরাকৃত হইতেছে ; পরস্পরের মধ্যে অবিসংবাদী অবিরোধ বিদ্যমান ; তখন জগৎকে মিথ্যা কিরূপে বলিব ? উত্তর, স্বপ্নাবস্থাতেও একটা অনুভূতিমাত্র এক সময়ে থাকে না ; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, সমুদয় একত্র কাজ করিয়া পরস্পরের অবিরোধে এক সুখদুঃখময়, হাসি কান্না-ময়, মনোজ্ঞ, কৌতুকময় জগতের সৃষ্টি করে। আবার জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে বল, তাহা হইলে সে প্রমাণের ভিত্তি নিতান্ত শিথিল হয়। ভাগ্যে মানুষের পাঁচ রকম অনুভূতি আছে, তাই কথাটা তুলিতেছ। আমার রূপানুভূতি আছে, তাই ইন্দু আমার নিকট অমৃতধার ঢালে ; শব্দানুভূতি আছে, তাই বিহগকুল সুরবসার ঢালে ; গন্ধানুভূতি আছে, তাই কুসুম সুরভিভার ঢালে। যে ব্যক্তির কোন অনুভূতি নাই, যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়-হীন, তার কাছে সবই মহাশূন্য ; তার কাছে যুক্তি তর্ক কোথায় লাগিবে ? আবার আর এক কথা বলিতে পার, আমিই না হয় ভ্রান্ত, সকলেই কি ভ্রান্ত ? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া একই স্বপ্নের দর্শনে নিরত ? কিন্তু হায়, তুমিই বা কে, আর

তিনিই বা কে ? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত। তোমরা ত বাহ্য জগতেরই অংশ, সুতরাং আমারই সৃষ্ট পদার্থ। আমি জগৎ দেখিতেছি সত্য, কিন্তু তুমি জগৎ দেখিতেছ তাহার প্রমাণ কি ? তুমি ত আমার কল্পিত, আমারই হাতগড়া সাক্ষী ; তোমার সাক্ষ্যে স্বতন্ত্রতা নাই।

দাঁড়াইল এই ;—আমি চিন্তা করি, অনুভব করি, অতএব আমি আছি। জগৎটাকে অনুভব করি বলিয়া যে জগৎ আছে, তাহার প্রমাণাভাব। এটা আমার আফিম্‌খুরির পরিচয় মাত্র। তোমাকে ও তাঁহাকে ও আমার ভৌতিক কলেবরটাকে লইয়া সমগ্র বাহ্য জগৎ। কিন্তু এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিন্তা, আমার অনুভূতি, বাসনা ও কামনা ও তৃপ্তি প্রভৃতির সমষ্টি। এক কথায় সবটাই আমার ভিতর ; আমিই সব। ফলে যুক্তিশাস্ত্র এই ঘোর স্বার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ন করে। আমিই সব, তুমি আবার কে ? ইহার ফল বৈরাগ্য। জগৎ মিথ্যা, মায়া, মোহ ;—নিজের কাজ দেখ। এই স্বার্থময় বৈরাগ্যজনক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাই ; একমাত্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্বয়ং লগুড়হস্তে দণ্ডায়মানা। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, বাকিটা প্রথম পুরুষ। প্রকৃতি বলিতেছেন, ভো উত্তম পুরুষ, তুমি তোমার সহবর্ত্তী মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর ; নতুবা তোমার কল্যাণ নাই। আমি উত্তম পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান নহি, এবং উত্তম পুরুষের কল্যাণ বিশেষরূপে বুঝি। উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরম পুরুষার্থ। উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনার্থ আমি মধ্যমপুরুষ-রূপী তোমার অস্তিত্ব মানিয়া লই। তোমার ভৌতিক শরীরের অস্তিত্বের জন্য আমি প্রমাণ সংগ্রহে ব্যাপৃত। কিন্তু তোমার চৈতন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমার জীবনযাত্রা চলে না। আমি যেমন চৈতন্যশালী একটা না একটা কিছু, তুমিও তেমনি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত আহারনিদ্রাভয়তৎপর, ঈর্ষ্যী ঘৃণী অসন্তুষ্ট, চৈতন্যশালী কিছু-না-

কিছু, ইহা আমি অকপটে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করি। নতুবা, প্রতিপদে আমাকে লাঞ্ছিত হইতে হয়। নহিলে জীবনযাত্রা এক পদ অগ্রসর হয় না; উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধন ঘটে না; এবং উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরম পুরুষার্থ। প্রমাণের অভাব; যুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতিপ্রযুক্ত লগুড়ের ভয় আছে। সুতরাং আমি আছি, তুমিও আছ। তুমি বিনা কি ভাই আমার চলে?

তুমি আছ, সুতরাং রাম, হরি, কৃষ্ণ সকলেই আছেন। কেন না, সময়-বিশেষে সকলেই মধ্যমপুরুষস্থানীয় হইয়া দাঁড়ান। আবার তোমাদের দূরস্থ জ্ঞাতি ওরাং, হনুমান, জাম্ববান্ পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। কেননা, শাখাবলম্বী হনুমান হইতে কাফ্রি মহাশয় যতদূরে, কাফ্রি মহাশয় হইতে তোমার দূরত্ব তার চেয়ে কম, সকল সময়ে একথা বলিতে সাহস হয় না। বলিলে তুমি রাগ করিবে। একবার পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই; ক্রমেই অধোধঃ নামিতে হয়। মীন মকর হইতে আরম্ভ করিয়া আসিডিয়ান্, আম্ফিঅক্সস ও শেষে দূরস্থ প্রোটোপ্লাজম্ পর্য্যন্ত সকলেই তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব; সুতরাং সকলেই তোমার মত মধ্যমপুরুষস্থলীয় হইবার অধিকারী, সুতরাং সকলেই সন্তি। তোমাকে চেতন স্বীকার করিলে সকলকেই চেতন মানিতে হইবে। জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরস্পরের এমনি সম্বন্ধ, কাহাকে ছাড়িয়া কাহার চৈতন্য স্বীকার করিব? তোমার যদি চৈতন্য থাকে, তবে নিকট জ্ঞাতি হনুমানের আছে, দূর জ্ঞাতি মৎস্যকুম্ভীরের আছে, দূরতর কৃমিকীটের ও দূরতম কীটাণুর ও আছে, প্রোটোপ্লাজমের ও আছে। চৈতন্যের সীমানা নির্দ্দেশ অসম্ভব। এই সীমার ঊর্দ্ধে সমুদয় জীব চৈতন্যবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্য নাই, কে সাহস করিয়া বলিবে? অবশ্য তোমার চৈতন্যে ও কীটাণুর চৈতন্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু সে প্রকৃতিগত নহে, মৌলিক নহে, কেবল অভিব্যক্তির মাত্রাগত। যেমন কীটাণুর

দেহে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তির মাত্রাগত তারতম্য, উভয়েরই চৈতন্যে সেইরূপ মাত্রাগত ব্যবধানমাত্র; উভয়েই একজাতীয়।

প্রোটোপ্লাজমে নামিয়াও থামা চলে না। প্রোটোপ্লাজম্ আজি কালিকার নিম্নতম জীব। কিন্তু এই নিম্নতম জীবের ও জড়ের মধ্যে যে একটা ব্যবধান অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক ব্যবধান মাত্র। আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুই দিন পরে এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে তাহার সংশয় অল্প। জীবনক্রিয়া—অবশ্য চৈতন্যভাগ বাদ দিয়া শুদ্ধ ভৌতিক জীবনক্রিয়া—ভৌতিক ক্রিয়ারই অবান্তরভেদমাত্র; সুতরাং উহা পদার্থবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানেরই ব্যাখ্যার বিষয়। কালে ইহা ব্যাখ্যাত হইবেক। অম্লজান ও উদজানের সমাবেশে জল ও জলের সমুদয় ধর্ম্ম; সেইরূপ অঙ্গার, অম্লজান, উদজানাদির সমাবেশে প্রোটোপ্লাজম্ ও তাহার সমুদয় ধর্ম্ম। পার্থক্য কেবল জটিলতায়। জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে সংশয় নাই। সুতরাং কীটাণুতে ও প্রোটোপ্লাজমে যদি চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরমাণুতেও স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য নামটা দিতে রাজি না হও, ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহা আছে, তাহা চৈতন্যের সজাতীয়, সপ্রকৃতিক। চৈতন্য না বলিয়া চিৎ বল, চিদ্ধর্ম্ম বল, চৈতন্যকণা বল, চিদ্বীজ বল, ক্ষতি নাই। যাহা আছে, তাহা অনুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু যাহার সমাবেশে, যাহার অভিব্যক্তিতে অনুভূতি ও বুদ্ধি, যাহার অঙ্কুর হইতে অনুভূতি চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ, তাহাই।

জড় কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে বুঝা যায় না; মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মিবে বুঝা যায় না; কিন্তু চৈতন্য বা তৎপ্রকৃতিক পদার্থ কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে, তাহা কতক বুঝা যায়। বাহ্যজগৎ চৈতন্যময়; আমিও চৈতন্যময়। তাই

বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাত। চৈতন্যের অস্তিত্ব বাহিরে ও ভিতরে, আমার পূর্ব্বে ও আমার পরে, এই অর্থে গৃহীত ও স্বীকৃত হইতে পারে। চৈতন্যের আবার দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি কিরূপ, ইহা লইয়া একটু তর্ক উঠিতে পারে; সে কথা এখানে তুলিয়া কাজ নাই।

দর্শনশাস্ত্র বহুকাল হইতে একটা সদ্বস্তু বা সত্যপদার্থের অন্বেষণে ব্যাপৃত আছে। যেন একটা সদ্বস্তুর সাক্ষাৎ না পাইলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এই সদ্বস্তুর ইংরাজি প্রতিশব্দ নৌমেনন—Noumenon বা Thing-in-itself অর্থাৎ খাঁটি জিনিষ। প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ত্রই এই সৎপদার্থের বা খাঁটি জিনিষের অন্বেষণ ও দর্শন লাভই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য অধ্যবসায়। প্রত্যক্ষ জগৎ যে এই সদ্বস্তু নহে, তাহা প্রায় জ্ঞানিমাত্রেই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই দৃশ্যমান মায়াপটের অন্তরালে, জড়জগতের একটা অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ—একটা সৎ-পদার্থ—যে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে, ইহা অস্বীকার করিতে অনেকেরই জীবনগ্রন্থি যেন ছিঁড়িয়া যায়। একটা কিছু আছে, উহা অনির্দ্দেশ্য—স্পেন্সারের ভাষায় অজ্ঞেয়—Unknowable ;—সাংখ্যদর্শনের ভাষায় উহার নাম অব্যক্ত প্রকৃতি। এই অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় প্রকৃতি, মানবচৈতন্যের—যাঁহার সাংখ্যদর্শনসম্মত নাম পুরুষ বা জ্ঞাতা বা “জ্ঞ”, তাঁহার—সম্মুখে আসিয়া ‘ব্যক্ত’ পরিদৃশ্যমান অনুভূয়মান প্রকৃতির বা প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কেন করে, তাহা কেহ জানে না, করে এই মাত্র,—করে বলিয়াই এই ‘সৃষ্টি ব্যাপার’, করে বলিয়াই আমি, তুমি, তিনি,—মৎস্য কুম্ভীর ও প্রোটোপ্লাজম,—গিরিনদীসমাকীর্ণা বসুন্ধরা ও নক্ষত্রখচিত নভোদেশ—এই বাহ্যজগতের মায়াময় পট।

এইরূপ দার্শনিক মতকে আমরা দ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিতে

পারি। কেননা, এই মতে চৈতন্য বা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র সদ্বস্তুর—অব্যক্ত অজ্ঞেয় 'প্রকৃতির'—অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সদ্বস্তু দুই—উভয়ই অনির্দ্দেশ্য ও অজ্ঞেয়—একের নাম পুরুষ বা চৈতন্য বা আত্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম প্রকৃতি বা জ্ঞেয়।

কিন্তু এই দ্বৈতবাদ পণ্ডিতসমাজে একবাক্যে গৃহীত হয় নাই। চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব, বাহ্য জড়জগতের মূলে কোন স্বাধীন সদ্বস্তুর অস্তিত্ব, সকলে স্বীকার করেন না। কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই একটা মাত্র অনির্দ্দেশ্য সদ্বস্তুরই রূপভেদ বলিয়া দ্বৈত-বাদকে বিশিষ্ট করিয়া অদ্বয়বাদের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। একটাই জিনিষ, তাহার এপিঠ ও ওপিঠ। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন ক ও খ। ক বিনা খ নাই; খ বিনা ক নাই। একদিক্ হইতে দেখিলে ক, অন্যদিকে দেখিলে খ; একই বক্ররেখার এক পিঠ কুব্জ, অন্যপিঠ ন্যুব্জ। কিন্তু এই রূপ সামঞ্জস্যবিধানে সকলে সম্মত নহেন। প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এই যুক্তির সারভাগ বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূলতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ দ্বিতীয়ের নাম সহিতে চায় না, দ্বৈতস্পর্শে উহা মলিন হয়। এক এব অদ্বিতীয়, সদ্বস্তু একমাত্র, উহা চৈতন্যরূপী, জগৎ-সমষ্টি চৈতন্যময়, সদ্বস্তু চিৎ-পদার্থ, অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের ভাষায় উহা mind-stuff. অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে ফুটাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তোমার চৈতন্যের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জড়মাত্রে চিৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, ও জগৎ চিন্ময় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার চৈতন্যের স্বাধীন অস্তিত্বও সহজে স্বীকার্য্য নহে। ক্লিফোর্ড স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যে করেন না। সাংখ্যবাদী করেন, বৈদান্তিক বোধ করি করেন না। সদ্বস্তু একমাত্র ও উহা চিন্ময়, কিন্তু সেই চৈতন্য অখণ্ড পদার্থ; উহার অংশ নাই, ভাগ নাই। কতক

আমাতে, কতক তোমাতে, কতক মৎস্য কুম্ভীরে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। আমিই চিন্ময় একমাত্র সদ্বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পনা। আমার চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্যক, মদ্বহির্ভূত চৈতন্যের প্রমাণ নাই। এই চৈতন্যরূপী 'অহম্', প্রাকৃত ভাষায় 'আমি', সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম', ইহাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। ইহাই বোধ করি বেদান্তের তাৎপর্য্য।

এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি ? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্য পদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—mind-stuff—তথাস্তু। ইহা আনন্দ—তাই কি ? কেহ কেহ ভ্রূকুটী করিবেন ;—বলিবেন জানি না, উহা অজ্ঞেয়, অনির্দ্দেশ্য। স্পেন্সারের ক ও খ'এর খ'কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট ক। বৌদ্ধ বলেন উহা শূন্য। হিউম ও হক্সলী হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যথা কেন ? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি ? চিদ্বস্তু, সন্দেহ নাই ? কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। নৌমেননের মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।

সুখ না দুঃখ ?

মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায়, বা যে যা' বুঝে, তাহার জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবনপ্রণালী ; এবং স্থূল হিসাবে সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি ও জৈবিক প্রবাহ। এস্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন

নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করে। তাহার উদ্দেশ্য, তাহার লক্ষ্যীভূত পদার্থ, অন্যের আদর্শোপযোগী হউক আর নাই হউক, সেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলে সৃষ্টি চলিতেছে; উন্নতিই বল আর অধোগতিই বল, জীবজগতে বা নরসমাজে অভিব্যক্তি তাহার ফলেই চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্থূল কথায় এই।

যদিও আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, কিন্তু জীবনে সুখের ভাগ বেশী কি দুঃখের ভাগ বেশী, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই কথা-টার মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে সুখের মাত্রা অবশ্য অধিক; অন্যপক্ষ বলেন, দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক মাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সুস্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ নিজ জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্য-শালী নহেন; তাঁহাদের রুগ্নচক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্ব্বলতায় শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পঙ্ক হইতে উঠিয়া সহজলভ্য সুখের শুষ্ক বর্ত্মে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতামত নিজ জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামাত্র; জগতে সুখদুঃখের তারতম্যনির্ণয়ে ইঁহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা; নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে, তাহা ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা বাকি থাকিত না।

কেননা, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন প্রকৃতিগত চশমা চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন না; কাজেই কেহ বলেন, এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই;—জীবনে সুখ বেশী, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন? মানুষ যে বাঁচিতে চায়,—অবশ্য দুই চারিটা আত্মঘাতীকে বাদ দিয়া—ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে। দুঃখের ভাগ বেশী হইলে, দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত; সংসার এতদিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আধিব্যাধি, মরণ-যাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, তাহার উপর মুখোস্পরা ধর্ম্মের জয়জয়কার ও প্রণয়ে কৃত্রিমতা, এসব নাই এমন নহে; তবে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, মমতা, সারল্য, প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও জগতে বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহারনিদ্রাসম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও নিতরাং ব্যাপৃত; নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইত, এবং ডারুইন সাহেবকেও অভি-ব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা নীতিশাস্ত্র নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাঁরা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না;—কেন না, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্দ্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য;

দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না, সুতরাং দুঃখ আছে বৈ কি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা দুঃখপ্রদ বা মোটের উপর দুঃখপ্রদ, তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু "সুখ" শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবের উচু অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই যে নিম্ন পর্য্যায়ের ঐন্দ্রিয়িক সুখই বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন বর্দ্ধন করে; এবং জীবনবর্দ্ধনের ন্যায় মহান্ উদ্দেশ্য প্রকৃতির নিকট আর কি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা বড় থাকে না। যাহা হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতেছে যদি ধরা যায়, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে; কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্ব্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক; নহিলে লোকে জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত। ধর্ম্মনীতি উলটাইয়া যাইত। স্নেহমমতা পাপের পর্য্যায়ে ও চুরিডাকাতি ধর্ম্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের লিখিত পুঁথি কয়খানা জগতের দৃশ্যপটটাকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শান্তি, প্রীতি ও মাধুর্য্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা, স্বার্থ, শোণিততৃষা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্তরসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি-ভ্রম! এই নির্ম্মম দ্বন্দ্ব আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির অনেকটা মূল,

একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অঙ্কের অভিনয় এখনও যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা বড়ই অল্প। কিন্তু যাঁহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নূতন নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, হর্বার্ট স্পেন্সর ইহার প্রধান প্রচারক; এবং হর্বার্ট স্পেন্সর ডারুইন-তত্ত্বের একজন "পাণ্ডা"।

ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই অসংসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সুখ কি? ঘাতকের কিয়ৎপরিমাণে আপন মনের মত সুখ বা তৃপ্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র; কেন না, জঠরজ্বালারূপ সদাতন মহাদুঃখনিবারণের জন্যই এই হত্যাব্যবসায়; এবং আহারসম্পাদনের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান, তাহার যে পরোপকার-বৃত্তি সে সময়ে বিশেষ প্রবল হয়, এবং তজ্জন্য সে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ডারুইন-তত্ত্বের অন্যতর প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস্ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকার্য্যের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কার্য্যটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় না। দয়াশীলা প্রকৃতির এমনই সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না, এমন কি, বোধশক্তি হয়ত হননকালে লোপ পায়। প্রহার দেখা, শুনা বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে কোন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন

কি না সন্দেহ। তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহার ভোগে যেন ক্লেশ খুব কম হইল, বা না হইল; তবে প্রহারদর্শনও ত নিত্য ঘটনা; এবং প্রহারদর্শনে যদি দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবারণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ। আবার দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি। কাজে দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্ত্তমান জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাসও যে স্বপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখ লঘূকরণের অভিমুখী, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ওপক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; দুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; ধনী কয়টা? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়? আবার অধর্ম্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম বেশী না অধর্ম্ম বেশী? ধার্ম্মিক যেখানে দুইটা, অধর্ম্ম সেখানে দুশ'টা; আবার ধার্ম্মিক দুইটার ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণসাপেক্ষ, অধার্ম্মিক দুশ'টার অধার্ম্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবন বা জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সেত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়, অধিকাংশ স্থলে প্রয়াস কি কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা

লইয়াই জীবন ও জীবনের সমুদায় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা, কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তিত ইচ্ছারই ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। সেই ইচ্ছার অর্থ কি ? না, বর্ত্তমান অভাবের, বর্ত্তমান ক্লেশের, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে ইচ্ছা থাকিত না, জীবনের আবশ্যকতা থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল আয়াসই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবন দুঃখময়, কি সুখময়, তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেই খানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ, অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা ; তবে নিষ্কৃতি হয় না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই ? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায় ? ধর সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই ; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয়, তত কমে ; দুঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায় ; দুঃখকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষ্যা, পরিতাপ সবই দুঃখময় ;—যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাব মাত্র ; ধন, মান, প্রণয়, সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ ; স্নেহ, দয়া, মমতা, ইহারাত অধিকাংশ দুঃখেরই মূল ;—জ্ঞান, ধর্ম্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়"। *

---

* Sidgwick's History of Ethics, P. 273.

যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক। দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ পাথরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, সুতরাং ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর; নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে; কার দুঃখ অধিক?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ফাঁদ এড়াইতে যাইয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান্ যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

বর্ত্তমান দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; ইচ্ছা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যত্বে সমাহিত হউক। স্ফূর্ত্তিমান্ ইংরাজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মণিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর মোক্ষ, বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ, এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, গরু দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, বলিয়া যাঁহারা হোমানলে সোমরস ঢালিতেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উপনিষদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে; যিনি যখন বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; ইচ্ছা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মোক্ষ লাভ করিবে। আধুনিক হিন্দুর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, বোধ হয় না। ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্ বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া কেবল সৌন্দর্য্যদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য-অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর; বৈরাগী হইওনা। শেক্ষপীয়রের কল্পিত পরী-রাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত

প্রফুল্ল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান্ টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের রহস্যভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণয়ের নৈরাশ্য, ধর্ম্মের বিড়ম্বনা ও জীবনের নিষ্ফলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন্ সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃত দেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও বা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন খেয়াল হইবে, নিষ্ঠুর ভাবে তোমায় বলিদান দিবে; তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান মনুষ্যের জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায় না।

মোট কথা পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না; প্রকৃতির এই উপদেশ

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য্য-বোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবিনামধেয় সম্প্রদায়বিশেষই সৌন্দর্য্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বলা চলে না। কেননা, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্য-রসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দাঁড় কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্য সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ পথে ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করি; এবং যাহার সৌন্দর্য্যপিপাসা নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দ্দেশ করিতে পারি। নীরব বনস্থলীতে, জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে, মহাশ্বেতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে

যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্ত্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি; বারুণীতীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া একটি গৃহস্থ-সংসারে ভয়ানক নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল; এরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে, মনুষ্য-সংসারে অসাধারণ ঘটনা, তাহা সহজে বিশ্বাস করিব না। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; সুতরাং সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য্য চায়, ও সৌন্দর্য্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকি অংশ অসুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা কুৎসিত, কেননা বাকিটা সুন্দর। খানিকটা সুন্দর, কেননা বাকিটা কুৎসিত; অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সমবায়ে, তাহার সহিত তুলনায়, তাহা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকিটা সুন্দর হইত না, অথবা সবটা সুন্দর হইলে সৌন্দর্য্যশব্দ নিরর্থক হইত। সুতরাং সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। একেকে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোন্‌টা সুন্দর, আর কোন্‌টাই বা কুৎসিত, এটাই বা সুন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, অথবা তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে

উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? মনুষ্যের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশ্যে? কিসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতই কি জগতের দুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবের পক্ষেও সেইরূপ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ সত্তা থাকে, তবে সেই নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে।

স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে সমুদায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যায়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য শব্দটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মনুষ্যের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখের অনুভব করে, সুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এই রকম একটা অনুভব যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ, ঘৃণা, ক্লেশ, বা তাদৃশ কোনরূপ অনুভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্য্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ ও মধুর দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্যমাত্রেই তাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়। সুখাদ্য ভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মনুষ্যেতর জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী;

ইহা জীবনমাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনমাত্রেরই নিত্য ভোগ্য। ইহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে কতকগুলা মাল মশলা বাছিয়া গ্রহণ করিতে হয়; কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতির, পুষ্টির ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল। সুতরাং কতকগুলা আমরা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দূরে পরিহার করি; নতুবা জীবন চলিত না।

সুতরাং মিষ্ট রস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ সময়েই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণীতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভাল লাগে; সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্য্যভোগের শক্তি আছে কিনা, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধ্যে সকলে সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে, তাহা বলা চলে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে

জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজিতে যাহাকে আর্ট বলে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। এবং মানবমনের যে অংশটা ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ইংরেজি নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বৃত্তিটা কিরূপে ও কি উদ্দেশ্যে জন্মিল, ভাল বুঝা যায় না। এই সৌন্দর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য্য কিসের ধর্ম্ম? ইহা কি বস্তুবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি, কল্পনা বা কারিগরি? অর্থাৎ, যাহাকে সুন্দর বলি, তাহার প্রকৃতিগত কোন বিশিষ্টতা নাই, আমরা তাহাতে সৌন্দর্য্য আরোপ করি মাত্র? বস্তুতঃ এমন দেখা যায়, শ্যাম যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয় ত তাহা কুৎসিত। মদস্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে কীচকধ্বনি শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহাতে যে সকলেই সহানুভূতি দেখাইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আবার সৌন্দর্য্যবিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; এবং তাঁহার মানসলোচন জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা কিম্পুরুষাঙ্গণার নগ্নদেহের দিকে বিবর্ত্তিত হইত। আবার বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর সংসার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদ্ভ্রান্ত জরাক্রান্ত অসহায় রাজা লীয়রকে আঁধারে প্রান্তরমধ্যে ততোধিক বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির উপপ্লবে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎ-রূপী পেষণযন্ত্রের আবর্ত্তনপ্রণালীর উদ্দেশ্যের ঠাহর না

পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের সৌন্দর্য্য যে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ করিবেন, তাঁহার অনুভূতির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। তুমি যদি কুৎসিত দেখ, কাহারও সাধ্য নাই যে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, উহা সুন্দর। আমার নিকট উহা যে অর্থে সুন্দর, তোমার নিকট ঠিক্ সেই অর্থেই উহা কুৎসিত। এ বিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিবার কোন আইন নাই। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, যাহারা সুস্থপ্রকৃতি মানুষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই,—কি গুণে ইহারা সুন্দর ; ইহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের লাভ কি ?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস খুলিলেই পঞ্চাশ রকম সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিশ পাতা বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তির ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারুইনও আপাততঃ এখানে বড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল সূত্র একটামাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন না কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু নাই। কেন না, সাংসারিক বিষয়ে কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। মলয়ানিলের প্রতি

অনুরাগ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জীবনবর্দ্ধনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোকিলকূজনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কিবা শীতে কি বসন্তে কোন কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না।

ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা পক্ষে ততই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রুসংখ্যা অনেক; এই সকল শত্রুর সৌন্দর্য্য-বৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্যকে একেবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালায়িত; এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখ সমরে দাঁড়ানও দুর্ব্বল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, শত্রুকে ফাঁকি দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল একদিকে যেমন সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনি অন্যদিকে সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের স্বষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির সৌন্দর্য্যের স্বষ্টিকর্ত্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনি রূপ-মুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং জাতির সৌন্দর্য্যবৃত্তির এতটা তীক্ষ্ণতাস্বীকার বড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি একঘেয়ে শাদা কালোর চেয়ে রঙের বৈচিত্র্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, তা' সে রঙ লবক সাহেবের কাঁচেই থাক্, আর কেরোসিন দীপের

শিখাতেই থাক্ ; এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়। এবং রঙদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরী দিতে পারি। পুষ্পদেহে আর প্রজাপতিদেহে বর্ণ-বৈচিত্র্য বিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার বেশীও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, এ কথার উত্তর পাওয়া গেল না।

আর একটা কথা আছে—যৌন নির্ব্বাচন। ডারুইন এই মতেরও প্রবর্ত্তক। সিংহের কেশর, পাখীর কাকলী, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর; এবং ডারুইনের মতে এ সমস্তই যৌন নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত; স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীলকণ্ঠ আনত্র উন্নম্র করিয়া, চারুপুচ্ছ নর্ত্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌন নির্ব্বাচন মানিয়া লইলে জীবদেহে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অনেকটা বুঝা যায়। কিন্তু যৌন নির্ব্বাচন সকলে মানিতে চাহেন না; সম্প্রতি ওয়ালাস সাহেবই যৌন নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। সুতরাং ডারুইনের মত এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূল কথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে; কিন্তু মানুষের তাহাতে কি আসে যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমবায়ে এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, মানুষের তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে?

মনোবিজ্ঞান সাহায্যে এইরূপে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ।

সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরাকে চৈতন্য বলা যাইত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য, বিচিত্রতা বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকশিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের চৈতন্য যে অস্তিত্বযুক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, মানুষের অনুভূতিগুলা একরকম নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নূতন শব্দ, নূতন স্পর্শ, নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে; তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত এক টানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অনুভব-বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক্ বিকশিত; সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্ত্তিমান্। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কল্যাণ; নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময়ে ছিঁড়িয়া যায়। পরিবর্ত্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আলগা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে না।

সুতরাং সৌন্দর্য্যের এক অঙ্গ অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোন রূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোন রূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নর-দেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন আরক্ত যুবতীর গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্য্যের আর একটী অঙ্গ সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভাল লাগে, তাহা সুন্দর; আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে,

অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখ ও আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। কতক-গুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখ ও তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থ বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উটে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেই জন্য যে সকল পদার্থ দয়া মায়া প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক, তাহারা অতি সুন্দর।

আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহ স্থিরবেগে মন্দ গতিতে চালিত রাখে, তাহা সুন্দর; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর; আর যাহাতে অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজজীবনকে অগ্রসর করে, তাহা আরও সুন্দর। এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজজীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়ের বর্দ্ধনেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হাত আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্য অনুভূতির জনক ও বিকাশক বলিতে আপত্তি ঘটে না।

• •

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। যখনই মনে করা যায়, সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক বা জীবনবর্দ্ধক, তখনই নিতান্ত ইউটিলিটির বা ক্ষতিলাভগণনার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং সৌন্দর্য্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্য্যে এমন একটা

জিনিষ আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, সুখমাত্র ; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না ; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্ম্মল উদ্দেশ্যহীন সুখের উৎপাদক বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কিরূপে এই অনাবশ্যক সুখভোগ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল, তাহা সমস্যাই থাকিয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের কাছে সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে কতকটা পরিষ্কার হইতে পারে। প্রকৃতি এক ভাবে আমার বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,—নির্ম্মমা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশ-বিবর্জ্জিতা ; আবার প্রকৃতি অন্য ভাবে আমাকে ও সমাজকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা। কেন এমন, তাহা বলা যায় না ; কিন্তু ইহা সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের, আর ইহাতেই সমাজের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি ; প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই আমার জ্ঞানবিকাশ, বুদ্ধিবিকাশ, ধর্ম্মবিকাশ, ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি হস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাপাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই। শঙ্কার হেতু যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহারি এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিন বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না ; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রসম্বল শশকের ন্যায়, শত্রু হইতে

পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র; অতএব জীবনে দুঃখানুভূতির বিকাশ; অতএব জীবন দুঃখময়। জীবপর্য্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত দুঃখী; সে তত দুঃখ আহরণে, দুঃখ অন্বেষণে, দুঃখ উপভোগে নিযুক্ত। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনী, ইহার সাক্ষী।

প্রাকৃত শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তিজীবনের উপরে বিদ্যমান, তাহা নহে; সমাজজীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজরক্ষা না হইলে ব্যক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সমবেদনা প্রভৃতি মূলতঃ ব্যক্তিজীবন রক্ষার অনুকূল।

জীবন দুঃখময়; কেননা, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও ভরসা। আবার জীবন দুঃখময়; সেই জন্য জীবনে সুখের আবশ্যকতা। নইলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। প্রকৃতির এ কি রকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া প্রকৃতি ভাল করে; ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না; বন্ধুশোকার্ত্ত টেনিসন্ দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না; কেন না, যখনই দেখি ভাল, তখনই পরক্ষণেই দেখি মন্দ। সুতরাং খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক, কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা আর তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে। অন্ততঃ মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়; এইটা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ; এবং অগত্যা সে সুখের সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত, তাহার তত দুঃখ;

তাহার তত সুখের দরকার ; না হইলে তাহার জীবন চলে না ; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ, তাহার নাম কবি ; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলা সামগ্রী জগতের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নহে। অমুক অমুক পদার্থগুলাই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন কোন বিধান নাই। মানুষ সম্মুখে যাহা পায়, তাহা হইতে সুখ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বিচার করে না ; যেখানে সেখানে, যখন তখন, সুখের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, যাহাতে সাধারণ মানুষমাত্রেই কিছু না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য্য দেখে ; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোন-না-কোন রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল, আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার ; তাই যাহা তাহা, যে সে পদার্থ হইতে তাহারা সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ পায় না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের মত গড়িয়া লয়, তাহাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দুচোখে যাহা দেখে, তাহাই রঙিল চশমা পরিয়া রঙিল করিয়া দেখিয়া লয় ; কেন না সৌন্দর্য্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক ; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাঁহার অবলম্বন ; বিশুদ্ধ সুখই তাহার লক্ষ্য। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাতে আনন্দ পায় ; যাহা বুঝে না, তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না, তাহাতে আনন্দ বেশী হয়। স্থূল হিসাবে এটা সমস্যা। বিজ্ঞানবিৎ জগৎযন্ত্রের জটিলতা উদ্ঘাটন করিয়া যতই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্যজীবনের সহায় করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্যকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন

বা বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে, যেটা বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম পাই; আবার যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। যাহা আপাততঃ নিয়মের বাহির, ইংরেজিতে যাহাকে মিরাকল বলে, তাহার প্রতি মানবমনের প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এই জন্য। অনির্দ্দেশ্য অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্য সৌন্দর্য্যে মহীয়সী। অনেকের মতে বৈজ্ঞানিকগণ জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সৌন্দর্য্যের বিনাশে নিযুক্ত আছেন।

রামচরিত্রে সীতানির্ব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না, বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরেজিওয়ালাদের কাছে। রামচরিত্রের এইটুকু ভাল বুঝা যায় না; এবং বোধ হয় এই জন্যই ইহা সুন্দর। সমাজ-শক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য, সুতরাং সুন্দর রহস্য। বাসন্তী দেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া নিরপরাধা সীতার নির্ব্বাসনের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই আবার রাম-চরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া অথচ রামচরিত্রের লোকোত্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া বলিয়াছেন;—বজ্র হইতে কঠোর, কুসুম হইতে কোমল, লোকোত্তর চরিত্র কে বুঝিতে পারে?

যাই হউক সৌন্দর্য্য ও তদনুভবজাত সুখ নইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্যসৃজনে ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি অসঙ্গত নহে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় এই কয়টি কথা পাওয়া গেল।

(১) জীবের মধ্যে মনুষ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-ভোগে অধিকারী।

(২) সকলের আবার সৌন্দর্য্যপিপাসা ও সৌন্দর্য্য-ভোগ-শক্তি সমান নহে। ইহা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনের লক্ষণ।

(৩) বৈচিত্র্যের সমাবেশে ও পরম্পরায় চৈতন্যের অস্তিত্ব। সুতরাং চেতনের নিকট এরূপ বৈচিত্র্যের আদর, ও যাহা বিচিত্র, চেতনের নিকট তাহা সুন্দর।

(৪) কতকগুলি পদার্থ কোন না কোন রূপে জীবনের ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কতিপয় পদার্থ জীবনসমরে ভীতি ও নৈরাশ্য দূর করিয়া আশা ও প্রফুল্লতা আনে। ইহারা সুন্দর। কতকগুলি পদার্থ মুখ্য ভাবে বা গৌণ ভাবে জাতীয়জীবনের বা সমাজজীবনের অনুকূল, সমবেদনার ও পরার্থ বৃত্তির উদ্দীপক। ইহারাও সুন্দর।

(৫) কিন্তু অনেকস্থলে ব্যক্তি-জীবন বা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, অথচ অনেকের নিকট সুন্দর, এমন পদার্থ দেখা যায়। ইহারা সুন্দর কেন, স্থির করা দুষ্কর।

(৬) মানুষের অভিব্যক্তির সহিত দুঃখবৃত্তি ফুটিয়া আসিতেছে। নিজের জন্য শঙ্কা ও পরের জন্য শঙ্কা ইহার মূল। এই দুঃখবৃত্তি ব্যক্তিজীবন রক্ষার ও জাতীয় জীবন রক্ষার অনুকূল। মনুষ্যপর্য্যায়ে যে যত উন্নত, দুঃখভোগ ঘটে তাহার তত বেশী। প্রমাণ রামায়ণ।

(৭) দুঃখের উৎপত্তির সহিত সুখের উৎপত্তি না ঘটিলে মনুষ্য-জীবন বা উন্নত মনুষ্যজীবন টিকিত না। তাই যেখানে সেখানে সুখ কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা মানুষের জন্মিয়াছে। কোথা সুখ পাইবে, কোথা পাইবে না, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্বত্র চলে না। যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখানুভবশক্তি প্রবল, তাহারাই অধিক সুন্দর জিনিষ দেখিতে পায়। দুঃখের ন্যায় সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই।

(৮) এই হিসাবে মানুষের মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্ত্তি দেয়। সৌন্দর্য্য কোন বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম নহে। এই হিসাবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

আত্মার অবিনাশিতা

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পুরাতন হইলেও চিরকাল নূতন থাকে। সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়ের গৌরব বিবেচনায় পাঠকের ধৈর্য্য ভিক্ষায় অধিকার আছে।

মনুষ্যের আত্মা সেই পুরাতন বিষয় এবং এই পুরাতনের নূতনত্ব শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে না।

আত্মা আছে কিনা, আত্মা অবিনাশী কিনা, ইহা লইয়া চিরাচরিত পদ্ধতি-ক্রমে যথেচ্ছপরিমাণে বিতণ্ডা করা যাইতে পারে। আত্মার ধ্বংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতণ্ডার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'আত্মা' অর্থে আমরা কি বুঝিব, সেটা পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রামের দোষগুণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, রাম অর্থে ভার্গব রাম কি রঘুপতি রাম, রামা হাড়ি অথবা রামগিরি পর্ব্বত, সেটা উভয় পক্ষে স্থির করিয়া না লইলে, বড়ই পণ্ড-শ্রমবাহুল্য উপস্থিত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মা কি বুঝায়, স্থির করা কিছু দুষ্কর। কেননা, পাঁচ জনে পাঁচ রকম বুঝেন, এবং একজনেও সর্ব্বদা সেই একরকমই বুঝেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকের মতে, বোধ করি সাধা-রণের মতে, আত্মা একরকম বায়বীয় পদার্থ, একরকম সূক্ষ্ম বায়ু অথবা ঈথর। প্রাচীন খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা অনেক স্থলেই আত্মাকে এই-

রূপ সূক্ষ্ম জড়পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সে কালে যে সকল আত্মা নাকি সুরে কথা কহিয়া ভয় দেখাইত, একালে যে সকল আত্মা টেবিল উলটাইয়া তামাসা করে, তাহারাও বোধ করি এই শ্রেণীর। এমনও শুনা যায়, সুষুপ্তিকালে আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় অপরের আত্মা আসিয়া দেখা দেয়; আঁধারে বা নির্জ্জনে পাইলে মৃতের আত্মা আসিয়া ভয় দেখায়। হাঁই তুলিলে আত্মা মুখকোটরের নির্গমপথ পাইয়া হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা মাছির রূপ ধরিয়া মুখে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকগণের আত্মা দূর হইতে চিঠি পাঠায়। তাঁহাদের অনেকের সহিত বড় বড় আত্মার পরিচয় ও সদ্ভাব আছে। এতাদৃশ আত্মার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। এইরূপ সাকার অথবা বাষ্পীয় অথবা ঈথারনির্ম্মিত আত্মার নিকট আমরা উল্লেখমাত্রে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ সূক্ষ্মশরীরের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা আত্মা নহে। দর্শনশাস্ত্রোক্ত আত্মাকে স্থূলশরীরী বা সূক্ষ্মশরীরী মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

"মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" আত্মার অন্যান্য লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া এই উক্তিটিকে প্রাচীন ও অধুনাতন প্রচলিত বিশ্বাসের স্বরূপবর্ণনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উক্তির ভিতরে কয়েকটি স্থূল কথা পাওয়া যায়। প্রথম, দেহ-ব্যতিরিক্ত ও দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে, যাহা লইয়া জীবের পূর্ণতা; দ্বিতীয়, দেহের ধ্বংসে অথবা মরণরূপ বিকারে সেই পদার্থ দেহ হইতে পৃথক্ হয়। তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্য দেহ আশ্রয় করিতে পারে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্মা; এবং এই আত্মার সম্বন্ধেই পূর্ব্বদেহের সহিত পরদেহের সম্বন্ধ। এক

কথায়, আত্মা রহিয়া যায় ; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনের মত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও দেহান্তরাশ্রয় (পুনর্জন্মগ্রহণ), আত্মার এই তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য দেহও ধারণ করিতে পারে ; সুতরাং মনুষ্যেতর জীবেও আত্মা বর্ত্তমান।

আত্মার নাশ নাই ; তবে ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ অথবা দেহান্তরাশ্রয় হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কখন সমর্থ হয়। তাহাকে নাশ বলা যায় না ; তবে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ এইরূপ কোন অভিধান দেওয়া যাইতে পারে। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে মতভেদ আছে।

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর আত্মা কখনও স্বর্গনরক ভোগ করে ও কখনও বা দেহান্তর গ্রহণ করে, হিন্দু জাতির প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ।

উল্লিখিত হিন্দুশব্দে সাধারণ হিন্দু বুঝিয়াছি। হিন্দু দার্শনিক এই হিন্দুশব্দবাচ্য নহেন।

হিন্দুর ন্যায় খ্রীষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা আত্মার দেহান্তরাশ্রয় বা পুনর্জন্মগ্রহণটা বোধ করি স্বীকার করেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবকে আত্মার অধিকারী করিতে চাহেন না।

ইহাঁদের মতে আত্মা মৃত্যুর পর নিরাশ্রয়ভাবে কোনও না কোনও রূপে শেষবিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে প্রেরিত হইয়া সুখদুঃখভাগী হইতে পারে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ শুনিলে ইহাঁরা রাগিয়া উঠেন, এবং তাহাকে ধ্বংসেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যাহাই হউক, হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ের মধ্যে মোটা কথা কয়েকটাতে মিল আছে। দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা কিছু আছে; সেটা দেহান্তেও রহে; এবং তাহার অন্য পরিচয় না জানিলেও এইটুকু তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুখদুঃখভোগটা তাহারই নিজস্ব অধিকার।

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক। বিচারে যুক্তিমার্গই আমাদের আশ্রয়; সম্প্রদায়বিশেষের নিকট, বিশেষতঃ খ্রীষ্টানদের নিকট, একটা শাস্ত্রবহির্ভূত যুক্তির পন্থা শুনিতে পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার একবার উল্লেখ আবশ্যক।

ইহাঁরা এইরূপ বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নাই, এ বড় ভীষণ কল্পনা। দেহ ফুরাইলে সব ফুরাইল, মনে করিলে দুঃখের দুঃসহতা ও মরণের বিভীষিকা আরও দুঃসহ ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের পক্ষে সান্ত্বনা আর কিছুই থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি বলে, দেহ ছাড়া আত্মা নাই, সে মনুষ্যজাতির শত্রু। আবার আত্মা অস্বীকার করিলে পাপের নিষেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। একরকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাঁকি দেওয়া চলে, সেখানে পাপপুণ্য লইয়া হাঙ্গামা চলে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে পামর ও পাপিষ্ঠ ও সমাজদ্রোহী। মরিয়া গেলে সব ফুরাইবে, মানুষের মন কি তাহা চায়? তোমার অন্তরাত্মা কি বলে?

এইরূপ বিচারপ্রণালী যুক্তির অপলাপমাত্র। মৃত্যুর পর সব ফুরাইবে, স্বীকার করিতে তোমার কষ্ট হইতে পারে; এবং সেরূপ স্বীকারে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুক্তি দ্বারা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা ঘোরতর দুঃসাহসের পরিচয়। সত্য কাহারও ইষ্টানিষ্টের অপেক্ষা রাখে না।

যাঁহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে

চাহেন, তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ যুক্তি অবলম্বন করিলেই পারেন। বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ লগুড়। এই শেষোক্ত আশুফলপ্রদ বিচারপ্রণালীও যে সময়ক্রমে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। ইতিহাস সাক্ষী।

আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিব, যাহা সুস্থ মানব-বুদ্ধি, বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

এই শাস্ত্রসম্মত প্রণালী মতে আমরা কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও কতিপয় সংজ্ঞা লইয়া বিচার আরম্ভ করি। স্বতঃসিদ্ধ সত্য অর্থে যে সকল সত্য সকলেই মানিয়া লয়েন, কাহারও মানিতে আপত্তি নাই। সেই সকল সত্য প্রমাণনিরপেক্ষ বা প্রমাণাতীত; তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা, কেন না সকলেই তাহার সত্যতা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন; *প্রমাণাতীত*, কেন না তাহা আমরা সপ্রমাণ করিবার উপায় দেখিনা, সে গুলি স্বীকার করিয়া না লইলে বিচারই অসাধ্য হয়। এই সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকলেই স্বীকার করেন; অন্ততঃ সুস্থ মানুষমাত্রেই মানিয়া লয়েন; না মানিলে জীবনযাত্রা অসাধ্য হয়; পদে পদে ঠেকিতে হয়। যে ব্যক্তি মানিতে চাহে না, তাহাকে আমরা অসুস্থ বলিয়া, মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া, পাগল বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট করি।

আর সংজ্ঞা অর্থে নাম। বিচারের আরম্ভে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম স্থির করিয়া লইতে হয়। নতুবা আমার কথা অপরকে বুঝান চলে না। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের স্বীকারে সকলেই বাধ্য, আমার নিকট যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তোমার নিকটও তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সংজ্ঞাটা ইচ্ছামত প্রদত্ত; আমি যে জিনিষের যে সংজ্ঞা বা আখ্যা দিলাম, তুমি সে জিনিষের সে সংজ্ঞা বা আখ্যা দিতে পার বা না পার; এ বিষয়ে আমি তোমাকে বাধ্য করিতে পারি না। তবে কিনা প্রত্যেক ব্যক্তি একই

জিনিষের জন্য যদি আপন ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে মানুষে মানুষে কথাবার্ত্তা, ভাববিনিময় চলে না; বিচার ত চলেই না। সেই জন্য নাম লইয়া বিবাদ না করিয়া সকলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা মানিয়া লইলে সকলেরই সুবিধা হয়।

অনেক সময়ে সংজ্ঞায় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যে একটু গোল উপস্থিত হয়। অনেক সময় আমরা যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহা সংজ্ঞামাত্র। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ইউক্লিডের জ্যামিতিশাস্ত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ আছে; অংশের অপেক্ষা পূর্ণ বৃহৎ। আপাততঃ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হয়; অংশের অপেক্ষা পূর্ণ বড় হইবেই; কে ইহা অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার করিবে, সে পাগল। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহা সংজ্ঞামাত্র। পূর্ণ অপেক্ষা যাহা ছোট, তাহাকেই আমরা অংশ এই নাম বা এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি। অংশের অপেক্ষা যাহা বড়, তাহাকেই পূর্ণ আখ্যা দিয়া থাকি। এই নাম দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন। ইহা একটা ভাষার খেয়াল মাত্র। যদি গাছকেই আমরা অংশ নাম দিতাম, আর ডালকে পূর্ণ আখ্যা দিতাম, তাহা হইলে পূর্ণ অংশের চেয়ে ছোট হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা বড় গাছকেই পূর্ণ বলিয়া থাকি, ছোট ডালকেও তাহার অংশ বলি। কেন বলি? একটা কিছু ত বলিতেই হইবে; পূর্ব্ব পিতামহেরা, যাঁহারা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা ভাষা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ নাম দিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রদত্ত নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা, তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা, আমরা সকলে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এই মাত্র। অতএব, পূর্ণ অংশের চেয়ে বড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহা পূর্ণ ও অংশ এই দুইটি শব্দের সর্ব্বজনস্বীকৃত অর্থ হইতেই স্বীকার্য্য। হাত পা শরীরের অংশ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহা শরীরের ইচ্ছাদত্ত সংজ্ঞা হইতে

আসে। হাত পা নাক মুখ প্রভৃতির যে সমষ্টি, তাহাকেই যখন আমরা শরীর আখ্যা দিয়াছি, তখন হাত পা প্রভৃতি শরীরের অংশ ত হইবেই। শরীরের এই সংজ্ঞা আমরা সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কাজেই ইহা সংজ্ঞামাত্র; ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য নহে।

কোন্‌টা স্বতঃসিদ্ধ সত্য আর কোন্‌টা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সংজ্ঞা, ইহা স্থির করিয়া না লইলে দার্শনিক বিচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য এখানে এতটা ভূমিকার প্রয়োজন হইল।

সম্মুখে গাছ দেখিতেছি; দেখিতেছি বলিয়াই ঐ খানে গাছ রহিয়াছে একথা পূরা সাহসের সহিত বলা যায় না। কেননা মরীচিকা, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন, মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকার, এই সকলে অনেক সময়ে গাছের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, অথচ সেখানে গাছ নাই। আমার সকল ইন্দ্রিয় যদি একযোগে সাক্ষ্য দেয় যে এখানে গাছ আছে, তাহাতেও গাছের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অন্য পাঁচ জনে সাক্ষ্য দিলেও প্রতিপন্ন হয় কি না বলা কঠিন। তবে আমি গাছ দেখিতেছি, একথা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই বোধ করি সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। আফিমের নেশায় আমি যখন বিড়ালকে হাতী মনে করি, তখন হাতীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু আমার যে হাতী-বুদ্ধি জন্মিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। স্বপ্নই হউক আর বিকারই হউক, আমার যে ঐরূপ বোধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা; ঐ বোধটুকু সত্য, উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এই বোধ বা অনুভূতি বা জ্ঞানকে সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। ঐ হাতী আছে বা ঐ গাছ আছে, ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু আমার ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

গাছ দেখিতেছি ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটু গোল আছে। একটা কিছু বিশেষরকম বোধ জন্মিতেছে, এবং সেই বোধটির আমি নাম দিয়াছি 'গাছ দেখা', এই পর্য্যন্ত ঠিক্। প্রত্যয় একটা জন্মিতেছে, এই টুকু স্বতঃসিদ্ধ; গাছ দেখাটা তাহার, অর্থাৎ সেই প্রত্যয়ের সংজ্ঞা। একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে এবং সেই প্রত্যয়ের একটা বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দ্বারা এই প্রতীতিকে অন্য প্রতীতি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইতে পারি; এই পর্য্যন্ত আমার বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীতিই যে জন্মিতেছে, তাহার প্রমাণ কি? সেই জ্ঞানের অস্তিত্বেরই প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, ইহার প্রমাণ নাই; স্বীকার করিতে চাও, ত এই মূল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর পাঁচটা কথা তুলিয়া তোমার সহিত কথাবার্ত্তা বিচারবিতর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে এই খানেই নিরস্ত হইতে হইবে। যুক্তি অবলম্বনে শেষ সীমায় একটা মূল সত্যে পৌঁছিতে হইবেই; আপনার প্রত্যয়ের অস্তিত্ব, সেই মূল সত্য। ইহা উলটাইলে আর কিছু থাকিবে না। অথচ সকলেই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। কোথাও বা ঠগিতে হয়, অধিকাংশ স্থলে ঠগিতে হয় না, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

তবেই স্বীকার্য্য, সম্প্রতি একটা বিশেষ লক্ষণ-লক্ষিত জ্ঞান জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আমি বলি 'গাচ দেখিতেছি'। সেইরূপ আরও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাবিশিষ্ট বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে। যথা, ঐ হাতী দেখিতেছি, ঐ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ঐ শব্দ শুনিতেছি, এই গরম বুঝিতেছি, এই চলিতেছি, খাইতেছি, ইত্যাদি। অপিচ, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষুধা, শীত অনু-

ভব করিতেছি। এইরূপ কতকগুলা বিবিধ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

আরও কিছু স্বীকার্য্য রহিয়াছে। কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের প্রতীতিও জন্মিতেছে। অথবা এমন আর একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা সেই সমুদায়ের মধ্যে সম্বন্ধানুভব।

এই সম্বন্ধ আবার নানাবিধ। এই বিবিধ জ্ঞানসমূহের বা প্রত্যয়সমূহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা সাদৃশ্য। আর একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা ভেদ। সাদৃশ্য ও ভেদ অনুসারে সমুদয় প্রত্যয় গুলিকে সাজাইবার ও চিনিয়া লইবার শক্তি আমাতে বর্ত্তমান, একথাটিও স্বীকার্য্য। এই সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দেখা, কতকগুলির সংজ্ঞা শোনা, কতকগুলির সংজ্ঞা ঘ্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ। আবার দেখার মধ্যেও ঐ অনুসারে লাল দেখা, নীল দেখা, ছোট দেখা, বড় দেখা, গোল দেখা, চেপটা দেখা ইত্যাদি আছে। এইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও অনুভূতির পক্ষেও। এই থানে এই কুকুর দেখিতেছি, ঐ থানে ঐ গরু দেখিতেছি, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। তাহার সংজ্ঞা দর্শন। একটা ভেদ আছে, যাহার দরুণ একটার নাম কুকুর দেখা, আর একটার নাম গরু দেখা; একটার নাম এইখানে, আর একটার নাম ঐখানে। ফলে আমার পাঁচরকম প্রত্যয় যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যসম্বন্ধ ও ভেদসম্বন্ধ নিরূপণ রূপ আর-একটা প্রত্যয়ও আছে।

না থাকিলে কি হইত? যদি সকল জ্ঞানই আমি একাকার দেখিতাম, যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছুই না বুঝিতাম, তাহা হইলে কি হইত? দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইচ্ছা, প্রীতি সব একাকার হইয়া, নীল পীত হরিত, শ্বেত কৃষ্ণ, আলো আঁধার, সব এক হইয়া,

একটা কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব দাঁড়াইত। মনে কর, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ভয় নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, ঘ্রাণ নাই, স্পর্শ নাই, শ্রবণ নাই, কেবল আঁধার আর আঁধার আর আঁধার, অথবা আলো আর আলো আর আলো, অথবা নীল আর নীল আর নীল—কেবলই নীল, অথবা পীত আর পীত আর পীত—কেবলই পীত। এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে তফাত করা আমাদের বুদ্ধিতে আইসে না। অর্থাৎ সকল জ্ঞান ও সকল অনুভূতি একাকার হইলে আমার জ্ঞানরাশি হয় ত থাকিত ও আমিও হয়ত থাকিতাম। কিন্তু আমার বা আমার জ্ঞানের অস্তিত্ব নিরূপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু থাকিত, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধির সুতরাং বিচারপ্রণালীর অতীত। ফলে, এইরূপ অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব, একই রকম কথা।

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক অনুভূতিই অপর অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে বিসদৃশ। একবার যাহা অনুভব হইল, তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় না। প্রতীতিমধ্যে পরস্পর কোন মিল নাই, সুতরাং কাহাকেও চিনিয়া লইবার উপায় নাই। কাহারও অস্তিত্বের পরিচয় দিবার যো নাই। এরূপ স্থলে সংজ্ঞামাত্র অসম্ভব, পরিচয়মাত্র অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এরূপ ক্ষেত্রেও অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে ভেদ করিবার শক্তি আমাদের থাকিত না।

এইখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। পথ এমনই পিচ্ছিল যে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। গাছ দেখিতেছি, বলিলে একটা বিশেষ লক্ষণযুক্ত বোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, বোধের বাহিরে তাহার কারণস্বরূপ কোন পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন করে না। আর এইটুকু প্রমাণ করে, যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপই একটা বোধ জন্মিয়াছিল,

যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ও মিলাইয়া এই বর্ত্তমান বোধটাকেও তৎসদৃশ ঠাহর করিতেছি, ও সেই বোধকে ও বর্ত্তমান বোধকে সজাতীয় অনুভব করিয়া একটা সুনির্দ্দেশ্য-লক্ষণাক্রান্ত স্থির করিয়া 'গাছ দেখা' এই নাম দিতেছি। আর একটু দেখা যাউক। 'গাছ দেখিতেছি', বলিলে যেমন সেই প্রত্যয় ছাড়া প্রত্যয়ের বাহিরে গাছনামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানে বা অনুভবে অনুভবে যে সাদৃশ্য দেখিতেছি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আমার সেই সাদৃশ্য-বুদ্ধি-সংজ্ঞক অনুভব ও ভেদবুদ্ধিসংজ্ঞক অনুভবেরই অস্তিত্ব প্রমাণ হইল, বস্তুতই যে আমার অনুভূতি ছাড়াইয়া প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে মিল আছে, ও অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল না। এইরূপ সাদৃশ্য আছে ও ভেদ আছে, আমি বোধ করি ও ধরিয়া লই; এবং সেইরূপ ধরিয়া লওয়াতেই আমার নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। যদি এইরূপ বোধ না করিতাম, যদি আমার সকল প্রত্যয়ই একাকার বুঝিতাম, অথবা কোন প্রত্যয়ের সহিত অপর প্রত্যয়ের কোন মিল না দেখিতাম, তাহা হইলে আমিই বা থাকিতাম কোথা, আর কেই বা থাকিত কোথা? আমাকে ছাড়িয়া, আমার অনুভূতি ছাড়িয়া, তাহার বাহিরে একটা কিছু আছে, এইরূপ মনে করিলে, এইরূপ কল্পনা করিলে আমার সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকই আছে, এক জোর করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই।

কতদূরে দাঁড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য-ভেদ-সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা প্রতীতি আছে। এই পর্য্যন্তের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য; অন্যথা বিচার চলে না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক কোন বিষয়ের অস্তিত্বস্বীকারে সম্প্রতি দরকার নাই। এই যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধের ও ভেদ-সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, ইহা লইয়াই চৈতন্য; অথবা ইহার অপর সংজ্ঞাই, জ্ঞানের প্রবাহ

বা চৈতন্যের ধারা। এই প্রতীতি আছে, তাই যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহা আছে; এই প্রতীতি না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিতাম না, অর্থাৎ চৈতন্য থাকিত না। গাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে পারে, অথবা থাকিতে না পারে; কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ তখন চেতনা থাকে না। যতক্ষণ চেতনা থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ততক্ষণ বর্ত্তমান জ্ঞানকে আর পাঁচটা জ্ঞানের সদৃশ অথবা বিসদৃশ বলিয়া বুঝিয়া লই; জ্ঞানসমূহের একটা ধারাবাহিকতা অনুভব করি। এবং এরূপ কি বলা চলে না যে এই কোথাও কিয়দংশে সদৃশ রূপে ও কোথাও কিয়-দংশে বিসদৃশরূপে প্রতীত এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম অথবা 'অভিধান' অথবা সংজ্ঞাই 'আত্মা' অথবা 'আমি'?

এই অর্থে আমি আছি ও আমার আত্মা আছে। ইহা স্বীকার্য্য। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্য অর্থে আত্মা আছে কিনা, তাহা বিচার্য্য এবং এই অর্থযুক্ত আত্মা ছাড়িয়া আর কিছু কোথাও আছে কিনা, তাহাও বিচার্য্য। মূল যে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ প্রমাণাতীত সত্য স্বীকার করিয়া লওয়া গেল, তাহার অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক কিনা, অথবা এই কয়টি মূল স্বতঃসিদ্ধের সহিত কতকগুলি হাতগড়া সংজ্ঞা যোগ করিলেই বিশ্বজগতের সমস্যাটা এক রকম বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য্য।

সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির কথা বলিয়াছি। এই সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি নানাবিধ ও নানাকার। যেমন দৃষ্টিজ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান দ্বিবিধ প্রত্যয়। দৃষ্টিজ্ঞানের মধ্যে আবার বর্ণজ্ঞান ও আকৃতিজ্ঞান। বর্ণজ্ঞানের ভিতর আবার নীলজ্ঞান, পীতজ্ঞান ইত্যাদি। আকৃতির মধ্যে ত্রিকোণ চতুষ্কোণ, বৃত্ত বর্ত্তুল ইত্যাদি বহুবিধ প্রত্যয়। এই সাদা

কুকুরটা, এই সাদা গরুটা, এই দুই জ্ঞানের মধ্যে সহস্র বিভেদ সত্ত্বেও একটা সাদৃশ্য বুঝি, উভয়েই সাদা, ও উভয়েই গরু, অর্থাৎ উভয়েরই চারি চারি পা ও দুই দুই কাণ, উভয়েই হাম্বা ডাকে, ইত্যাদি।

জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটা বড় রহস্যময় সম্বন্ধ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। সম্মুখে যে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আমার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি বিসদৃশ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা; এবং এই কুকুর-দেখায় ও ওই কুকুর-দেখায় অন্য কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা মাত্র পার্থক্য অনুভব করিতেছি; সম্মুখে কুকুর দেখিবার সময় আর যাহা যাহা দেখিতেছি, পার্শ্বে দেখিবার সময় সেই সেই বস্তু দেখিতেছি না। সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ। জ্ঞান দুইটী সর্ব্বাংশে অনুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ জন্মিতেছে; এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক; তাই দেশ, স্থান, বা অবস্থিতি তাহার সংজ্ঞা। তাই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, দূরে, সমীপে ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রত্যয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যেমন বর্ণবুদ্ধি, শ্রুতিবুদ্ধি, ঘ্রাণবুদ্ধি, আমার বুদ্ধিমাত্র, এই দেশবুদ্ধিও সেই হিসাবে আমার বুদ্ধিমাত্র; বস্তুতই যে আমার বাহিরে সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে দেশনামক একটা পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। একখানা আরশি সম্মুখে ধরিলেই বুঝা যাইবে যে দেশবুদ্ধি থাকিলেই দেশ থাকে না। আরশির পশ্চাতে বিস্তীর্ণ বিবিধবস্তুসমন্বিত দেশ রহিয়াছে মনে হয়, কিন্তু কেবল মনে হয় মাত্র; উহা অস্তিত্বহীন। ভাস্বরক সিংহের ও মাংসলোভী কুকুরের গল্প মনে কর।

দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর ঐখানে দেখিতেছি, কল্য সেই কুকুর সেই খানে দেখিয়াছিলাম। এ স্থলেও এই দুইটা কুকুরদর্শন রূপ বোধের মধ্যে অন্য কোন বিভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা বিভেদ দেখিতেছি; সেই বিভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক। সেই সংজ্ঞা কালগত বিভেদ। প্রথম জ্ঞানটা আর আর যে যে জ্ঞানের সহকারে আসিয়াছিল, দ্বিতীয়টা ঠিক সেই সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই। প্রথম কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রামকে দেখিয়াছিলাম, হরিকে দেখিয়াছিলাম, নবীনকে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার কিন্তু গদাধর ও বনমালীকে দেখিতেছি। তখন সূর্য্য দেখিয়াছিলাম মাথার উপর; এখন সূর্য্য অস্তাবলম্বী দেখিতেছি। এই যে বিভেদ, ইহাই কালগত বিভেদ। দেশবুদ্ধির ন্যায় কালবুদ্ধিও আমার চৈতন্যের উপাধি; বস্তুতই যে কাল নামক একটা কিছু বর্ত্তমান আছে, আমি যখন ছিলাম না তখন কাল ছিল, আমি থাকিব না অথচ কাল থাকিবে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না।

পাঁচ রকম বোধ আছে, পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। যথা বর্ণবোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ঘ্রাণবোধ। তেমনি দেশবোধ ও কালবোধ। শেষ দুইটিকে অন্যান্য বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্রপ্রকৃতিক ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া একটা বিকট রহস্যের সৃষ্টি করিবার সম্যক্ কারণ দেখি না।

হাত, পা, মাথা, বক্ষ, উদর ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর। হাতও শরীর নহে, পাও শরীর নহে, একাএক তাহারা সমগ্র শরীরের অংশমাত্র। তবে সকলকে জড়াইয়া সকলের সমষ্টিতে শরীর। হাত পা হইতে পৃথক্, মাথা উদর হইতে পৃথক্, শ্বাসযন্ত্র হৃৎপিণ্ড হইতে পৃথক্; অথচ উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অন্যের কাজ বন্ধ হয়। একটায় আঘাত লাগিলে অনেক সময়ে অন্যে আঘাত পায়, এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

অবয়বসমষ্টিকে শরীর বলা যায়। সেইরূপ দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ দেশ কাল ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধি ও অনুভূতি ও প্রতীতি জড়াইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহাই আমি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা এমন সম্বন্ধ দেখিতে পাই ; যাহাতে একটার সহিত আর একটার মিল আছে, একটা হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাপ দেখিলাম, ভয় পাইলাম, পলায়নপর হইলাম, এস্থলে এই তিনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ যে, দৃষ্টি হইতে ভীতি, ভীতি হইতে পলায়ন-চেষ্টার উৎপত্তি। বিশেষতঃ চৈতন্যের স্মৃতিসংজ্ঞাযুক্ত একটা অঙ্গ পঞ্চাশটা অনুভূতিকে এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়াইয়া রাখে যে, একটাকে ছাড়িয়া আর একটার উৎপত্তি হয় না। এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতির সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই, এইরূপ সম্বন্ধের বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও অনুভূতির ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও অনুভূতিগুলি সেই প্রবাহমধ্যে এক একটি উর্ম্মিমাত্র বা কণিকামাত্র। সংহতি দ্বারা বা যোগাকর্ষণে আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণা সমষ্টীকৃত করিয়া যেমন জলস্রোত, পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে গ্রথিত ও আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যকণা সমষ্টীকৃত করিয়া তেমনই আত্মার প্রবাহ। এইরূপেই আত্মার উৎপত্তি। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে কি না, বিচার্য।

এইখানে একটা উৎকট প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। আমরা সর্ব্বদা ভাষায় সুখ আমার, দুঃখ আমার, জ্ঞান আমার, স্মৃতি আমার, ইচ্ছা আমার ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়া এমন একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি, যাহা সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা হইতে ভিন্ন ; অথচ জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, যাহার সম্পত্তিমাত্র। চলিত হিসাবে এই যে একটা কিছু, ইহারই নাম আত্মা। অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মা বলিয়া যে পদার্থ আছে, সেই জ্ঞাতা, সেই ইচ্ছাশালী, সেই ভোগী ; জ্ঞান, ইচ্ছা,

ভোগ তাঁহারই ক্রিয়া, অথবা শক্তি অথবা অলঙ্কার স্বরূপ। চলিত হিসাবে বলিলাম, কেন না বেদান্তদর্শন আর একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া বলেন, আত্মা আছে, কিন্তু আত্মার ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি কিছুই নাই; উহা আমরা আত্মায় আরোপ করি মাত্র। বেদান্তের মত ছাড়িয়া দিয়া প্রচলিত মতের সহিত এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত মতের প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। উপরে আমার আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আত্মার সহিত অনুভূতির যে সম্বন্ধ, তাহা কতকটা দেহের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের মত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমষ্টি করিয়াই দেহ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত ছাঁটিয়া ফেলিলে আর দেহ থাকে না। কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারে আত্মার সহিত অনুভূতি, জ্ঞান, চেষ্টা প্রভৃতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত পরিচ্ছদের মত বা অলঙ্কারের মত। বসন ভূষণ অলঙ্কার সমুদয় ত্যাগ করিলেও যেমন দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াও আত্মা বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

প্রচলিত মত এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, ভোগ থাকিলেই ভোগী থাকিবে। এই জ্ঞাতা ও এই ভোগী যে, সেই আত্মা। শুধু জ্ঞানসমষ্টিকে বা ভোগসমষ্টিকে আত্মা বলিলে চলিবে না; জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই।

জ্ঞান আছে, সুতরাং জ্ঞাতা আছে। প্রশ্নটা বড়ই দুরূহ। কিন্তু রামনামে যেমন ভূত আপনার বিভীষিকাময় কায় সঙ্কুচিত করিয়া লীন ও অন্তহিত হয়, সেইরূপ যুক্তির মন্ত্রপূত দণ্ডস্পর্শে এই প্রশ্নের উৎকটতা লয় পায়।

জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, কে বলিল? আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার বা ধারণা বা কল্পনা আছে বটে; কিন্তু সেই সংস্কার ও কল্পনার সত্যতাকেই যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন

তাহার অস্তিত্বের পক্ষে স্বাধীন যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে? যাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে সত্য অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গোঁড়ায় ধরিলে চলিবে না।

ফলে আমরা যে একটা ভোক্তার ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব সচরাচর মানিয়া লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা; আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের দৈনন্দিন কারবার চালাইবার জন্য, আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের জন্য, আমাদেরই একটা কল্পনা মাত্র। ভাষায় যত শব্দ বর্ত্তমান আছে, *সকলেরই জন্য একটা পৃথক্ অস্তিত্ব নির্ম্মাণ করিতে হইলে যুক্তির চক্ষুঃ স্থির হইয়া যায়। আকাশকুসুম কল্পনাতেই আছে, অন্যত্র নাই।*

'আমি গাছ দেখিতেছি' না বলিয়া যদি দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য ও সত্যনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা বলিতে হয়, এখন একটা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বে পূর্ব্বেও জন্মিয়াছিল বলিয়া আমার অনুভূতি ও স্মৃতি সাক্ষ্য দিতেছে, এবং যাহাকে আমি 'গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি; তাহা হইলে দার্শনিকত্ব বজায় থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রা তুমুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে সঙ্কেতে ও ইসারায় আমাকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে, সেখানে সঙ্কেতটা প্রয়োগের ও ব্যবহারের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছে কি না, এই খুটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শত্রু সম্মুখীন হইলে ভোঁতা তলোয়ারও ব্যবহার করিতে হয়।

তবে দার্শনিক, শত্রুসংহার যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ধারাল হাতিয়ার নির্ম্মাণই যাঁহার ব্যবসায়, তিনি ইস্পাত লইয়া ও শাণ লইয়া খুঁটিনাটি করিতে ছাড়িবেন না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের বিশুদ্ধি পরীক্ষায় অবকাশ পায় না। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষকের হস্তে পরীক্ষাকালে বিশুদ্ধ জলেরও এমন শোচনীয় পরিণাম হয়, যাহাতে তাহার আর জলত্ব থাকে না।

বাহ্য জগৎ কতকগুলি খণ্ড-প্রত্যয়ের সমষ্টি। সেই খণ্ডপ্রত্যয়ের মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই অনুভব হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি। এই সম্বন্ধ নানাবিধ। 'ক' ও 'খ' উভয়ে একটা সম্বন্ধ আছে 'গ'; 'চ' ও 'ছ' উভয়ের মধ্যে আর একটা সম্বন্ধ আছে 'জ'; আবার 'গ' ও 'জ' এই উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা 'ট'। এইরূপে সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ মিলাইয়া একটা নূতন সম্বন্ধ অনুভব করি। আবার তাহার সহিত আর একটা সম্বন্ধ মিলাইয়া আরও একটা সম্বন্ধ অনুভব করি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধের অনুভবেই আত্মার বিকাশ বা অভিব্যক্তি; ইহাতেই চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের সংক্ষেপে সংজ্ঞা দিই। সেই সংজ্ঞাগুলি—'প্রাকৃতিক নিয়ম।' আমি সম্বন্ধ অনুভব করিয়া থাকি বলিয়াই প্রাকৃতিক নিয়মের আমা হইতে উৎপত্তি। এই অনুভব না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়ম থাকিত না, অথবা প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম না। এই অনুভূতি যত তীক্ষ্ণ ও প্রবল হয়, ততই বাহ্য প্রকৃতিকে নিয়মানুগত দেখি। ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বর্ত্তমান আছে, একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; প্রকৃতিতে নিয়ম আমি দেখিতে পাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। সম্প্রতি আমার যে অবস্থা, তাহাতে আমি প্রকৃতির খানিকটা নিয়মানুগত দেখি, আর খানিকটা অনিয়ত ও খাপ্-ছাড়া বোধ হয়। যে অবস্থায় নিয়মবদ্ধের ভাগ বাড়িয়া আইসে ও খাপ্-ছাড়ার ভাগ কমিয়া আইসে, সে অবস্থাকে আত্মার উন্নতির বা অভিব্যক্তির অবস্থা বলা যায়।

এইরূপ সাদৃশ্য অনুভবে বা নিয়ম স্বীকারে একটা লাভ আছে, দেখা যায়। যখন এই সাদৃশ্য অনুভবেই আত্মবোধ বা অহংকার, তখন এই সাদৃশ্যানুভূতির সূক্ষ্মতায় আত্মবিকাশ বুঝিতে হইবে। আমার একটা কাজ অন্তর্জগতের সহিত বাহ্য জগতের আদানপ্রদান। অন্ত-

র্জগৎ বাহ্যজগৎ হইতে আপন পুষ্টিসাধন করিতেছে, আবার সময়ে সময়ে বাহ্য জগতের আক্রমণে পরাহত ও ক্ষীণ হইতেছে। উভয় জগতের আদানপ্রদান কার্য্যটার ফলে মানসিক শ্রম। প্রকৃতিতে যতই নিয়মের আবিষ্কার করা যায়, মানসিক শ্রমের ততই সংক্ষেপ হয়; যতই সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতে ব্যাপকতর নিয়মে আসা যায়, মানসিক শ্রমের ততই সংক্ষেপ সাধন হয়। এবং এই মানসিক শ্রমসংক্ষেপেই বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের লেনা-দেনা শৃঙ্খলার সহিত ঘটিয়া থাকে। বক্তার বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যেমন প্রচলিত লিপিবিদ্যায় পোষায় না, আরও সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়; সেইরূপ প্রকৃতির বড় বড় জটিল সম্বন্ধগুলি যত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞার ভিতর ফেলিতে পারা যায়, ততই জীবনের চেষ্টা ফলবতী হইয়া থাকে। ফলে মানসিক শ্রমসংক্ষেপের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতিতে নিয়মের আবিষ্কার।

এই পর্য্যন্ত যে সকল জটিল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহার একবার সংক্ষেপে আলোচনা আবশ্যক। আমরা দুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি; প্রথম, অনুভূতি প্রতীতি প্রভৃতির অস্তিত্ব; দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্যবোধের ও ভেদবোধের অস্তিত্ব। প্রকৃত পক্ষে আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ একটা সাদৃশ্য বা ভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই ও দরকারও নাই। এই সাদৃশ্যবোধ ও ভেদবোধ দ্বারা প্রত্যয়গুলিকে একটা বিশেষ প্রণালী-মতে সাজাইয়া লই। যাহাকে আত্মা বলি, তাহার প্রধান পরিচয়ই এই যে, এই আত্মা তাহার অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত খণ্ডপ্রত্যয়গুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ চিনিয়া লইতে পারে ও আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে। আত্মার এই সংজ্ঞা। বিবিধ ভেদবুদ্ধির মধ্যে দুইটা ভেদের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—দেশভেদ ও কালভেদ। এই দেশগত ভেদ ও কালগত ভেদ অনুসারে আত্মা সমুদয় অনুভূতিগুলিকে সাজাইয়া নিরীক্ষণ করে।

যে অংশে দেশগত ভেদ দেখিতে পায়, তাহাকে বাহ্য জগৎ নাম দিয়া, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্তর্জগৎ অভিধান দিয়া, উভয়ের স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে। বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের কতকগুলি সম্বন্ধ দেখা যায়। তাহাদের সংজ্ঞা রূপ-রস-শব্দাদি। অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার একটা বিশেষ পদ্ধতির সহিত চালাইলে জীবনরক্ষা সুকর হয়। মানসিক শ্রমসংক্ষেপ সেই পদ্ধতি। এবং বাহ্য জগতে নিয়মের আবিষ্কারে মানসিক শ্রম সংক্ষিপ্ত হয়; সেইজন্যই আমরা বাহ্যজগৎকে নিয়মানুযায়ী করিয়া লই।

আত্মা অবিনাশী কি ধ্বংসশীল, এক্ষণে কতকটা বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ এই বাক্যটার অর্থগ্রহের চেষ্টা করা যাক্। আত্মার ধ্বংস আছে বলিলে বুঝিতে হয় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আত্মত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ সেই ক্ষণের পূর্ব্বে আত্মা ছিল, তাহার পর আত্মা থাকে না। সেইরূপ, আত্মার ধ্বংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বে দেহ ছিল, তদাশ্রয়ে আত্মা ছিল; সেইক্ষণের পর দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মা থাকিয়া যায়। যাঁহারা আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন ও যাঁহারা করেন না, এই উভয় পক্ষই কালরূপ একটা আত্মেতর পদার্থ মানিয়া লয়েন; কাল নামে একটা সত্তা অনাদি ও অনন্ত; এক পক্ষের মতে, যাঁহারা আত্মার ধ্বংস মানেন তাঁহাদের মতে, আত্মা কালের কিয়দংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অন্য পক্ষের মতে, যাঁহারা আত্মাকে অবিনাশী বলেন তাঁহাদের মতে, আত্মা তাহার সমগ্র ভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যে অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কাল তাহারি একটা উপাধি মাত্র। পাঁচটা ভেদবুদ্ধি লইয়া আত্মা; কাল-বুদ্ধি তন্মধ্যে একটা। আত্মা আপনার অন্তর্গত অনুভূতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই রকমে সজ্জিত করিয়া নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লয়; কাল এই দুইয়ের মধ্যে অন্যতর সজ্জা। কাল আত্মার

আত্মনিরীক্ষণের একটা প্রণালীমাত্র। কালবুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞান-গুলি একরকমে পরস্পর জড়াইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইত না, সুতরাং আত্মারও আত্মবুদ্ধি অসম্ভব হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে আত্মা ছাড়িয়া কাল নাই। আত্মার ধ্বংস হইবে অমুক সময়ে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন সময়ে, এরূপ বাক্যের অর্থ হয় না।

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইতে পারে; কিন্তু আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

যাঁহারা জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোগাতিরিক্ত ভোক্তা, এইরূপ কোন একটা অর্থে আত্মা শব্দের ব্যবহার করেন, এবং জ্ঞান আছে ও ভোগ আছে, সুতরাং জ্ঞাতা ও ভোক্তা নিশ্চয়ই থাকিবে, এইরূপে সেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী কতকটা বিপর্য্যস্ত। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা আমাদের অনুমান বা কল্পনামাত্র, তাহা কোন যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তবে যদি কেহ গায়ের জোরে বলেন, জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোক্তা একটা কিছু স্বতন্ত্র বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের সেই উক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু প্রমাণ নাই। সেরূপ একটা কিছু থাকিতে পারে; তবে আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমি আছি, ইহা সত্য। এস্থলে 'আমি' অর্থে কি বুঝায়, তাহা উপরে যথাসাধ্য খুলিয়া বলিলাম। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, প্রতীতি আছে, সুখদুঃখ আছে, অতএব আমি আছি। এই সকল লইয়াই আমি। এই সকল উপাদানে যাহাকে নির্ম্মাণ করি, সেই আমি। এই সকল যৎপ্রতি আরোপ করি, সেই আমি। এই সকল আছে স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কিছুই থাকেনা; মাধ্যমিক বৌদ্ধদের মতের অনুযায়ী শূন্যে পরিণত হয়। এই সকল আছে, স্বীকার করিলাম। কাজেই আমি

আছি, স্বীকার করিলাম। যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়াই আমি। আমা ছাড়া কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না। ইহা কিন্তু খাঁটি বেদান্ত। বৌদ্ধে ও বৈদান্তিকে এইখানে গোঁড়ায় তফাত। বৌদ্ধ বলেন, কিছুই নাই; জ্ঞান বুদ্ধি প্রতীতি, সুখ ও দুঃখ, সমস্তই কল্পনা; আছে মনে করিতেছি মাত্র, কিন্তু এইরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই; এইরূপ মনে করাই অবিদ্যা বা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি হইতে বিশ্বজগতের ও সংসারের উৎপত্তি ও আমারও উৎপত্তি। ফলে, কি আছে ইহার উত্তর দিতে গেলে কিছুই নাই বলাই ভাল। যাহা আছে, তাহা শূন্য। অতএব বৌদ্ধ বলিলেন—নাস্তি। বৈদান্তিক বলিলেন, তা কেন হইবে? যাহা দেখিতেছ, তাহাই আছে। নাস্তি নহে—অস্তি। কে আছে? আমি আছি। সেই আমি কে? যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়াই আমি। যাহা কিছু বাহিরে দেখিতেছ, যাহা কিছু ভিতরে দেখিতেছ, সবই আমার। যাহা পূর্ব্বে ছিল মনে কর, যাহা এখন আছে মনে কর, যাহা পরে হইবে বিবেচনা কর, সে সকল লইয়াই আমি। চন্দ্র সূর্য্য ছায়াপথ নীহারিকা আমি বাহিরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি; যজ্ঞদত্ত দেবদত্ত রাম শ্যামকে আমি বাহিরে প্রেরণ করিয়াছি; সুখদুঃখ শীতগ্রীষ্ম শোকতাপ আমি অন্তরে রাখিয়াছি। আমার কিয়দংশ অতীত, কিয়দংশ বর্ত্তমান, কিয়দংশ ভবিষ্যৎ। কেন? এইরূপ করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত, বিশ্লিষ্ট, ছিন্ন, ভিন্ন করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রয়োজন কি? উত্তর, ইহা আমার মায়া, আমার লীলাকৈবল্য। এইরূপ করি বলিয়াই আমি আছি। অন্ততঃ এইরূপ করাই আমার স্বভাব। যাহা আছে, যাহা ছিল, যাহা থাকিবে, সকলই লইয়া আমি; অথবা আমার কিয়দংশকে আমি বর্ত্তমান দেখি, কিয়দংশকে অতীত দেখি, কিয়দংশকে ভবিষ্যৎ দেখি। কেন দেখি? উহা আমার মায়া, আমার স্বভাব, আমার লীলা। ঐরূপ না দেখিলে বোধ হয় আমাকে

দেখিতে পাইতাম না। জ্ঞান সত্য, আমি সত্য, কিন্তু জ্ঞাতা সত্য নহে। আমি জ্ঞাতা নহি। আমি ভোক্তা নহি। জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব যদি আমি আমাতে আরোপ করি, সে ভ্রম, সে অবিদ্যা। আমার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব নাই। আমি জ্ঞাতাও নহি, আমি ভোক্তাও নহি; আমি আছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। আমি কখনও ছিলাম না ইহা অসম্ভব। আমি ছিলাম না, তবে কি ছিল? আমা ছাড়া কিছু নাই, কিছু থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু ছিল বা আছে বা থাকিবে, তাহা আমি। অতএব আমি ছিলাম না, ইহা অসম্ভব। আমি থাকিব না, ইহাও অসম্ভব। কেন না আমা ছাড়া কিছু থাকিতে পারে না। কেন না যাহা কিছু ছিল, বা আছে, বা থাকিবে, তাহা লইয়াই আমি। আমি থাকিব না, তবে কি থাকিবে? জ্ঞাতাও থাকিবে না, জ্ঞেয়ও থাকিবে না; কেননা জ্ঞাতা জ্ঞেয় আমাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই; উহা আমার কল্পনা বা আমার সৃষ্টি, বা আমার মৎপ্রতি আরোপ। আমি থাকিব না, কি থাকিবে? কাল থাকিবে? শূন্য ঘটনাহীন কাল থাকিবে? মিথ্যা কথা। আমি না থাকিলে কাল থাকিতে পারে না। আমিই আমাকে কালে বিক্ষিপ্ত করি; আমিই আমাকে ত্রিধা ভিন্ন করি; ত্রিধা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখি; ত্রিকালে আমাকে ছড়াইয়া দেখি। উহা আমার মায়া, আমার লীলা। কাল আমারই আত্মনিরীক্ষণের রীতি বা প্রণালী। কাল আমারই সৃষ্টি, আমারই কল্পনা। আমি কালের সহব্যাপী, অথবা কালই আমার সহব্যাপী। আমি থাকিব না, কাল থাকিবে, আমা-হীন কাল থাকিবে, ইহা অর্থ-হীন। আমাকে যদি আত্মা বল, তাহা হইলে আত্মা বিনাশী কি আত্মা অবিনাশী, এ প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। এ প্রশ্নই হয় না। এ প্রশ্ন করিলেই আমা-ছাড়া স্বতন্ত্র কালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র কাল কিছুই নাই। আমি বিনাশী বলিলে বুঝায়, আমি থাকিবনা, কাল থাকিবে। ইহা অর্থশূন্য; কেননা

আমি না থাকিলে আবার কাল কি লইয়া থাকিবে? কাল ত আমারই কল্পনা। আমি অবিনাশী বলিলে বুঝায়, আমিও থাকিব, কালও থাকিবে, কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব। সমগ্র অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া থাকিব। ইহারও অর্থ হয় না। কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, এ কি কথা? কালই আমাকে ব্যাপিয়া থাকিবে বরং সঙ্গত হইতে পারে। তাহাও সঙ্গত কিনা বিচার্য্য। আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তরদানের চেষ্টা মূঢ়তা।

বর্ণ-রহস্য

প্রকৃতিতে আমরা বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে গোটাকতক স্থূল কথা বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

প্রথমেই এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ণ কয়প্রকার? সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, বর্ণ সাত প্রকার। এই উত্তরের একটা ভিত্তি আছে। রাম-ধনুতে আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলো একটা কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে নানা রঙ দেখা যায়। শাদা আলোক ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কিরূপে মৌলিক বর্ণগুলি বাহির করিতে হয়, তাহা নিউটন প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। একটা খুব সরু লম্বা ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোক লইয়া যাইতে হইবে। পরে সেই আলোক একখানা তিনকোণা কাচের কলমের ভিতর চালাইলে একটা পাঁচ-রঙা আলো দেওয়ালের গায়ে পড়িবে। কেহ কেহ এই খানে বলিবেন, পাঁচ-রঙা না বলিয়া সাত-রঙা বলাই উচিত। এই আলোর ভিতরে রক্ত, অরুণ, পীত, হরিৎ, নীল, ইণ্ডিগো ও বেগুনী

এই সাত রঙের বিকাশ দেখা যাইবে। কিন্তু এইরূপ বর্ণনায় একটু দোষ আছে। আসল কথা, সেই আলোর মধ্যে আমরা নানা বর্ণের বিকাশ দেখি। এক পাশে থাকে লাল, অন্যপাশে থাকে বায়লেট। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে নানাবিধ রঙ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। ভাষাতে অত গুলা শব্দ নাই ও নাম নাই, কাজেই আমরা পাঁচ রঙ ছয় রঙ বা সাত রঙের নাম করি। বস্তুতঃ হরিৎ ও পীত এই দুইয়ের মাঝেই নানাবিধ বর্ণ থাকে। কোনটা পীতাভ হরিৎ, কোনটা হরিদাভ পীত। তফাত আছে, অথচ সেই তফাত দেখাইবার জন্য ভাষায় নাম ও শব্দ নাই; কাজেই ভাষাতে কুলায় না।

প্রকৃত পক্ষে শাদা আলোর মধ্যে পাঁচ রকম বা সাত রকম মাত্র রঙ আছে বলিলে ভুল হয়। এত রঙ আছে যে আমরা তাহাদের সকলের নাম দিতে পারি না। পীতবর্ণ আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিতে দাঁড়ায়, হরিৎ আস্তে আস্তে নীলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই পীত ও হরিতের মাঝামাঝি কত রঙ আছে ও হরিৎ ও নীলের মাঝামাঝি আবার কত রঙ আছে, তাহা বলাই যায় না। ভাষা এখানে পরাস্ত। আমরা এই অসংখ্যেয় বর্ণগুলিকে সোজাসুজি সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করি। কতকগুলাকে বলি রক্ত, তাহারা রক্তশ্রেণীভুক্ত; কতকগুলা পীত বা পীতশ্রেণীভুক্ত ইত্যাদি।

কাজেই সূর্য্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে অ... ও বিবিধ বর্ণের আলোক পাওয়া যায়। এই বর্ণগুলিকে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণ বলিব। বিশুদ্ধ বর্ণের অর্থ কি? সূর্য্যের আলো নিউটনের প্রণালী মতে কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে যে সকল বর্ণ দেখা যায় তাহাই বিশুদ্ধ বর্ণ।

রামধনুতে যে সকল আলোক দেখা যায়, তাহারা এই বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক। প্রকৃতিদেবী এখানে নিউটন সাজিয়া জলকণাকে কাচের

কলমে পরিণত করিয়া শুভ্র সূর্য্যালোককে বিবিধ অগণ্য বিশুদ্ধ বর্ণের আলোকে বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু চারিদিকে প্রাকৃতিক পদার্থে আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিয়া থাকি, তাহারা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। এই সংখ্যাতীত বিশুদ্ধ বর্ণ সেওয়ায় আরও সংখ্যাতীত অবিশুদ্ধ বর্ণের অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে পীত, যে হরিৎ, যে নীল দেখা যায়, তাহারা প্রায়শই বিশুদ্ধ পীত, বিশুদ্ধ হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল হয় না। কেননা উহার প্রত্যেক রঙকে কলম দিয়া বিশ্লেষণ করিলে নানা রঙ পাওয়া যাইতে পারে। আবার তদ্ভিন্ন পাটল, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ আমরা দেখিয়া থাকি, তাহারাও বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে এই সকল পাটল পিঙ্গলাদি রঙ পাওয়া যায় না। এইজন্য ইহাদিগকে অবিশুদ্ধ বলিতেছি। তবে বিশুদ্ধ বর্ণের আলো বিবিধ পরিমাণে মিশাইয়া এই সকল অবিশুদ্ধ মিশ্র বর্ণের উৎপাদন করিতে পারা যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে বর্ণ তত্ত্বের শেষ কথা বলা হয় না। আরও ভিতরে যাইতে হইবে। আসল কথা, বর্ণমাত্রই, নীলই বল, আর পীতই বল, বর্ণমাত্রই কেবল আমাদের একটা উপলব্ধি বা প্রতীতির প্রকারভেদ মাত্র। শব্দ একটা জ্ঞান, তাহারও আবার সহস্র প্রকার-ভেদ আছে; ঘ্রাণ একটা জ্ঞান, তাহার সহস্র প্রকারভেদ আছে। সেইরূপ বর্ণও একটা সহস্রপ্রকারভেদযুক্ত বিশেষ রকমের জ্ঞান।

ঐ খানে সবুজ রঙের গাছটা রহিয়াছে; এইখানে আমি রহিয়াছি। সবুজ রঙটা বস্তুতঃ গাছের নহে। আমার ঐ অনুভূতি মনের মধ্যে জন্মিয়া ঐখানে গাছের অস্তিত্ব আমাকে দেখাইয়া দিতেছে। আমার মনে ঐ অনুভূতিটা জন্মিতেছে; তাহা দেখিয়া আমি অনুমান করিতেছি, যে আমার বাহিরে ঐ স্থানে ঐ গাছ পদার্থটা রহিয়াছে, যাহার অস্তিত্বের কল্পনা আমার এই অনুভূতি হইতেই উৎপন্ন। অর্থাৎ

ঐ অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া আমাকে গাছের অস্তিত্বের কল্পনায় সমর্থ করিতেছে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু বেশী বলে। পদার্থবিদ্যা কল্পনা করে যে ঐ গাছের ও আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত কঠিন অথচ চক্ষুর অগোচর পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, সে পদার্থটা ঐরূপ ভাবে মাঝে না থাকিলে ওখানে গাছ থাকিলেও আমার ঐ সবুজ বর্ণের অনুভূতি জন্মিত না। সেই মধ্যবর্ত্তী পদার্থটার ইংরাজী নাম ঈথার; বাঙ্গালায় উহাকে আকাশ বলা যাইতে পারে। গাছের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সেই আকাশে ছোট ছোট ধাক্কা দিতেছে; সেই ধাক্কাগুলি সেই কঠিন আকাশ কর্তৃক বাহিত হইয়া ও চালিত হইয়া আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। এক এক ধাক্কাতে এক একটি ঢেউ জন্মিতেছে। বীণাযন্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিলে যেমন তারে ঢেউ জন্মে; জলের পৃষ্ঠে ঘা দিলে যেমন জলে ঢেউ জন্মে; শস্যক্ষেত্রে ঊর্দ্ধশীর্ষ গাছগুলির শীষে ও পাতায় বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা সেইরূপ। পদার্থবিজ্ঞান কেবল এইটুকু বলিয়াই নিরস্ত হয় না। সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, ধাক্কা মিনিটে কতবার পড়িতেছে, এবং কি বেগেই বা ধাক্কাগুলি গাছের নিকট হইতে সঞ্চারিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাও গণিয়া দেয়।

পদার্থবিজ্ঞান যে যুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে এবং এই ঢেউগুলির আকারপ্রকার সম্বন্ধে বিবিধ গণনা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহার অবতারণা চলিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে তুমি মাপকাঠি দিয়া গাছটার দৈর্ঘ্য মাপিয়া আমাকে বলিলে সেই মাপে আমার যতটা আস্থা জন্মিবে, আকাশের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্যসম্বন্ধে ও তাহার সংখ্যাসম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ

যে মাপ করিয়া দেন, তাহাতে আমার আস্থা তার চেয়ে অনেক বেশী; এবং ঐ প্রত্যক্ষ গাছটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে রকমের বিশ্বাস যতখানি আছে, আমার চক্ষুর অবিষয় আকাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সেইরূপ বিশ্বাস তার চেয়ে কোন অংশে কম নহে।

এখন পদার্থবিজ্ঞান শাদা আলো ও রঙিল আলোর সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছে, দেখা যাউক। সূর্য্যের আলো শাদা দেখায়, কিন্তু সূর্য্যের আলো আকাশে এক রকমের ঢেউ নহে। উহার ভিতরে নানাবিধ ঢেউ আছে। নানাবিধ কি অর্থে?—না, কোনটা বা একটু বড়, কোনটা বা একটু ছোট। একই জলাশয়ের পৃষ্ঠে লম্বা লম্বা বড় বড় তরঙ্গ উঠিতে পারে, আবার খাট খাট ছোট ছোট ঊর্ম্মিও উঠিয়া থাকে; কতকটা সেইরূপ। এই ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ আসিয়া চক্ষুর ভিতরের একখানা স্নায়বীয় পরদায় ধাক্কা দেয়; ও সেই ধাক্কা ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে পৌঁছিয়া নানাবিধ অর্থাৎ নানাজাতীয় —কেমন তাহা ঠিক্ বলা যায় না—আণবিক গতির উৎপাদন করে। এবং এই এক এক রকম আণবিক গতির সঙ্গে এক এক রকম বর্ণের অনুভূতি জন্মে। রঙটা হইল একটা মানসিক ব্যাপার; গাছ হইতে রঙ আসে না, গাছ হইতে আসে ধাক্কা—বর্ণহীন ঘ্রাণহীন নীরব ধাক্কা—তোমার পৃষ্ঠে কিল দিলে যেমন বর্ণহীন ঘ্রাণহীন ধাক্কা উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ধাক্কা। এই ধাক্কা শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে যায়, সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই বিকার—সেই অনুভূতি—রঙের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক্ যেমন আমার হস্তপ্রযুক্ত কিলরূপী ধাক্কা তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনারূপী মানসিক বিকার বা অনুভূতির উৎপত্তি হয়, তেমনি। ফলে রঙটা আছে মনে; উহা গাছে নাই, গাছ হইতে আগত ধাক্কা অথবা ঢেউগুলিতেও নাই। কোনটা

বড় ঢেউ, কোনটা ছোট ঢেউ; কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পড়িতেছে, কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়িতেছে। এই সকল নানাজাতীয় অর্থাৎ ছোট বড় নানা আকারের ঢেউয়ের মধ্যে কোনটার সঙ্গে রক্তানুভূতির, কোনটার সঙ্গে পীতানুভূতির, কোনটার সঙ্গে নীলানুভূতির সংস্রব রহিয়াছে। একটা আসিয়া ধাক্কা দিলে রক্ত অর্থাৎ একটা বিশেষ রক্তবর্ণের জ্ঞান জন্মায়। মনে রাখিও, রক্তই এত নানাবিধ আছে, যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আবার একটা বিশেষরূপ ঢেউ লাগিলে বিশেষরূপ নীলের অনুভূতি জন্মায়; ইত্যাদি।

সূর্য্যের আলো আসিতেছে বলিলে বুঝিবে আকাশ বাহিয়া নানাবিধ ছোট বড় ঢেউ আসিতেছে। সকল ঢেউ চলে একই বেগে;—সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে। কিন্তু কোনটা একটু দীর্ঘ, কোনটা একটু খাট। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় গজ ফুট ইঞ্চির মাপকাঠির ব্যবহার চলে না; তাহারা এত ক্ষুদ্র, যে ইঞ্চিকে দশ লক্ষ ভাগ করিয়া তাহারই মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এরই মধ্যে আবার যে একটু লম্বা, সে লাল জ্ঞান জন্মায়। যে আরও ছোট; সে পীতজ্ঞান জন্মায়। আরও ছোটতে হরিৎ; আরও ছোটতে নীল। আবার কতকগুলি ঢেউ এত বড় বা এত ছোট, যে চক্ষুযন্ত্রের বন্দোবস্তের দোষে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না অথবা পৌঁছিলেও কোনরূপ বর্ণজ্ঞান জন্মায় না।

আর একবার আগাগোড়া ভাবিয়া দেখা যাউক। অসংখ্য বর্ণের মধ্যে কতকগুলাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছি,—এইগুলি সূর্য্যের আলোককে নিউটনের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়; আর কতকগুলাকে অবিশুদ্ধ বা মিশ্র বলিয়াছি,—ইহারা ঐরূপে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যের আলোকে বিদ্যমান থাকে না, তবে বিবিধ দ্রব্যের পিঠ হইতে যে যে আলো আসে তাহাতে থাকে। বিশুদ্ধ বর্ণ-

গুলির এক একটির সহিত একএকটি নির্দ্দিষ্টদৈর্ঘ্যযুক্ত আকাশের ঢেউয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে ;—যখন সেই সেই ঢেউ একা আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন সেই সেই বিশুদ্ধ বর্ণ অনুভূত হয়। আর অবিশুদ্ধ বর্ণগুলা, যখন পাঁচ রকমের ঢেউ একযোগে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনই অনুভূত হয়।

আকাশের ছোট বড় ঢেউগুলি একাএক আসিয়া বিশুদ্ধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায় ; কোন ঢেউ লোহিত, কোনটা পীত, কোনটা নীলের জ্ঞান জন্মায় ; আর ছোট বড় ঢেউ মিলিয়া একত্র আসিলে অবিশুদ্ধ পাটল পিঙ্গলাদির জ্ঞান দেয়। এ পর্য্যন্ত ঠিক্। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। পীত বর্ণ সূর্য্যালোকে আছে, উহা বিশুদ্ধ বর্ণ ; নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত ঢেউএ ঐ পীতবর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু সেই পীতবর্ণের জ্ঞান আবার অন্যরূপেও জন্মিতে পারে। লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ যদি একসঙ্গে একযোগে ধাক্কা দেয়, তাহাতেও পীত বর্ণের জ্ঞান জন্মে। এখানে সেই পীতকে বিশুদ্ধ বলিব, কি অবিশুদ্ধ বলিব ? পীতের ঢেউ একা আসিয়া যে জ্ঞান জন্মায় ; লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ একত্র আসিয়াও ঠিক্ সেই জ্ঞান জন্মায় ; কাজেই কোন আলো পীত বর্ণের বোধ হইলে তাহা খাঁটি পীত না হইতেও পারে ; উহা লাল আলো ও সবুজ আলো মিশিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ না করিলে ঠিক্ বলা যাইবে না, উহা খাঁটি পীত কি ঝুটা পীত।

এক রকমেরই জ্ঞান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেতু। এক রকমের ঢেউ ধাক্কা দিয়া যে জ্ঞান জন্মায় ; পাঁচ রকমের ঢেউ একসঙ্গে ধাক্কা দিয়াও ঠিক্ সেই জ্ঞান জন্মাইতে পারে।

ফলে বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু বিশুদ্ধ মূল বর্ণজ্ঞানের সংখ্যা তিনটি মাত্র। মৌলিক বর্ণজ্ঞান কেবল তিনটি ;—রক্ত, হরিৎ ও নীল ;— নির্দ্দিষ্ট রক্ত, নির্দ্দিষ্ট হরিৎ, নির্দ্দিষ্ট নীল। মৌলিক জ্ঞান তিনরকম ;

এই তিনটা জ্ঞান বিবিধপরিমাণে মিশিয়া বিবিধ যৌগিক জ্ঞানের উৎপত্তি করে। যেমন, রক্ত জ্ঞানে ও হরিতের জ্ঞানে মিশিয়া পীতের জ্ঞান হয়।

এই তিন মূল বর্ণ দেওয়া থাকিলে তাহাদিগকে নানা রকম ভাগে মিশাইয়া অন্যান্য সমুদয় বর্ণ তৈয়ার করা চলে। দুই ভাগ রক্তের সহিত পাঁচ ভাগ হরিৎ মিশাইলে কোন একটা বর্ণ হয়, সাত ভাগ নীল মিশাইলে আর একটা বর্ণ হয়। আবার রক্ত হরিৎ ও নীল নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিশাইলে শাদা হয়। মৌলিক বর্ণ অসংখ্য নহে। তিনটা মাত্র। তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণের বিবিধবিধানে মিশ্রণে ও সমবায়ে সূর্য্যের আলোকে বর্ত্তমান সমুদয় বিশুদ্ধ বর্ণ তৈয়ার করিতে পারা যায়; এবং এই সকল শেষোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণ বিবিধবিধানে মিশাইয়া অন্যান্য যাতীয় পাটল কপিশাদি বর্ণের উৎপাদন চলে। বর্ণ না বলিয়া বর্ণজ্ঞান বলা ভাল। ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণের মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ জন্মে না বলিয়া ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণজ্ঞান মিশিয়া নানাবিধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, বলা ভাল।

একটা বিশেষপ্রকার ঢেউ অর্থাৎ যে ঢেউ আসিয়া চোখে ধাক্কা দিলে একটা বিশেষরকম বর্ণ হয়, সে ঢেউ দ্বারা অন্য বর্ণের অনুভূতি হইবে না ইহা ঠিক্। কিন্তু সেই বর্ণের অনুভূতি জন্মিলেই যেন মনে করিও না যে সেই ঢেউ আসিয়াই ধাক্কা দিতেছে। অন্য পাঁচ রকমের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিয়াও সেই একই অনুভূতি জন্মাইতে পারে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে এমন কি বৈচিত্র্য আছে, যাহাতে এই অপরূপ ব্যাপার ঘটে; নানাবিধ ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দেয়, অথচ তিনরকম মাত্র মৌলিক বর্ণের বোধ জন্মে; ও সেই তিন বর্ণবুদ্ধি বিবিধ বিধানে মিলিয়া সংখ্যাতীত বর্ণবুদ্ধির উৎপাদন করে? ইহা শরীর-বিদ্যার বিষয়। এস্থলে তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

সূর্য্যের আলোক শাদা। ইহাতে নানাবিধ আকারের ঢেউ আছে; ইহার মধ্যে কোন ঢেউ মৌলিক লোহিতের, কেহ মৌলিক হরিতের, কেহ

মৌলিক নীলের বোধ জন্মায়। কেহ বা লোহিত ও হরিৎ উভয় উৎপাদন করিয়া উভয় মিশাইয়া পীতবুদ্ধি জন্মায়; ইত্যাদি। এবং সকলে আসিয়া একত্রে চোখে ধাক্কা দিয়া লোহিত, হরিৎ ও নীল তিন মিশাইয়া শাদার উৎপাদন করে। এই তিন মূল বর্ণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ভাগ অনুসারে একত্র করিলে শাদা হয়। একটার ভাগ কিছু কম হইলেই আলো রঙিল হইয়া যায়। কাজেই শাদা আলোতে যে সকল ঢেউ বর্ত্তমান, সেই ঢেউগুলার মধ্যে কোন কোনটাকে বাছিয়া লইলেই রঙিল আলো হয়; বা কোন কোনটা কোনরূপে সরাইয়া ফেলিলেও রঙিল আলো পাওয়া যায়। কাজেই রঙিল আলো তৈয়ার করিতে চাও ত, সূর্য্যালোকের অন্তর্গত বিবিধ ঢেউয়ের মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লও; অথবা কতকগুলিকে কোনরূপে সরাইয়া ফেল। আলোর শুভ্রত্ব বজায় রাখিবার জন্য তিনটা মূল বর্ণের যে যে ভাগ প্রয়োজন, তাহার একটা ভাগ কম পড়িয়া যাইবে, আলোকও রঙিল হইয়া পড়িবে।

এই বাছিয়া লওয়া বা নির্ব্বাচন কার্য্য ও সরাইয়া ফেলা বা অপসারণ কার্য্য কয়েকটি উপায়ে সম্পাদিত হয়। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম উপায়। সূর্য্যের আলো বায়ুর মধ্য হইতে জল বা তেল বা কাচের মত কোন ঘন সংহত স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর গেলে তাহার রাস্তা ঘুরিয়া যায়। কেন যায় সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সকল ঢেউ আবার সমান ঘুরিয়া যায় না। লোহিতজনক ঢেউ যত ঘুরে, পীতজনক তার চেয়ে বেশী ঘুরে, হরিৎজনক তার চেয়ে বেশী, নীলজনক আরও বেশী; এইরূপ।

কাজেই শাদা আলোর অন্তর্গত ঢেউগুলি এইরূপ সংহত স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়াই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলিতে

আরম্ভ করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া বায়ুমধ্যে আসে, তখন আর মিশিবার অবকাশ না পাইলে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে থাকে। এক এক রকমের ঢেউ এক এক রাস্তায় চলিতে থাকে; পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তখন তাহাদের মধ্যে কোন একটিকে বা কতকগুলাকে বাছিয়া লওয়ার সুবিধা হয়। কতক-গুলি চোখে প্রবেশ করিয়া ধাক্কা দিলেই রঙিল আলো পাওয়া যায়। এইরূপে ঢেউগুলিকে পরস্পর হইতে তফাত করিয়া তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলাকে আলোক-বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বর্ণ-উৎপাদনের এই একটা উপায়। নিউটন এই উপায়েই সূর্য্যালোকের প্রকৃতিনির্ণয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপায়। ঢেউগুলা যতক্ষণ আকাশ পথে চলে, ততক্ষণ কেহ তাহাদের গতিরোধ করে না। কিন্তু চলিতে চলিতে কোন জড় পদার্থের বাধা পাইলেই তাহাদের গতিবিধির ব্যতিক্রম ঘটে। সেই জড় পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতকগুলা ঢেউ ফিরিয়া আসে, কতক-গুলা হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহার পথ বাঁকিয়া যাইতে পারে, তাহা উপরে বলিয়াছি। আবার কতকগুলা ঢেউ হয়ত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, রাস্তা কাটিয়া চলিয়া যাইতেও পারে না; তাহারা সেই জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলির মধ্যে আটকা পড়িয়া পথিমধ্যেই নষ্ট হয়। যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে বা প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত জড় পদার্থের অণুগুলির বড় গোল-যোগ ঘটে না। অণুরাও তাহাদের বাধা দেয় না, তাহারাও অণুগুলিকে কোনরূপ বিচলিত করে না। কিন্তু আবার কতকগুলি ঢেউ অণুগুলি-রই গায়ে ধাক্কা দিয়া অণুগুলিকে চঞ্চল করিয়া দোলাইয়া দিয়া যায়। অণুগুলি ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাঁপিতে থাকে; কিন্তু

আকাশের ঢেউ সেই থানে থামিয়া যায় ও নষ্ট হয়। অণুগুলি ঐরূপ কাঁপিতে থাকিলে আমরা বলি তাপের উৎপত্তি হইল, জিনিষটা গরম হইল, আলোক নষ্ট হইয়া তাপের উৎপাদন করিল। এই ঢেউগুলার অদৃষ্ট খারাপ; ইহার অণুর সহিত লড়াই করিতে গিয়া নিজেরাই নষ্ট হয় ও বস্তুতই পথে মারা যায়।

জড় দ্রব্যের অণুগুলি এইরূপে আকাশের ঢেউগুলিকে নষ্ট করিয়া নিজে কাঁপিতে লাগে; ঢেউগুলিকে আহার করে ও নিজে পুষ্ট হয়; এই ব্যাপারকে আমরা আলোকের শোষণ বলিব। আর ঢেউগুলির জড় পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপারকে পরাবর্ত্তন বলিব। এই খানে একটু রহস্য আছে। কোন কোন দ্রব্য সূর্য্যালোকের অন্তর্গত সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয় বা পরাবর্ত্তিত করে; যেমন পালিশ-করা রূপা, অথবা পারা-মাথান আরশী। শাদা কাগজ, শাদা কাপড়, শাদা খড়ী, শাদা দুধ প্রভৃতি সমস্ত শাদা জিনিষই বাছ বিচার না করিয়া সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয়; এবং সকলকেই এইরূপে ফিরায় বলিয়াই তাহারা শাদা। আবার কাল কালী, কাল কাপড়, কাল কাগজ, কাল কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সকল ঢেউকেই বাছাই না করিয়া অপক্ষপাতে শোষণ করিয়া লয়; এবং এইরূপে শুষিয়া লয় বলিয়াই তাহারা কাল। আবার জল বায়ু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কোন ঢেউকেই প্রায় ফিরায় না; শোষণেও বড় পক্ষপাত দেখায় না; প্রায় সকলকেই রাস্তা ছাড়িয়া দেয়; তাহারা এই জন্যই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত রঙিল জল, রঙিল কাচ, রঙিল কাগজ, রঙিল কাপড়, ইহাদের বর্ণ রঙিল এই জন্য, যে ইহারা পক্ষপাতপরায়ণ; সকল ঢেউয়ের উপর ইহাদের সমান বিচার নাই; ফিরাইবার সময় কোন কোন ঢেউকে বাছাই করিয়া ফিরাইয়া দেয়; শোষণের সময় কোন কোন ঢেউকে বাছিয়া শুষিয়া লয়; সকলের প্রতি সমান বিচার করে না। ফলে কোন কোন ঢেউ আটক

পড়িয়া শোষিত হয়; আবার কেহ বা ফিরিয়া আসে; কেহ বা রাস্তা ভেদ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। এই নির্ব্বাচনের ফলে শুভ্র আলো আমরা পাই না। যে আলো ফিরিয়া আসে বা রাস্তা ভেদ করিয়া চলিতে পায়, সে আলো রঙিল দেখায়। এই নির্ব্বাচন ক্রিয়া প্রাকৃতিক বর্ণ-বিকাশের একটা প্রধান কারণ।

তৃতীয় উপায়। এই তৃতীয় উপায় বুঝিবার পূর্ব্বে ঢেউ-তত্ত্বের আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ঢেউ, ঊর্ম্মি, তরঙ্গ, হিল্লোল, যাহাই বল, এই সকলের একটু অপরূপত্ব আছে। জলের ঢেউ মনে কর। জলাশয়ের পিঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে দেখা যায়; কোন দ্রব্য যদি সে সময়ে জলে ভাসে, সে দ্রব্য সেই তরঙ্গের লীলাতে একবার উঠে, একবার নামে। এই উঠা-নামা তরঙ্গমাত্রেরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ যখন চলিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে, জল একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের সারি চলিয়াছে; তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উচু, নীচু, উচু, নীচু, উচু, নীচু এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর ঊর্ম্মিগুলি চলিয়াছে। একটা গোটা ঊর্ম্মির অর্দ্ধেক ভাগ উচু, সেই ভাগকে আমরা ঊর্ম্মির মাথা বলিব; আর অর্দ্ধেক ভাগ নীচু, সেই ভাগকে পেট বলিব। মাথা আর পেট এই শব্দ দুইটা সভ্যসমাজের অনুমোদিত হইবে না; কিন্তু এক্ষণে পরিভাষা-সঙ্কলনশ্রমের অবকাশ নাই। তরঙ্গের এক ভাগ মাথা, এক ভাগ পেট। এখন মনে কর, দুইটা স্থান হইতে তরঙ্গশ্রেণী জন্মিয়া চলিতেছে। পুকুরের জলে একটি ঢিল ছুড়িলে সেখান হইতে এক সারি তরঙ্গ জন্মিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে; আবার আর এক জায়গায় নিক্ষেপ করিলে সেখান হইতেও আর এক সারি তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এইরূপ দুইটা স্থান হইতে সারি সারি ঢেউ আসিতে থাকিলে এমন হয়, এ সারির ঢেউয়ের উপর ও সারি আসিয়া পড়ে। ইহার

মাথার উপর উহার মাথা পড়ে, ইহার পেটের উপর উহার পেট পড়ে ; আবার কোথাও বা এক সারির মাথার উপর আর এক সারির পেট পড়ে। এরূপ ঘটনা জলাশয়ের পৃষ্ঠে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখন একটার মাথার উপর আর একটার পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়া সেখানে মাথাও থাকে না, পেটও থাকে না। সেখানে জল উচুও হয় না, নীচুও হয় না ; ঠিক্ সমতল থাকিয়া যায় ; ঢেউএর উপর ঢেউ পড়িয়া পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জলের ঢেউএর মধ্যে যেমন কাটাকাটি হয় ; তেমনি আকাশের ঢেউএর মধ্যেও কাটাকাটি হয়। পেটের উপর মাথা ও মাথার উপর পেট কোন ক্রমে পড়িলেই কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে। ফলে আমরা যাহাকে ছায়া বলি ও অন্ধকার বলি, তাহা এইরূপ কাটাকাটিরই ফল। আঁধারের মধ্যে আকাশের ঢেউ একবারে নাই, এরূপ মনে করিও না ; সেখানে এত অসংখ্য ঢেউ এ দিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে পরস্পর কাটা কাটিতে সকলেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আলোতে আলোতে মিলিয়া একবারে আঁধার হইয়া গিয়াছে। এইরূপে আলোর উপর আলো চড়িয়া আঁধার হইয়া যায়। কিন্তু কখনও বা সম্পূর্ণ আঁধার না হইয়া আলোটা রঙিল হইয়া যায়। সূর্য্যের আলোকের মধ্যে লাল আলো, লাল আলোর সঙ্গে মিলিয়া লালকেই বিলুপ্ত করে ; নীল নীলের সঙ্গে মিলিলে নীলই বিলুপ্ত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল আলো। শাদা হইতে তাহার একটা অংশ নষ্ট হইলে বা অপসারিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল।

এইরূপে বর্ণোৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যায়। জলে এক ফোঁটা তেল ফেলিলে সেই তেলের ফোঁটা অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গায় তখনই ছড়াইয়া পড়ে। তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। জলের উপর তেলের একখানি সূক্ষ্ম পরদা বা আস্তরণ পড়িয়া

যায়। তাহার স্থূলতা মাপিতে হইলে আর ইঞ্চির মাপকাঠিতে চলে না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ কি দশলক্ষ ভাগ করিতে হয়। আকাশবাহী আলোকোৎপাদক ঢেউগুলি যে কাঠিতে মাপা যায়, এই পরদার স্থূলতাও সেই মাপকাঠিতে মাপিতে হইবে। এখন মনে কর তেলের ঐ সূক্ষ্ম পরদার পিঠে লাল আলোর ঢেউ পড়িল। কতকগুলা ঢেউ সেই পিঠে লাগিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। কতকগুলা তেলের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া নিম্নস্থ জলের পিঠে ঠেকিয়া পরাবর্ত্তিত হইবে ও ফিরিয়া চলিয়া আসিবে। তেলের পিঠ হইতে যাহারা ফিরে, তাহারা একটু আগিয়া থাকে; যাহারা জলের পিঠ হইতে ফিরে, তাহারা একটু পিছাইয়া পড়ে। একটু পিছাইয়া পড়ায় এমন ঘটে, যে ইহাদের মাথার উপর উহাদের পেট আসিয়া পড়ে; ফলে উভয়েরই সর্ব্বনাশ ও লোপপ্রাপ্তি ঘটে; কেহই আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে না; রাস্তাতেই তাহাদের ঢেউ-লীলার সমাপ্তি হয়। এইরূপে লাল আলোর লোপ হয়। নীল আলো পড়িলে তাহার ভাগ্য ততটা মন্দ হয় না। কেননা, লাল আলোর ঢেউগুলা একটু লম্বা লম্বা; নীল আলোর ঢেউ তাহার চেয়ে একটু খাটো খাটো। নীলের মধ্যেও যাঁহারা তেলের পরদায় প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তাঁহারা পিছু পড়েন, এমন কি তাঁহারা খাটো বলিয়া একটু অধিক পিছাইয়া পড়েন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহারা আবার বাঁচিয়া যান। পিছাইয়া পড়েন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে মাথায় পেটে ঠোকাঠুকি ঘটে না ও ফলে তাঁহারা বাঁচিয়া যান। লাল রঙের লোপ হইলে নীল রঙ নিষ্কৃতি পায়। শাদা আলো পড়িলে তাহার মধ্যে একটা মাত্র রঙ লোপ পায়; বাকী রঙগুলা জয়ধ্বনি দিয়া রঙদার হইয়া ফিরিয়া আসে। দল বাঁধিয়া সকলেই যান—তখন আলো থাকে শাদা; যখন সঙ্গীহারা হইয়া ফিরিয়া আসেন—তখন আলো হয় রঙিল।

আর এক রকমে এইরূপ বর্ণবিশেষের লোপ ঘটে। আলোকের অনেকগুলা সরু সরু পথ বা উৎপত্তিস্থান সারি সারি কাছাকাছি থাকিলে সকল স্থান হইতেই ঢেউ আসে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট স্থলে সকলে একসঙ্গে পৌঁছিতে পারে না; কেহ বা একটু আগে পৌঁছায়, কেহ একটু পরে পৌঁছায়; কাজেই, ইহার পেটে উহার মাথায় ও ইহার মাথায় উহার পেটে হইয়া আলোর লোপ ঘটিয়া আঁধার ঘটে, অথবা বর্ণবিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদা আলো রঙিল আলোতে পরিণত হয়। হাতের দুই আঙুল সংলগ্ন করিলে তাহার মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাকার পথ থাকে, অথবা কাগজে ছুঁচ দিয়া ফুটা করিলে আলোর যে ছোট পথ হয়, সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পথে চোখ রাখিলে দেখা যায়, পথ দিয়া আলো আসিতেছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে কাল কাল রেখা পড়িয়া গিয়াছে। একখানা পালিশ করা ধাতুফলকের গায়ে বা একখানা কাচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, এক ইঞ্চি স্থানের ভিতর দু দশ হাজার করিয়া, সমান্তরাল রেখা টানিলে, দুই দুই রেখার মধ্যগত স্থান হইতে আলো আসে, এবং সেই বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত আলো পরস্পর কাটাকাটি করিয়া রঙিল আলোর সৃষ্টি করিয়া থাকে। মশা, মাছি, ফড়িঙ প্রভৃতি যখন সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের পাখায় নানাবিধ রঙের আবির্ভাব দেখা যায়। সে রঙ ঐ কারণেই উৎপন্ন হয়। তাহাদের পাখার গায়ে লম্বা লম্বা সরু সরু অনেক রেখা আছে। সেই সকল রেখার মধ্যস্থিত নানাস্থান হইতে প্রতিফলিত ঢেউ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া রঙিল আলো সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক পদার্থে বিবিধ বর্ণের বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। এখন গোটাকতক উদাহরণ দিলেই পাঠক পরিত্রাণ পান।

শাদা আলো ভাঙিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া রঙ জন্মে। স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর আলো ঢুকিয়া ঢেউগুলির রাস্তা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। রামধনুর রঙ এই কারণে জন্মে। সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ঘেরিয়া সময়ে সময়ে যে মণ্ডল বা পরিবেশ দেখা যায়, সেও এইরূপে রঞ্জিত দেখায়। মেঘের জলকণা বা তুষারকণা শুভ্র আলোককে ভাঙিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ছড়াইয়া দেয়। ঝাড়ের কলমের রঙ, দুর্ব্বাদলে শিশির-বিন্দুর রঙ, হীরকখণ্ডে রঙ, এ সকলের একই মূল। একই কারণ—বিশ্লেষণ।

রঙিল কাচের রঙ, রঙিল জলের রঙ, অন্য কারণে উৎপন্ন। শাদা আলো ভিতরে প্রবেশ করিল; কোন কোন রঙ আটকাইয়া শোষিত হইয়া গেল; বাকীগুলা ফিরিয়া আসিল। কোন কোন বায়বীয় পদার্থ রঙিল দেখা যায়; তাহাদের মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান যায়; বাকীগুলা চলিয়া আসে। রঙিল কাগজে, রঙিল কাপড়ে, যে সকল রঙ দেখা যায়; কাঠের গায়ে, দেওয়ালের গায়ে যে সব রঙ মাখান দেখা যায়; ছবি আঁকিতে চিত্রবিদ্যায় যে শত সহস্র রঙ ব্যবহৃত হয়; সোণা তামা পিতল প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যে যে রঙ দেখা যায়;—এ সমস্তই এইরূপে উৎপন্ন। শাদা আলো গিয়া গায়ে পড়িল। তাহার মধ্যে কোন কোন রঙের আলো একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আটক পড়িল। কোন কোন রঙের আলো ফিরিয়া আসিল।

সাগরের জলের বর্ণ গাঢ় নীল; শুভ্র সূর্য্যালোকের সহস্র ঢেউ সমুদ্র-বক্ষে পড়ে; সকলে ফিরিয়া আসে না; গভীর জলরাশি বাছিয়া বাছিয়া কাহাকে টানিয়া লয় ও শোষণ করে; কাহাকেও বা ফিরাইয়া দেয়।

আকাশের বর্ণ নীল কেন? বায়ু মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসিতেছে। এত সূক্ষ্ম যে, সহজে চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে [illegible] সংখ্যা নির্ণয়ের উপায় স্থির হইয়াছে। একটা

কুঠরির মধ্যে বায়ুতে কত কোটি ধূলিকণা আছে গণিতে অধিক আয়াস পাইতে হয় না। এই ধূলিকণা আকাশের নীল বর্ণের কারণ। আকাশ বাহিয়া ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ চলে। ধূলিকণাগুলি এত ছোট, যে লাল আলোর ঢেউ বা পীত আলোর ঢেউ তাহাদের পক্ষে বৃহৎ ঢেউ; উহারা ধূলিকণা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীল আলোর ঢেউ ছোট, তাই তাহারা ধূলিকণাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যেমন ক্ষুদ্র উপলখণ্ড জলের বড় বড় তরঙ্গকে প্রতিহত করে না, তবে ছোট ছোট মৃদু হিল্লোলকে ফিরাইয়া দেয়; কতকটা সেইরূপ। সূর্য্যের শুভ্র আলোক বায়ুরাশিতে প্রবেশ করে। রক্ত পীত অবাধে চলিয়া যায়। নীল ফিরিয়া আসিয়া চোখে লাগে।

অস্তের সময় ও উদয়ের সময় দিঙ্মণ্ডল অরুণ রাগে রঞ্জিত হয়। সূর্য্যের আলো তখন গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে। ধূলিকণায় ঠেকিয়া নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয় ও সূর্য্যের অভিমুখেই ফিরিয়া যায়। রক্তের ভাগ ও অরুণের ভাগ বায়ু ভেদ করিয়া আসে। সেই অরুণরাগরঞ্জিত আলো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র অরুণ বর্ণের বিকাশ করে।

শোণিতের বর্ণ লাল; তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসে; তাহারা নীলের ভাগ হরণ করিয়া ও শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষ লতা তৃণ, উদ্ভিদের সাধারণ বর্ণ হরিৎ; তাহাদের পাতার গায়ে এক প্রকার প্রলেপ থাকে, উহা লোহিতের ভাগ হরণ করে ও শোষণ করে। যে সকল ঢেউ প্রতিফলিত করে, তাহারা একত্র মিশিয়া হরিতের আবির্ভাব করে।

হরিতালের পীত, সিন্দূরের লোহিত, তুঁতের নীল, হীরাকষের সবুজ, একই কারণে উৎপন্ন। শাদা আলোর মধ্যে কেহ কোন রঙের ঢেউ বাছিয়া গ্রহণ করে, কেহ আর কোন রঙের ঢেউ বাছিয়া গ্রহণ করে;

যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে, তাহারা একত্র মিশিয়া পীত বা লোহিত বা নীল বা সবুজের অনুভূতি জন্মায়।

অমুক দ্রব্যের রঙ পীত দেখিয়া যেন মনে করিও না, যে উহা বিশুদ্ধ পীত। খুব সম্ভব, পীতজনক ঢেউ একবারেই বিদ্যমান নাই;—অন্য পাঁচ রঙের ঢেউ একত্র আসিয়া পীতের অনুভূতি জন্মাইতেছে মাত্র।

পদার্থমাত্রই পরমাণুর বিবিধবিধানে সমাবেশে গঠিত। পরমাণুর গঠনের সহিত ও তাহাদের সমাবেশের সহিত বর্ণোৎপাদনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি ধাতুপদার্থ আছে,—তামা, লোহা, ক্রোম, মঙ্গন, নিকেল, কোবাল্ট,—এই সকল ধাতু যে সকল পদার্থে বর্ত্তমান, তাহারা প্রায়ই বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বিকাশ করে। রঙিল কাচের রঙ ও বিবিধ মণিরত্নাদির রঙ এই কয়েকটি ধাতু দ্রব্যের অস্তিত্বসূত্রে জন্মে। আবার কয়লা ও উদজান ও অম্লজানের পরমাণু নির্দ্দিষ্ট বিধানে সঙ্গত ও সমাবিষ্ট হইয়া এক শ্রেণীর পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহারাও বিচিত্র বর্ণের উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

জলে তেলের ফোঁটা ফেলিলে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া সূক্ষ্ম আস্তরণের মত হইয়া যায় ও বর্ণের বিকাশ করে। কিরূপে করে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঢেউগুলির মধ্যে কাটাকাটি হইয়া যায়। এইরূপে বর্ণবিকাশের বিস্তর উদাহরণ আছে। সাবানের ফেনার গায়ে রঙ, জলবুদ্বুদের পিঠে রঙ, মসৃণ ধাতু পৃষ্ঠে ময়লা জমিলে বা মরিচা জমিলে তাহার রঙ, ঝিনুকের রঙ, শঙ্খশম্বুকের রঙ এই কারণে উৎপন্ন হয়। মাছির পাখায়, ফড়িঙের পাখায়, পাখীর পালকে, প্রজাপতির গায়ে রঙও অনেক সময় এই কারণেই উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে, হরিৎ; কিন্তু ফুলের কোন বাঁধাবাঁধি রঙ নাই। আবার জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট

নাই। এক এক জীবের দেহে এক এক রঙ ও এক এক ফুলের এক এক রঙ। এই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ নানা কারণে ঘটে। কখনও বা গায়ের উপর এমন কোন প্রলেপ থাকে, যাহাতে কোন কোন ঢেউ বাছিয়া শুষিয়া লয়; অন্য অন্য ঢেউ ফিরাইয়া দেয়। কোথাও বা গায়ের উপর সরু পরদা থাকায় কোন একটা ঢেউ কাটাকাটি হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। আবার কখনও বা গায়ের উপর সরু সরু ঘন সন্নিবিষ্ট রেখা থাকে; তজ্জন্যও ঢেউ ঢেউকে কাটে। জীবশরীরে ও পুষ্পশরীরে বর্ণবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে ডারুইনের নিকট যাইতে হইবে। জীবনযাত্রায় সুবিধা লক্ষ্য করিয়া জীবের দেহে বর্ণ বিকাশ ঘটে। এ স্থলে আমরা সেই ইতিহাসের অবতারণা করিব না।

উপসংহারে একটা তত্ত্বকথা আসিয়া পড়ে। জগতে এই বিচিত্র বর্ণবিকাশে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি আছে কি না? ইহার সহিত কোন মঙ্গলের বা অমঙ্গলের সম্পর্ক রহিয়াছে কি না? যাঁহারা প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার একটা গূঢ় মঙ্গলাত্মক উদ্দেশ্য আবিষ্কার না করিলে তৃপ্তিলাভ করেন না, তাঁহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই তত্ত্বকথাটার অবতারণা আবশ্যক।

প্রথম কথা, বিবিধ বর্ণবিকাশে আমাদের একটা স্থূল উপকার চোখের উপরেই দেখা যাইতেছে। নানাবিধ দ্রব্য নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাতে জগতের সঙ্গে আমাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। বর্ণের বিভেদ দেখিয়া আমরা বিবিধ দ্রব্যের সহিত সহজে পরিচিত হইতে পারি; তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া চিনিয়া লইবার সুবিধা হয়। সুতরাং বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের জীবনযাত্রার অনুকূল। আবার বর্ণবিকাশে জীবনযাত্রার যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমনই জগতে কতকটা আরাম ও কতকটা আনন্দ পাইবারও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। সবই এক রঙের হইলে জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে কদাকার হইয়া

পড়িত। অন্ততঃ বর্ত্তমান রঞ্জিত বিচিত্র জগতে যিনি কিছুদিন বাস করিয়াছেন, তাঁহাকে কোন একরঙা জগতে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জীবনধারণ সমস্যা হইত।

বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার বন্দোবস্তের সুবিধা হয়; আর তাছাড়া খানিকটা আনন্দ ও আরামও লাভ করা যায়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে তৃপ্তি হইবে না। আরও সূক্ষ্ম হিসাবে আসিতে হইবে।

আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা কি? আকাশ নীল হওয়াতে কিছু লাভ হইয়াছে কি? নীলাকাশ দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয় জানি; কিন্তু নীল না হইয়া আকাশ যদি লাল হইত, তবে তেমন প্রফুল্লতা জন্মিত কি না, সহজে বলিতে পারি না। সিন্দূরের রক্ত রাগে, হরিতালের পীত রাগে, এমন বিশেষ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কিছু আছে কি? সুন্দরীর ললাটরঞ্জনের জন্য সিন্দূর সৃষ্ট হইয়া সিন্দূরস্রষ্টার মঙ্গলোদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেছে বলিতে পার; কিন্তু যখন সুন্দরীর ক্রোড়স্থিত শিশু সুন্দরীর অজ্ঞাতসারে সিন্দূরের বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া উহা গলাধঃকরণ করে, তখন সেই মঙ্গলোদ্দেশ্য কোথায় থাকে? নীলাম্বুধির নীলিমা নয়নের তৃপ্তি-সাধন করে সত্য; কিন্তু প্রাকৃত নীলাম্বুধি পৌরাণিক ক্ষীরাম্বুধিতে পরিণত হইলে কি আরও উপাদেয় হইত না? তমালতালীবনরাজিনীল সাগরবেলা নয়নরঞ্জিনী সন্দেহ নাই; কিন্তু নীলার বদলে পীত বিশেষণ বসাইবার অবকাশ দিলে নয়ন কি একেবারেই ঝলসিয়া যাইত?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তত্ত্বান্বেষী পরামর্শবেত্তাদের জন্য এই সকলের মীমাংসার ভার রাখিয়া দিয়া আমরা জগতের বর্ত্তমান বর্ণবৈচিত্র্যে যে আনন্দটুকু পাইয়া থাকি, তাহারই উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব। আকাশ নীল না হইয়া পীত হইলে কি দোষ হইত, তত্ত্বান্বেষীরা স্থির করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে

বিশ্বসৌন্দর্য্যের অংশ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দামৃত পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাভ।

সৃষ্টি

আফ্রিকানিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভাগী হইল মানুষে; আধিব্যাধি জরামরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।

চাঁদের ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একরকম সৃষ্টিতত্ত্বের বড় বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে, ফলভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ। কবে ও কোথায় এই বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, বড় বড় পণ্ডিতেরা তাহাও নাকি স্থির করিয়াছেন, এবং মনুষ্য-গর্দ্দভের উপর দুর্ভাগ্য-বোঝা আরোপণের নৈতিকতা সম্বন্ধেও বহুল সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

শয়তানের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না, বিশেষ জানি না। শুনা যায় বিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ কুবীয়ের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুবীর সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না। দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য-সহকারে তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপু হে, শিঙে ও খুরেই ধরা পড়িয়াছ; মাংস হজমের শক্তি রাখ না, আমাকে হজম করিবে কিরূপে? কিঞ্চিৎ ঘাস দিতেছি, রোমন্থন কর।

দুই একটা অশিষ্ট লোক দেখা যায়, যাহারা এই সর্ব্বজনানুমোদিত তত্ত্বটাকে অজ্ঞেয় বলিতে চাহে। তাহারা নাস্তিক। বিজ্ঞেরা তাহাদিগকে গালি দেন।

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না; এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি কেবল দেশ আর কাল;—শূন্য দেশ আর শূন্য কাল; আর ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা নির্গুণ কি গুণময়, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার; কিন্তু একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান স্বীকার করিতেই হইবে; নতুবা সৃষ্টি কল্পনা হয় না; সেটা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক; আর জগতের সৃষ্টি হইল; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল; কিছুই ছিল না, সবই হইল; দেশের ও কালের শূন্যতা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি; স্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে কি ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না, উত্তর মিলিবে না। ইহার পরে কি ঘটিয়াছে বা কি ঘটিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার; উত্তরপ্রাপ্তি দুরাশা নহে। এই সৃষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। একবার মাত্র কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত আমরা জানি; আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহা জানি না।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইল; এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত থাকিলে চলে কি? না;—আর একটু বলা আবশ্যক। তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্ট জগৎ এইরূপে, এইভাবে, এই পথে চলুক; তাই জগদ্‌যন্ত্র সেইরূপে, সেই ভাবে, সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি জগতের স্রষ্টা, তিনিই জগতের বিধাতা।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা, পরগাছা, শাখাপল্লব ছাঁটিয়া কাটিয়া কেবল কাণ্ডটুকু বা মূলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথা কয়টির অধিক বেশী কিছু থাকে না। জগৎ আছে,—স্রষ্টার ইচ্ছা; জগৎ চলিতেছে,—বিধাতার বিধানে; এই কথাকয়টির উপর বড় বিবাদবিসংবাদ নাই; ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অসীম; অথচ কেমন সংযত, নিয়মিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। সুদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যতের সহিত কেমন বাঁধা; সুতরাং বিধাতা সর্ব্বজ্ঞ।

কেহ বলেন, জগৎ কেমন সুন্দর; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময়।

কেহ বলেন, জগৎ বড় সুখের; ঈশ্বর করুণাময়।

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণ্যের জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের নিদান। ইত্যাদি।

এইরূপে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে বলা যায় না।

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তবে জগতে দুঃখ কেন? ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা, তবে দুর্ব্বলের পীড়ন কেন?

উত্তর, ও সব শয়তানের কারসাজি। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী; আহ্রিমান অহুরমজ্‌দের বিরোধী।

তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন?

উত্তর, কেন, শয়তান ত জব্দ আছে।

তার চেয়ে শয়তানের নিপাত হইলেই ত ভাল হইত !

উত্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ কেমন ইচ্ছা, বলা যায় না। শয়তানটা বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে ; তথাপি শক্তিসত্ত্বেও তাহার নিপাত করিব না,—মন্দ ইচ্ছা নয় !

আর এক রকম উত্তর আছে। তোমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণা। তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর।

নষ্ট বুদ্ধির প্রশ্ন,—আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে ?

কুটবুদ্ধি লোকে বলে, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে না। দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি সুখ আছে মানিতে চাও, দুঃখও মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, তিনি দুঃখেরও নিদান।

বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই। যে একটু সুখ বিদ্যমান, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি ; দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয় মিথ্যা কথা ; প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই জয় ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমান গতি ; উভয়েরই বিনাশ। এ কথার উত্তর নাই কেহ বলেন, চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য—behind the veil—মানবদৃষ্টির অন্তরালে। কেহ বলেন, তুমি নির্ব্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোকটার কুম্ভীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, আইস, ইহাকে পোড়াইয়া মারি।

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ডগোলে দরকার নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলেই মানিয়া থাকি। ঈশ্বর ইচ্ছাময় ; তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন-না-কখন হইয়াছে। নতুবা এই

এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল কোথা হইতে? তবে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কেন, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। সে সব অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাময়ত্বটুকু বজায় রাখিয়া ঈশ্বরকে নিরুপাধিক বল ক্ষতি নাই, অজ্ঞেয় বল আরও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র; এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক; তাই ঈশ্বর-স্বীকার কর্ত্তব্য। এই যন্ত্র-চালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সেই শক্তি। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশমাত্র। যন্ত্রটি সুগঠিত, নিয়মিত; বেশ সুস্থ ভাবে চলিতেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য। তবে মাঝে মাঝে মরিচা ধরিলে মেরামতের দরকার হয় কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কেহ বলেন, মেরামত দরকার হয়; সেই মেরামতের নাম মিরাক্‌ল্।

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ; মীমাংসক মধ্যস্থের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাহারা মধ্যস্থের কথায় তৃপ্ত হয় না। তাহারা বলে, যন্ত্র আছে অতএব যন্ত্রী আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর স্বীকার্য্য; এরূপ যুক্তি চলিবে না। ঘটের জন্য কুম্ভকার আবশ্যক; সুতরাং বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন, এ যুক্তিটা ঠিক নহে। প্রথম, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে, বুদ্ধি যোগাইয়া আকার দেয় মাত্র; ঘটের উৎপাদন করে না। ঘটের উপাদান যে মাটি, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ তৈয়ারি মালমশলার উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পর্য্যন্ত এ যুক্তিতে আইসে; সেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে, মানুষের কল্পনার অতীত। সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয় না। তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির কথা তুলিও না।

জগতের মশলা কোথা হইতে আসিল, ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগদ্ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল কিরূপে, ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য ; বিজ্ঞান কষ্টে সৃষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্ম্মাণপ্রণালী, ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে ; কতক বুঝা যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে একথার উত্তর মিলে না ; তবে কিরূপে হইতেছে, তাহার উত্তর বিজ্ঞানের নিকট মিলিতে পারে। যে ভাবের ব্যাখ্যায় মন তৃপ্তি লাভ করে, সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোন রূপে বুঝিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই ; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না।

প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বল, বড় আপত্তি নাই ; সে কেবল কথার মারপ্যাঁচ। তবে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" এই কথাটা কতকটা মনের চোখে ধূলি দেওয়া গোছের হয়, এই মাত্র আপত্তি। ইচ্ছা শব্দে মানুষের ইচ্ছা, কুকুরের ইচ্ছা, গরুর ইচ্ছা, জীব জন্তুর ইচ্ছা, এই রকম একটা কিছু বুঝিতে পারা যায়। কাঠপাথরের ইচ্ছা, গাছ পালার ইচ্ছা কি অশরীরী কোন কিছুর ইচ্ছা, আকাশকুসুমের মত নিরর্থক। ঈশ্বর শব্দে তোমরা অশরীরী সৃষ্টিছাড়া কোন একটা কিছু বুঝিয়া থাক। সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে কি অর্থ বুঝিব, তাহা অভিধানেও লেখা নাই, বুদ্ধিতেও আইসে না। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ এইরূপ হইয়াছে, এইরূপে চলিতেছে, এ কথার অর্থটা ভাল হৃদ্গত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা আমাদের অবোধগম্য, বুদ্ধির অতীত একটা কিছু ; মানবেচ্ছার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয়, হউক।

ঈশ্বর এবং পরমাণু, এই দুই মশলাতে জগৎ নির্ম্মিত।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমস্ত জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে, কিরূপে চলিতেছে ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার ভরসা করেন। ইহাকে সৃষ্টিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক মাক্সোয়েল একদা বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক মূল পদার্থের পরমাণুগুলি যেন একই ছাঁচে ঢালা; সেই ছাঁচ তৈয়ার করিবার জন্য, তাহার নক্সা করিবার জন্য, একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। মনুষ্যের ধীশক্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইয়া যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাড়িয়া দিয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা আছে কি না, যাঁহারা সম্প্রতি মানববুদ্ধির বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করিয়া অগ্রগত মাক্সোয়েলের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন।

আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন, জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, অথবা জগৎ ঈশ্বরেরই মূর্তি। এই মতানুসারে সৃষ্টি শব্দের সার্থকতা নাই; সৃষ্টিব্যাপার বা সৃষ্টিঘটনা বলিয়া কিছু কখনও সংঘটিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়কে ইংরাজীতে স্থূলতঃ প্যানথীষ্ট বলে; ইহাদিগকে গালি দেওয়া সহজ, কিন্তু নিরুত্তর করা তত সহজ নহে।

মানবজাতি বহুদিন হইতে যে সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ নামে একটা বিচিত্র প্রকাণ্ড অসীম পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং কাহারও মতে অনাদি কাল ব্যাপিয়া বর্তমান আছে। মনুষ্য স্বয়ং সেই জগতের একটু ক্ষুদ্র অংশ; তাহার খানিকটামাত্র মানুষ দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণ মাত্র দেখে। এই অংশটুকু মনুষ্যের পরিচিত।

জ্ঞানের বিকাশের ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের পরিধি ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে ; কিন্তু অসীম জগতের তুলনায় সেই পরিচিত অংশের পরিমাণ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য। সম্প্রতি জগতের অতি সঙ্কীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে আরও বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার কিয়দংশের সহিত কালক্রমে আমাদের চেনা শুনা ঘটিতে পারে ; কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমার ভিতর আসিবে না। এই প্রকাণ্ড পদার্থটা একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্রবিশেষ ; যতই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিলতা আমাদের নিকট খুলিয়া যায় ; ততই আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি সুসঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে ; এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিলেই জগৎযন্ত্রের জটিলতা ঘুচিয়া উহার কার্য্যপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসে। এই জটিলতার উন্মোচনই বিজ্ঞানশাস্ত্রের একমাত্র সম্পাদ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই প্রচলিত মতটা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমা ভিন্ন আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব ঠিক প্রতিপন্ন হয় না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য ; আমা ছাড়া আর কিছু আছে, তাহা ঠিক্ তেমন সত্য নহে ; এবং তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজিয়া মিলে না।

সাংখ্য দর্শন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; এবং পুরুষ-প্রকৃতির সম্মিলনের বা সাক্ষাৎকারের ফলে ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকৃতির অস্তিত্ব একটা অনুমানমাত্র ; এই অনুমান ব্যতীত অন্য উপায়ে যদি জগতের অভিব্যক্তি বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে সকলে সম্মত না

হইতে পারেন। প্রাচীনের মধ্যে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না; আধুনিকের মধ্যে বার্কলি, হিউম, হক্সলী প্রভৃতি ইহা স্বীকার করেন না। আমি জগতের অংশ, ইহা ঠিক্ সত্য নহে; জগৎ আমার অংশ, ইহাই বরং সত্য। জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না, ইহা বোধ হয় সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়। ব্যক্ত জগতের আমাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই নিজের অংশ, বা ছায়া, বা সমীপধৃত প্রতিমূর্ত্তি, এইরূপ বলিলে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত হয়। জ্ঞানবিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে; আমারই আত্মবিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি বৃদ্ধি বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক্।

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈতন্যকণার সমষ্টিতে আমার চৈতন্য। চৈতন্যের একটি বিশেষ শক্তি আছে, সে আপনার সমগ্রটাকে, অর্থাৎ সমুদায় চৈতন্যকণার প্রবাহটাকে, এক স্বরূপে দেখিতে পায় ও আপনাকে আপনি চিনিয়া লয়; চিৎ-কণিকাগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইয়া বা কল্পনা করিয়া লইয়া উহাদের সমষ্টিকে আমার চৈতন্য এই আখ্যা দেয়। এই অবিচ্ছিন্ন নিরন্তর চৈতন্যপ্রবাহের কল্পনা হইতে আমি আছি, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি কল্পনার উৎপত্তি। আবার ইহা আপনার উপাদানস্বরূপ চিৎকণাগুলিকে এক এক করিয়া খুঁটিনাটি করিয়া, বাছিয়া, গোছাইয়া, সাজাইয়া দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে; এই বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ; আমার জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা সুখ দুঃখ প্রভৃতির উৎপত্তি। বৈদান্তিকেরা আত্মার বিকাশের তিনটা

অবস্থার উল্লেখ করেন;—সুষুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। সুষুপ্তাবস্থায় চৈতন্যের এই আত্মবিশ্লেষণ শক্তি জন্মে নাই; চৈতন্য হয়ত আছে, কিন্তু উহা আপনার নিকট অপরিচিত; এখনও নিজের কি আছে, কি নাই, তাহা জানে না। স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানিয়াছে; কিন্তু এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই; কাহার সহিত কি সম্বন্ধ, এখনও ঠিক্ করিতে পারে নাই; এবং বোধ করি আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থায় চৈতন্য বিকশিত, পরিস্ফুট, স্ফূর্ত্তিমান্; উহা আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে; কোন্ অনুভূতিটা কোন্ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্ স্মৃতি কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতেছে, এবং সে নিজে সেই অনুভূতিটা, স্মৃতিটা, আকাঙ্ক্ষাটা লইয়া কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। এই সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগরণ, শব্দ তিনটিকে ঠিক্ চলিত অর্থে লইবার প্রয়োজন নাই। মোটা কথায় বুঝাইতে হইলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের চৈতন্যকে বোধ করি সুষুপ্ত, জলৌকা বা কিঞ্চিলিকার চৈতন্যকে স্বপ্নাবস্থ, ও উচ্চতর জীবের চৈতন্যকে জাগ্রত বলিতে পারা যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের কাছে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ; জলৌকার জগৎ অসম্বদ্ধ, অনিয়ত, ব্যবস্থাহীন; আর তোমার আমার জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, সুগ্রথিত, সুসংযত, সুব্যবস্থ, বিকশিত ও বিকাশমান।

এইরূপ চৈতন্যের আত্মবিশ্লেষণ শক্তি। সে আপনাকে বিশ্লিষ্ট, বিভিন্ন, ছিন্ন করিয়া দুইভাগে রাখে। এক ভাগের নাম দেয়—পুরুষ, আপনি বা আমি প্রপার; আর একভাগকে আপনা হইতে ছিন্ন করিয়া প্রক্ষেপ করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া নাম দেয়—প্রকৃতি, বাহ্য জগৎ, অথবা আমা ছাড়া জগৎ। এবং এই দুইএর পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধ নির্ণয়

লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া কৌতুক করে। যে চিৎপদার্থগুলিকে আপনা হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া ব্যক্ত প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ নাম দেয়, তাহাদিগকে আবার দুই রকমে সাজাইয়া দেখে। তাহাদিগকে দুই রকমে সাজায় ও দুই রকমে গোছায়। এক রকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর এক রকমে গোছানর নাম কালব্যাপ্তি। কতকগুলাকে এক সঙ্গে দেখে; কতকগুলাকে পর পর দেখে। অথবা এক রকমে দেখার নাম একসঙ্গে দেখা, দেশে দেখা, যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া দেখা; আর এক রকমে দেখার নাম পর পর দেখা, কালে দেখা, যথাকালে বিন্যস্ত করিয়া দেখা। তৃতীয় কোন রকমে দেখে না; কেন দেখে না তাহার উত্তর নাই। সুতরাং দেশ ও কাল চৈতন্যের ধর্ম্ম বা শক্তি, অথবা চৈতন্যের আত্মনিরীক্ষণের রীতি। যে অর্থে আমার বাহিরে জগৎ নাই, সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কালও নাই। আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি ও কালে বিন্যস্ত করি; সাজানর ও গোছানর দিকেই আমার প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসেই চৈতন্যের বিকাশ। এই প্রয়াসে শক্তিসঞ্চয়ের ও শ্রমসংক্ষেপের চেষ্টা। সব অনুভূতিগুলি আমি চিনি না; যাহাদিগকে চিনি, তাহাদের মধ্যেও আবার কতকগুলিকে সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, কতকগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করি। আবার মনের মতন করিয়া সাজাই। পরস্পর সুসম্বদ্ধ সুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই। যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনি যেন তাহাকে ডাকিয়া পাই; যেন ভেরীর আওয়াজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থলে সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়; যেন ব্যূহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ না হয়; যেন

ব্যূহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে কাহার সহিত যুদ্ধে হঠিবে? আমার অন্তর্জগৎকে আমার প্রক্ষিপ্ত বাহ্যজগতের সহিত কাল্পনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া আমি কৌতুক দেখিতেছি; সেই কল্পিত যুদ্ধে যেন কল্পিত বাহ্য জগতের কাছে আমাকে হঠিতে না হয়। বাহ্যজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সুবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চৈতন্যের কারিকরী; এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে, বহির্জগতে, নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, চৈতন্যের বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার কল্পিত জীবনসংগ্রামে কল্পিত জয়লাভের ভরসা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাই আমার জগতে নিয়মবশে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, আলো জ্বলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ সুললিত গীতি-কবিতা,—পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবর্ষী।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চৈতন্যের বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে। তাহাকে দৈব বলি, অতি-প্রাকৃত বলি, মিরাকল্ বলি; তাহার জন্য ভূতপ্রেতপিশাচের দেবতা উপদেবতার কল্পনা করি; তাহার জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিকর্ত্তার ও বিধাতার কল্পনা করি।

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের অধীনে আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্ব্বত্র যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা নহে; তবে সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের

পরিমাণ। ইহারই নাম জ্ঞানচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা,—যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ। আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; ক্ষুধা পাইলে আমি খাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ও আমার জগতে অহোরাত্র পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। ঐ ব্যক্তি, যাহাকে পাগল বলা যায়, উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে খায় না এবং উহার নিকট বোধ করি দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন ঘটে না। উহারও একটা জগৎ আছে; কিন্তু সেটা আমার জগতের মত সুনিয়ত সুব্যবস্থ নহে; সে জগৎটা এলোমেলো অসংযত, অযথান্যস্ত।

প্রকৃতি যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের শৃঙ্খলা তেমনি আমারই সৃষ্টি। জগৎ অনন্ত, এ কথা অর্থহীন; কাল অনাদি, এ কথাও অর্থহীন; দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন। আমার জগৎ সান্ত; যে টুকু আমি যখন দেখিতেছি, সেই টুকুই তখন অস্তিত্ব-বান্; তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদি ও সান্ত; যে টুকুর সহিত আমার পরিচয়, সেই টুকুই অস্তিত্ববান্। 'অনাদি' 'অনন্ত' এই সকল লম্বা বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার, কাব্যে শোভা পায়; জ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমার আত্ম-বিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার আত্মা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সামর্থ্যবান্। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই, সে বাতুল বা পাগল।

আমার নিজের এই অভিব্যক্তির নাম প্রাকৃতিক সৃষ্টি বা জগতের সৃষ্টি। বিজ্ঞান আর দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয় অবগত নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে

কেবল একমাত্র জাতির মধ্যে মনীষিগণ এই সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই জাতির প্রতিভার জ্যোতিঃ উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করিতেছে। এই শুভ্রোজ্জ্বল প্রভার নিকট অন্য জাতির জ্ঞানপ্রভা মলিন।

কে বড় ?

ইংরাজিতে একটা বাক্য প্রচলিত আছে, যে ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে। মনুষ্যজাতির অন্য বিষয়ের ইতিহাসের ন্যায় জ্ঞানের ইতিহাসেও এই বাক্যের সার্থকতার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এক সময় ছিল,—সে বড় বেশী দিনের কথা নহে,—যখন মনুষ্য আপনাকেই জগতের সার পদার্থ মনে করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিত। বেশী দিনের কথা নহে বলিলাম, কেননা, এখনও হয়ত মনুষ্যজাতির পোনের আনা ভাগ এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে পোষণ করিয়া আসিতেছে; এবং এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ চিন্তাও কখন তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। খৃষ্টানগণের ও ইহুদিগণের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পাতাতে যে সৃষ্টিবর্ণনা আছে, তাহা এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই লিখিত। প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্ম এই বিশ্বাসকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহারই উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিলে বড় ভুল হয় না। খোদা সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করিয়া এই বিচিত্র জগৎ কেবল মানুষের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে খাঁটি খৃষ্টানের কোন সংশয় নাই। জগতের বিবিধ বৈচিত্র্যের কিয়দংশ মানুষের রক্ষার ও প্রতিপালনের জন্য; কিয়দংশ তাহার উপভোগের ও তৃপ্তির জন্য; এবং হয়ত কিয়দংশ তাহাকেই দুঃখ দিবার জন্য। তবে এইরূপ নাকি লিখিত আছে যে

মনুষ্যের জন্য যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতেই মনুষ্য আবার দুঃখ লাভ করিবে, সৃষ্টিকর্ত্তার আদৌ এ উদ্দেশ্য ছিল না। মনুষ্য আপনার দোষেই এই দুঃখভোগের অধিকারী হইয়াছে।

পুরাতন জ্যোতিষের মতে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলটি সমগ্র ভৌতিক জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী সাব্যস্ত হইয়াছিল; সেইরূপ ভূমণ্ডলবাসী মনুষ্যনামধেয় জন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী বিবেচিত হইত। এই ধ্রুব সত্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন একটা মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত হইত। যাঁহারা এইরূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে সাহস করিতেন, তাঁহাদের জন্য গ্যালিলিওর মত অথবা ব্রুণোর মত পাপানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত।

সৃষ্টিকর্ত্তা কি উদ্দেশ্যে এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যনির্ণয়ের জন্য মনুষ্যজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে আগ্রহের সহিত নিযুক্ত আছে। এই অনুসন্ধানব্যাপারে মনুষ্যের এরূপ গুরুতর মাথাব্যাথার কারণ কি, তাহা বলা দুষ্কর। কারণ যাহাই হউক, বিধাতা যে বিনা উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার বা একটি ক্ষুদ্র বালুকণার সৃষ্টি করেন নাই, ও সেই পিপীলিকাকে ও সেই বালুকণাকে যথাকালে ও যথাস্থানে স্থাপনা করেন নাই, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যের ভিত্তিমূল আরও দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত বড় বড় মস্তিষ্ক গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগতের প্রত্যেক ঘটনায় ও জগতের প্রত্যেক রহস্যে বিধাতার একটা গভীর গুপ্ত উদ্দেশ্যের আবিষ্কারই তাৎকালিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মুখ্য ব্যবসায় ছিল, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহার সন্দেহ হয়, তিনি পেলীর গ্রন্থ ও ব্রিজওয়াটার গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন।

বলা বাহুল্য জগৎসৃষ্টি বিষয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার একমাত্র উদ্দেশ্য আর

কিছু নহে; উহা মানবজাতির মঙ্গলসাধন ও স্বার্থসাধন মাত্র। মুখে সময়ে সময়ে বলা হইত বটে, যে বিধাতা মনুষ্যকে যে চক্ষে দেখেন, সামান্য পিপীলিকাকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা একথা বলিতেন, তাঁহারা জানিতেন এবং অন্য সকলেই মনে মনে স্থির জানিত, যে বিধাতা মনুষ্যকে যে চোখে দেখেন, পিপীলিকাকে ঠিক্ সে চোখে দেখেন না। বাইবেল গ্রন্থের প্রথম পাতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যই বিধাতার প্রিয়তম সৃষ্টি, এবং সূর্য্যনক্ষত্র হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত অন্য যাহা কিছু জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহার সৃষ্টি কেবল মনুষ্যেরই উপকারসাধনের জন্য। মনুষ্য যে ঘোড়াকে দিয়া গাড়ী টানায় এবং বলদকে দিয়া লাঙ্গল চালায় এবং দরকার পড়িলে উভয়কেই উদরস্থ করিতে দ্বিধা করে না, তাহাতে তাহার কোন ধর্ম্মগত দোষ জন্মে না; কেননা এ সকল কার্য্যে তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট চিরন্তন স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্পদিন হইল কলিকাতার বিশপ ওয়েলডন্ স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আহারের জন্য বা আমোদের জন্য জীবহত্যায় খৃষ্টানের কোন পাপ হইতে পারে না। তবে কালা আদ্‌মি এই জীবপর্য্যায়ভুক্ত কি না, তাহা বিশপ খুলিয়া বলেন নাই।

পাঠশালাসমূহে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বিধাতার এই মঙ্গলময়ত্বের অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি সাগ্রহ পক্ষপাতিতার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া আছে। বায়ু নহিলে মনুষ্য দুই মিনিট কাল বাঁচিতে পারে না, সেইজন্য ঈশ্বর যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু দিয়াছেন; জল নহিলে জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়, এইজন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল মহাসাগরে সঞ্চিত আছে এবং মহাসাগর হইতে তাহার সর্ব্বত্র সঞ্চারণের বন্দোবস্ত আছে; মেরুদেশবাসী এস্কিমোর আহারসাধনের জন্য ঠিক্ সেই প্রদেশেই শাদা ভালুকের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই শাদা

ভালুককে সেই আহারঘটনার সমাধান পর্য্যন্ত শীত হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার গায়ে দীর্ঘলোমের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই সকল গভীর তথ্য গভীর ভাষায় প্রায় সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সভ্য জাতির জীবনধারণের সুবিধার জন্য আমেরিকাখণ্ডে প্রচুর ভূমি ও আফ্রিকাখণ্ডে প্রচুর অসভ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা আজকালকার পুস্তকের মধ্যে লেখা থাকে না বটে, কিন্তু সভ্যদেশের রাজনীতিবিদেরা এ বিষয়ে খোদার অভিপ্রায়ে যে কিছুমাত্র সন্দিহান নহেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

আর একটা উদাহরণ লও—সূর্য্য। অ্যালারম্ দেওয়া ঘড়ীর মত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্যজাতির ঘুম ভাঙাইয়া প্রত্যেককে আহারান্বেষণরূপ মহাকার্য্যে প্রেরণ করিবার জন্য সূর্য্য অবিশ্রামে নিযুক্ত আছেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই কার্য্যের জন্যই বিধাতা বারলক্ষটা পৃথিবীর আয়তনবিশিষ্ট এই মহাকায় পদার্থকে পাঁচ কোটী ক্রোশ দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। পদার্থবিদ্যা শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সূর্য্য না থাকিলে বায়ু বহিত না, জল পড়িত না, মেঘ ডাকিত না, অন্নবস্ত্রেরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিত। রেশম, পশম ও কাপাসের অভাবে মনুষ্যের শীতনিবারণ ও ভদ্রতারক্ষা ঘটিয়া উঠিত না; এবং রেশম পশমাদিও কোনরূপে মিলিলে তাঁতির অভাবে বস্ত্র জুটিত না। টিণ্ডাল সাহেব বলিয়াছেন, যে সূর্য্যই কার্পাসবৃক্ষরূপে তূলা প্রস্তুত করেন এবং *গুটিপোকারূপে রেশম সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই আবার তন্তুবায়রূপে কাপড় বুনিয়া দেন।* আলোকের অভাবে চিত্রবিদ্যা ও শব্দের অভাবে সঙ্গীতকলা মনুষ্যের চিত্তরঞ্জনের জন্য উদ্ভাবিত হইত না। এরূপ স্থলে সূর্য্যের ন্যায় বহুগুণযুক্ত একটা বিরাট পদার্থের সৃষ্টি না করিলে কিরূপে মনুষ্যের বিচিত্র জীবনের বহুবিধ অভাব পূর্ণ হইত,

তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, এবং এই বহুগুণান্বিত সূর্য্যের সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা যে মনুষ্যেরই প্রতি তাঁহার পরম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কোন্ মূর্খ অস্বীকার করিবে ?

কেবল সূর্য্যই বা কেন ? সূর্য্যের চারিদিকে আরও কয়েকটা বৃহৎ বস্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহা ছাড়া প্রায় চারি শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু ও কত ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এই সৌর জগতের ভিতর ঘুরিতেছে। তাহাদের অস্তিত্বে মনুষ্যের কি মঙ্গল সাধন হয়, তাহার নির্দ্দেশ আপাততঃ দুষ্কর। অবশ্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাদের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আধুনিকেরা তাহা মানেন না, বা মানিতে লজ্জা বোধ করেন। নেপচুনের ও উরেনসের বিষয় প্রাচীনেরা জানিতেন না, কিন্তু বুধাদি গ্রহ যে মনুষ্যের শুভাশুভ ভাগ্যনির্দ্দেশের জন্যই আপন আপন কক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া থাকে, এবং ধূমকেতুর উদয় ও উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ সময়ে অসময়ে ঘটিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করিতে বলে, তাহা সে কালের পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন। একালে আমরা তাহা মানি না, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহগণ ও তাহাদের গতিবিধি কি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ? গ্রহগণের গতিবিধি আপাততঃ এত জটিল বোধ হয় যে মনুষ্যের গণনাশক্তি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সেই জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিশেষে শ্রান্ত ও পরাভূত হয়। কিন্তু লাপ্লাস্ দেখাইয়াছিলেন, সেই দুর্ভেদ্য জটিলতার অভ্যন্তরে এমন কৌশলময় নিয়ম বর্ত্তমান আছে, যে গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া কোন না কোন সময়ে ঠিক আপন আপন স্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য রহিয়াছে। লাপ্লাস্ দেখাইয়াছিলেন, যে সৌর জগতের গঠনে এমন একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, যে দেহমধ্যে যেমন হাত পা নাক কাণ, অস্থি শোণিত,

স্নায়ু পেশী ধমনী প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে অথচ পরস্পরের অধীনে কাজ করিয়া সমস্ত শরীরের কুশল বজায় রাখে; সেইরূপ গ্রহ উপগ্রহাদিও সমগ্র সৌর জগৎটাকে এরূপ ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, যে সেই জটিল জগদ্‌যন্ত্রের কখন বিপর্য্যস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। লাপ্‌লাস্ এই কথা বলিলেন, আর হুইবেল করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ বিধাতার কেমন মানবপ্রিয়তা! সৌর জগৎরূপ যন্ত্রটা এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে ও চালিত হইতেছে, যে কোন ভবিষ্যৎকালে মনুষ্যের অধিষ্ঠানভূত ভূমণ্ডলটি ভাঙ্গিয়া গিয়া মনুষ্যকে আশ্রয়চ্যুত করিবে, এবং তাৎকালিক মনুজগণের গতপ্রাণ কলেবর-গুলা উল্কাপিণ্ডের মত অন্তরীক্ষে ঘুরিতে থাকিবে, তাহার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বস্তুতই বিনা উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, এবং সেই উদ্দেশ্যের একমাত্র নাম যে মানবমঙ্গল, তাহার প্রতিপাদনের জন্য বিজ্ঞান-বিদের মস্তিষ্ক এতকাল ধরিয়া অত্যন্তই আলোড়িত হইয়াছে। মশকজাতির সৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে কিনা, স্থির করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কঠিন ব্যাপার; বিশেষতঃ মশারিহীন হতভাগ্যের পক্ষে। কিন্তু সে দিন কোন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, কোন জীবতত্ত্ববিৎ নাকি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মশকে হুলপ্রয়োগে শোণিত হইতে কোন বিষময় অংশ বাহির করিয়া লয়, এবং এইরূপে সেই আপাতবিরস, কিন্তু পরিণামশুভদ মশকজীবনও মনুষ্যের কল্যাণ-সাধনরূপ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু হায়, চিরদিন কখন সমান যায় না। মনুষ্য যখন জগতের মধ্যে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্ব্বের সহিত বক্ষ স্ফীত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, এবং যখন মনুষ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান তাহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া মনুষ্যের জয়ঢক্কা বাজাইতেছিল,

ঠিক্ সেই সময়েই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিজ্ঞানই আবার মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, প্রভো, প্রভুত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না; তুমি জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি তৃণাদপি সুনীচ, তুমি বালুকণা হইতেও অধম।

তুমি আপনাকে যে বিশাল-জগতের প্রভু বলিয়া অহঙ্কৃত হইতেছ, সেই জগতের মধ্যে তোমার স্থান কোথায়? জগৎ অনন্ত, তুমি সান্ত; জগৎ অনাদি, তুমি সাদি। সে সান্ত, যে সাদি, সে অনন্তের ও অনাদির প্রভুত্বের স্পর্দ্ধা করিবে, ইহা সেই অনন্তের ও অনাদির সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য কখনই হইতে পারে না। ইহা ভ্রম, ইহা মূঢ়তা।

সূর্য্য পাঁচকোটি ক্রোশ দূরে রহিয়া তোমার জন্য তেজ বিকিরণ করিতেছে; কিন্তু তাহার বিকীর্ণ তেজোরাশির যে কণিকামাত্র তোমার কাজে লাগে, সূর্য্যমণ্ডলের তেজঃসমষ্টির তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু? সূর্য্য হইতে তোমার নিকট আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; কিন্তু এমন প্রকাণ্ডতর সূর্য্যমণ্ডল জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা হইতে আলোক আসিয়া এখনও তোমার নিকট পৌঁছে নাই। আবার সাগর-বেলায় যেমন একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা, তোমার সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডল অসীম আকাশসাগরে তদপেক্ষা বৃহৎ নহে। আবার তোমারই এই সৌর-জগতের মধ্যে তুমি ক্ষুদ্র কীটের মত নগণ্য।

অনাদি ও অনন্তের মধ্যে তোমার নিবাস বটে, কিন্তু অনাদির সহিত ও অনন্তের সহিত তোমার তুলনা কোথায়? কাল-সাগরের মধ্যে তুমি একটিমাত্র ঊর্ম্মি অথবা একটিমাত্র বুদ্বুদ; কিন্তু সেই অসংখ্য ঊর্ম্মির মধ্যে, অগণ্য বুদ্বুদের মধ্যে, সেই একটিমাত্র ঊর্ম্মির ও একটিমাত্র বুদ্বুদের স্পর্দ্ধা করিবার কারণ কোথায়? ভূবিদ্যা

বলিতেছে, সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নাই। কত কত সাত হাজার বৎসর জগতের ইতিহাসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন মনুষ্যনামক জীব আবির্ভূত হয় নাই। কত ম্যামথ, কত মাষ্টোডন, কত ভয়াবহ সরীসৃপ, কত ভীষণ মকর তিমিঙ্গিল, পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে তোমারই মত স্পর্দ্ধার সহিত বিচরণ করিত, তখন তোমার উদ্ভব হয় নাই। তাহারও পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন ধরাপৃষ্ঠে জীব ছিল না, কিন্তু চন্দ্র এমনই জোনাকি দিত, সূর্য্য এমনই করিয়া তাপ দিত, দুরন্ত নক্ষত্রগণ এমনই করিয়া প্রতিদিন গগন মণ্ডলে দেখা দিত। কিন্তু সে কি তোমারই জন্য ? তুমি তখন কোথায় ? হুইবেলের করতালির শব্দে মোহিত হইল না। লাপ্‌লাসের গণনাতেও প্রমাদ আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞান আশা দিয়াছিল, সৌর জগতের ধ্বংস নাই ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর না যাইতেই বিজ্ঞান আবার বলিতেছে, সৌর জগতের ধ্বংসে বড় বিলম্ব নাই। সেই ভবিষ্যৎ দূরবর্ত্তী নহে, যখন সূর্য্য নিবিয়া যাইবে, যখন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া যাইবে, এককালে যে সূর্য্যের কুক্ষি হইতে বাহির হইয়াছিল, পুনশ্চ সেই সূর্য্যের কুক্ষিতেই হয়ত বিলীন হইবে। জগৎ তখনও থাকিবে। কিন্তু তুমি মনুষ্য, তুমি তখন কোথায় থাকিবে ? সাগরপৃষ্ঠে বুদ্বুদ, তুমি তখন সাগরে লীন হইয়া যাইবে ; তোমার অস্তিত্ব তখন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইবে। তুমি জগতের প্রভুত্বের স্পর্দ্ধী হইও না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ডারুইন তাঁহার মহাগ্রন্থ প্রচার করেন। ডারুইন প্রকৃতির মুখ হইতে যে অবগুণ্ঠনখানা মোচন করিয়া দিয়াছেন, নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন সকলেই জানে, যে তাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শকের চোখে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের স্পর্দ্ধার তাহাতে কি হইয়াছে ? স্পর্দ্ধার কারণ কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। প্রজাপতির

সৌন্দর্য্য ফুলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ফুলের সৌন্দর্য্য প্রজাপতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ঠিক কথা। কিন্তু মনুষ্যের চক্ষু তৃপ্ত লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ফুল আপনার সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া প্রজাপতিকে আহ্বান করিত; মধুর প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিত; প্রজাপতি আপন রূপে ফুলের রূপের অনুকৃতি করিয়া ফুলের পাশে লুকাইয়া শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিত। এস্কিমো জাতির আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে মেরুপ্রদেশে সীলের গায়ে চর্ব্বি ছিল ও ভালুকের গায়ে শাদা শাদা বড় বড় লোম ছিল; এবং সেই চর্ব্বিওয়ালা সীল ও লোমওয়ালা ভালুক যখন আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন এস্কিমো জাতির আহারসম্পাদনে তাহারা ভবিষ্যতে নিয়োজিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই।

বিশাল জগতের মধ্যে মনুষ্যের স্থান কোথায় ও পদবী কিরূপ, এ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ। আমাদের এই যে সৌরজগৎ, সূর্য্য যাহার কেন্দ্রবর্ত্তী ও আমাদের পৃথিবী যাহার অন্তর্গত, তদনুরূপ জগৎ আরও লক্ষ লক্ষ বর্ত্তমান আছে। আমরা চোখে যে কয় হাজার নক্ষত্র আকাশে দেখিতে পাই, দূরবীণে যাহাদের সংখ্যা লক্ষমানে দাঁড়ায়, তাহাদের প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য; প্রত্যেকটি হয়ত এক একটা গ্রহ-উপগ্রহ-যুক্ত সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী। সকল নক্ষত্রের আয়তন ও দূরত্ব এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। যে দুই চারিটির আয়তন ও দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের অপেক্ষা ত্রিশ চল্লিশ গুণ বড়। আমাদের সূর্য্য হইতে আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলো আসিতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর অতীত হয়। এমন নক্ষত্র সম্ভবতঃ অনেক আছে, যাহারা আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা এত বড়, যে উভয়ের ঠিক তুলনা হয়

না। তাহাদের দূরত্ব এত বেশী, যে তাহাদের আলোক হয়ত মানুষের জীবনকালে আসিয়াই পৌঁছে না। এইরূপ বহু লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্য একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আবার সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এককালে হয়ত আমাদের পৃথিবী আমাদের সূর্য্যেরই অংশগত ছিল ; সূর্য্য সে কালে এমন ছিল না। হয়ত বাষ্প জমিয়া, হয়ত কোটি কোটি উল্কাখণ্ড জমাট বাঁধিয়া, সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ও সূর্য্যেরই এক একটা টুক্‌রা কোনরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপাদন করিয়াছে। এইরূপে কত কোটি বৎসর অতীত হইয়া গেল, যখন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, যখন ইহা সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত ও শরীরগত ছিল। পরে এই পৃথিবী পৃথক্-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট হইয়াও কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া শীতল হইয়াছে। যখন ইহার পৃষ্ঠদেশ অগ্নিময় ছিল, তখন ইহাতে কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। কালে ভূপৃষ্ঠ জীবের বাসযোগ্য হইলে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ও অন্যান্য কারণে সেই সকল জীব হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের জীবের বিকাশ হইয়া অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। এই যে কয়েক বৎসর পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে, সে কয়েক বৎসর পৃথিবীর সমগ্র বয়সের তুলনায়, সৌর জগতের বয়সের তুলনায়, বিশ্ব জগতের বয়সের তুলনায়, এক নিমেষও নহে। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে দেখা দিল, তখন নরে বানরে তেমন অধিক প্রভেদ ছিল না। কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরই প্রভাবে মানুষেরও উন্নতি ঘটিয়াছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার বর্ত্তমান পদবী লাভ করিয়াছে।

মানুষের এই উন্নতির মূলে মুখ্যতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। মানুষ

মানুষের সহিত ও সমস্ত প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিশ্রামে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে নিরনব্বই জন পরাজয় ও একজন জয় লাভ করিতেছে। কে যে কি কারণে পরাজিত হয়, কে যে কি কারণে জয় লাভ করে, নিরূপণ দুঃসাধ্য ;—তবে মোটের উপর যারা দুর্ব্বল তারাই পরাস্ত হয়, যারা সমর্থ তারাই জিতিয়া যায়। মোটের উপর সমর্থের জয়লাভ ঘটে। এইরূপে প্রকৃতি নিষ্ঠুর হস্তে অসংখ্য দুর্ব্বলকে সংহার করিয়া ও কতিপয় সমর্থকে বাঁচাইয়া বর্ত্তমান মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমান মনুষ্যের পদবী উন্নত, কেন না বর্ত্তমান মনুষ্য অন্য জীব অপেক্ষা, অতীত কালের মনুষ্য অপেক্ষা সমর্থ। কিন্তু সেই সামর্থ্যেরই বা মাত্রা কতটুকু! মানুষকে এখনও সেই ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আপনার পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইয়াছে ;—এই সংগ্রাম হইতে তাহার একটু বিরাম বা অবকাশ লাভ করিবার যো নাই। একটু অসাবধান হইলেই তাহাকে পড়িতে হইবে ও মরিতে হইবে। সাবধান থাকিলেই যে জয়লাভ ঘটিবে, তাহাও সাহস করিয়া বলা চলে না। এই সংগ্রামের ফলেই মনুষ্যের প্রধান দুঃখ। দুঃখভোগ মনুষ্যজীবনে একরূপ বিধিলিপি। কষ্টেসৃষ্টে, কায়ক্লেশে প্রত্যেকে আপন মনুষ্যত্ব কয়টা দিবসের জন্য বজায় রাখিতেছে। এইরূপে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া, এইরূপে জীবনাবধি মরণ পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিয়া, মানুষ কায়ক্লেশে কিছুদিন ধরাতলে টিকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ আঁধার। এমন দিন আসিবে যেদিন আবার পৃথিবীতে মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না ; এমন দিন আসিবে যেদিন মনুষ্যেতর জীবেরও অস্তিত্ব থাকিবে না ; এমন দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীরই হয়ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। সূর্য্য সে দিন নিবিয়া যাইবে। সৌরজগতে সে দিন জীবন থাকিবে না, চেতনা থাকিবে না, মনুষ্যের প্রার্থনীয় কিছুই থাকিবে না। তবে কালের বুঝি শেষ নাই ; জগতের যেমন আদি

কল্পনায় আসে না, সেইরূপ অন্তও কল্পনায় আসে না। জগতের স্রোত চলিবে। জগৎ চলিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না। সেই ভবিষ্যতে অন্য পৃথিবীর অন্য জীব মানুষের স্থান অধিকার করিবে কি না, তাহাতে আমাদের মাথাব্যথা জন্মাইবার, দুঃখী হইবার, সম্প্রতি কোন কারণ দেখি না। মানুষ মহাসাগরে বুদ্বুদ, মহাসাগরে চিরতরে মিশাইবে। এইরূপ মানুষের অতীত, এইরূপ মানুষের ভবিষ্যৎ। ইহা লইয়া যদি স্পর্দ্ধা কর, ইহা লইয়া যদি অহঙ্কৃত হও, তাহা হইলে মূঢ়তা আর কাহাকে বলে! এই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া বিশ্বের মহত্ত্বকে আপনার অধীন করিবার প্রয়াস উপহাস্য। এই নগণ্য অচিরস্থায়ী মনুষ্যজীবনের তৃপ্তির জন্য বিধাতা এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মনে করিলে বিধাতার প্রতিও বিলক্ষণ অবিচার হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞানশাস্ত্র স্থির করিয়াছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই নির্ম্মিত; যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন জিনিষ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়ঢাক আপনি বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল; সেই কোলাহলের প্রতিধ্বনি এখনও স্তব্ধ হয় নাই। ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র অন্যরূপ কথা আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু, বালুকণা হইতে অধম।

বস্তুতই কি তাই? বস্তুতই কি মানুষ ক্ষুদ্র? বস্তুতই কি অনন্ত জগতের মধ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র? না;—ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হয়; মানুষ ক্ষুদ্র নহে।

জগৎ অসীম, আকাশ অনন্ত, কাল অনাদি,—এ সকল মিথ্যা কথা। জগৎ অসীম নহে, আকাশ অনন্ত নহে, কাল অনাদি নহে। মনুষ্য কল্পনায় পিশাচের সৃষ্টি করিয়া আপনি বিভীষিকা দেখে; মানুষে কাল্পনিক

অনন্তের ও কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত হয়।

জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে। জীবসমাকুলা বসুন্ধরা, সূর্য্যকেন্দ্রক সৌরজগৎ, নক্ষত্রাকীর্ণ নভস্তল, তোমারই অন্তরে। তুমি বিশ্ব জগতের অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগতই তোমার অন্তর্গত। বিশ্ব জগতের স্বাধীন অস্তিত্বেরই প্রমাণ নাই; তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ আবশ্যক নাই। সূর্য্য আলোক দিতেছে, সেই জন্য তুমি দেখিতেছ;—ইহা ভ্রান্তি। তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, সূর্য্য আলোক দিতেছে;—ইহাই সত্য। সূর্য্যের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ কোথায়? তোমার বন্ধুও হয়ত বলিতেছেন, সূর্য্য আলোক দিতেছে,—এই সাক্ষ্যে ভুলিও না; কেন না, তোমার বন্ধুইবা কে? তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, উনি আমার বন্ধু; তুমি বলিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু অস্তিত্ববান্। তোমার খেয়াল হইয়াছে, সেই জন্য বলিতেছ, ওখানে সূর্য্য থাকিয়া আলোক দিতেছে; তোমার খেয়াল, সেই জন্য বলিতেছ, এখানে বন্ধু দাঁড়াইয়া ঐ সূর্য্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন। তোমার বন্ধুর মুখে যে কথা শুনিতেছ, সে কথা তোমার বন্ধুর নহে। সে তোমারই কথা; তুমি তাহাকে যাহা বলাইতেছ, তাহাই তিনি বলিতেছেন। তুমি তোমার সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি তোমার বন্ধুর সৃষ্টি করিয়াছ; আবার কি অদ্ভুত খেয়াল বলে তোমার কল্পিত বন্ধুর মুখ দিয়া তোমার কল্পিত সূর্য্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য কল্পিত করিতেছ। সূর্য্যের অস্তিত্বে বিস্ময়ের কারণ নাই, বিস্ময়ের কারণ তোমার খেয়ালে। এমন খেয়াল তোমার কেন হয়, এমন খেয়াল তোমার কি জন্য হয়? অথবা এ প্রশ্নই বা কেন? এই নানারূপ খেয়াল আছে, তাই

তুমি আছ। তুমি কতকগুলা খেয়ালের সমষ্টি। এই খেয়াল ছাড়িয়া তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। খেয়াল আছে, অতএব তুমি আছ; অথবা তুমি আছ, অতএব খেয়াল আছে। তোমার খেয়ালগুলার মধ্যে, তোমার কল্পনাগুলার মধ্যে, তোমার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে, একটা শৃঙ্খলা, একটা ধারাবাহিকতা, একটা পারম্পর্য্য, একটা সমবায়, দেখিয়া তুমি বিস্মিত হও ও তোমার কল্পিত জগৎকে নিয়মাধীন ও সুব্যবস্থ দেখিয়া চমকিত হও। কিন্তু সে বিস্ময়েরই বা কারণ কি? এই শৃঙ্খলা ও এই সামঞ্জস্য তোমারই সৃষ্টি, তোমা কর্ত্তৃকই তোমার খেয়ালের উপরে আরোপিত। তোমার খেয়ালগুলাকে তুমি ঐরূপে সাজাইয়াছ, সেই জন্য তাহারা ঐরূপে সজ্জিত দেখাইতেছে। দুইটা খেয়ালকে তুমি ঠিক একই রূপে দেখ না, একটু না একটু বিভিন্নভাবে দেখ; আবার দুইটা খেয়ালকে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে দেখ না, কোন না কোন বিষয়ে সদৃশ দেখ; এই বিশেষ ও এই সমানতা দেখিয়া, বিবিধ বিশেষ ও বিবিধ সামান্য অনুসারে সাজাইয়া ও গোছাইয়া তুমি তোমার এই বিচিত্র জগতের নির্ম্মাণ করিয়াছ; অপরে ইহা নির্ম্মাণ করিতে আসে নাই। ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি স্বয়ং; অথবা ইহা লইয়াই তুমি; ইহাই তুমি; তৎ ত্বম্ অসি।

কেন তোমার এমন খেয়াল, তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত জানি, এই খেয়ালের সমষ্টি তুমি। তোমার খেয়ালে খেয়ালে সামান্য, আবার খেয়ালে খেয়ালে বিশেষ তুমি কেন দেখ, তাহা জানি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই সাদৃশ্য ও এই ভেদ আছে বলিয়াই তুমি আছ। তোমার সকল কল্পনা সমান হইলে, অথবা তোমার সকল কল্পনা বিসদৃশ হইলে, তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকিত, বুঝিতে পারি না। তুমি আছ, ইহা যদি ঠিক হয়, তবে তোমার কল্পিত জগতও ঠিক্ এইরূপই হইবে।

জগৎ কোথায়? তোমা ছাড়িয়া জগৎ নাই। জগৎ তোমারই অংশ,

তোমারই সৃষ্টি। তোমার জগৎ কি অনন্ত? মিথ্যা কথা। তোমার জগৎ সান্ত, সঙ্কীর্ণ, পরিধিবান্। তোমার জগৎ, অর্থাৎ তোমার দর্শন, তোমার স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা তুমি যে জগতের সঙ্গে কারবার করিয়া থাক, সে জগৎ সান্ত। তবে তাহার পরিধি প্রসরণশীল, তাহার সীমারেখা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। কেন? তোমার ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তির সহকারে, তোমার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির সহকারে, তোমার জগতের পরিধি প্রসার লাভ করিতেছে। ঠিক্ যে প্রণালীতে তুমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছ, ঠিক্ সেই প্রণালীক্রমে তোমার জগতের সীমা বাড়াইতেছ। দেশে তাহার সীমা বাড়াইতেছ ও কালে তাহার সীমা বাড়াইতেছ। তোমার ব্যক্তিত্ব ক্রমে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। কেন হয় তাহা জানি না, তোমার 'তুমিত্বের' এই লক্ষণ। তোমার যে অবস্থার নাম সুপ্তাবস্থা, তখন তোমার জগৎ খাট হইয়া সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে লীন হয়; তোমার যে অবস্থার নাম জাগ্রত অবস্থা, তখন তোমার জগতের পরিধি বিস্তৃত হয়। কিন্তু তোমার সমগ্রজীবনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত্ত, এমন কোন ক্ষণ, দেখি না, যখন তোমার জগৎ অনন্ত ও সীমাহীন ও পরিধিহীন। তুমি জগতের সৃষ্টি করিতেছ, ক্রমশঃ জগৎকে গড়িয়া তুলিতেছ; কোথায় তুমি থামিবে, তাহা জানি না; তুমিও তাহা জান না। সেই জন্য তুমি বলিতেছ, জগতের সীমা নাই। তুমি ভ্রান্ত। তোমার অভিব্যক্তির সীমা তুমি পাও নাই, তোমার সৃষ্টিক্ষমতার সীমানির্দ্দেশে তুমি সমর্থ হও নাই, এই পর্য্যন্ত সত্য।

তোমার জগৎ সুনিয়ত, সুব্যবস্থ, শৃঙ্খলাযুক্ত। বিস্মিত হইও না। সে তোমারই কীর্ত্তি! জগতে নিয়ম আছে, কেননা তুমি জগতে নিয়ম স্থাপন করিয়াছ। জগতের স্রোত আকাশ ব্যাপিয়া কাল বাহিয়া চলিতেছে; সুনিয়তভাবে চলিতেছে; কেননা তোমার লীলাক্রমে উহা ঐরূপ চলিতে বাধ্য। তোমার জগতে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে;

সেইজন্য তুমি প্রকৃতিস্থ মনুষ্য, তুমি বাতুল নহ। তোমার জগতে যদি নিয়ম না থাকিত, যদি তোমার জগৎ অব্যবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে বাতুল বলিতাম। যাহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, যে আপনার কল্পনাগুলিকে ব্যবস্থা সহকারে সাজাইয়া দেখিতে পারে না, তাহাকে বাতুল বলিয়া থাকি। সম্পূর্ণ বাতুল কেহ নাই। যাহার জগতে নিয়মের একেবারে অস্তিত্ব নাই, সকলই অব্যবস্থ, সে মনুষ্য নহে।

মনুষ্যের জাতীয় ইতিহাসে বহুদিন গত হইয়াছে, যখন মনুষ্য আপনার কল্পনার সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্র স্থির করিয়া সেই কল্পনার মাহাত্ম্যে ভীত ও সেই কল্পনার উপাসনায় নিরত হইয়াছে, এবং আপনার জীবনকে কাল্পনিক দুঃখের আধার ভাবিয়া, সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের নিষ্ফল প্রয়াসে প্রতারিত হইয়াছে। এমন দিন কি আসিবে না, যখন এই মিথ্যা বিভীষিকা, তাহার মনুষ্যত্বকে আর সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ রাখিবে না, এই কল্পিত পিশাচ তাহার উপাসনা গ্রহণে সাহসী হইবেক না, এই কাল্পনিক মুক্তিপ্রয়াস তাহাকে উন্মার্গগামী করিবে না। যখন মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝিবে; আপনাকে জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও বিধাতা এবং সংহর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারিবে। পূর্ণ মনুষ্যত্বে বলীয়ান্ মনুষ্যের কণ্ঠে সোঽহম্ এই মহাবাক্য পুনরায় ধ্বনিত হইবে; কিন্তু সেই মহাসত্য মনুষ্যকে অতীতকালের মত সমাজদ্রোহী বৈরাগ্য ও ভ্রান্ত অনাসক্তির অধর্ম্মাত্মক পন্থায় চালিত না করিয়া আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের পালনে, সৃষ্টির প্রতি ও জগতের প্রতি কর্ত্তব্যের পালনে, নিযুক্ত রাখিয়া ব্যাবহারিক মৃত্যু হইতে পারমার্থিক অমৃত লাভের অধিকারী করিবে।

এক না দুই ?

জগৎ এক না দুই ? এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দার্শনিকেরা বহুকাল হইতে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেরূপ অনুচিত স্পর্দ্ধা নাই; তবে পাঁচ জন পণ্ডিতে পাঁচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে মাত্র।

প্রথমে প্রশ্নের অর্থ বুঝা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ পদার্থের সংখ্যা করিয়া উঠে, মনুষ্যের মনের এরূপ শক্তি নাই। বস্তুতই যে সকল জ্ঞানগোচর সামগ্রী জগতের উপাদান, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। সংখ্যা করিতে উপস্থিত হইলেই মনুষ্যকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ জগৎ লইয়া যখন কারবার, তখন উহাদের সহিত এক রকম পরিচয় না রাখিলেও চলে না। প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ করিয়া পরিচয় যেখানে অসম্ভব, সেখানে বাধ্য হইয়া শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। গোটাকতক লক্ষণ ধরিয়া সেই লক্ষণের হিসাবে সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে সংখ্যাতীত পদার্থ অল্পসংখ্যক শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। আবার পঞ্চাশটা শ্রেণীকে কোন একটা বিশেষ লক্ষণ ধরিয়া আর একটা বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হয়। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানগোচর সমুদয় পদার্থই স্থানলাভ করে। এই শ্রেণী কয়টার লক্ষণ মনে করিয়া রাখিতে পারিলে সমগ্র জগৎটারই একরকম পরিচয় জানা হয়। এইরূপে মানসিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে; এবং দুরন্ত

জীবনসমরে কোনরূপে মানসিকশ্রমের লাঘব ঘটিলেই তজ্জনিত আরাম ও আনন্দ স্বতই উপস্থিত হয়। এইজন্য মনুষ্যের মন অসংখ্যকে অল্পসংখ্যকের মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থনিচয়কে, জগতের উপাদানগুলিকে, কয়েকটা পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে আনিবার জন্য, ব্যাকুল।

এইরূপে মানসিকশ্রম সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে সমুদয় জাগতিক পদার্থকে পূরিবার চেষ্টা, বহুকাল হইতে দেখা যাইতেছে। যাবতীয় পদার্থকে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। সেই শ্রেণীর সংখ্যা যতই কম হয়, ততই সুবিধা। এখন প্রশ্ন এই, কোথায় গিয়া থামিবে, দশে না পাঁচে না দুইয়ে না একে ? কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে। সমস্ত জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; সেই দুইটার মধ্যে আর কোন সাধারণ লক্ষণ, কোন সমানতা বা সামান্য, বর্ত্তমান নাই ; উহারা পরস্পর এত তফাত যে, উহাদিগকে আর একের ভিতর, এক পর্য্যায়ের ভিতর আনা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে থামিব কেন ? একটু অভিনিবেশ করিলে সেই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য, সামান্য, বা সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির করা যাইতে পারে। সুতরাং দুইকেও টানিয়া একের ভিতর ফেলিতে পারা যায়। অথবা বলা যাইতে পারে, তোমরা যাহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা প্রকৃত পক্ষে একই, উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। যা কিছু পার্থক্য, তাহা আকৃতিগত বা রূপগত। একই জিনিষ বিভিন্ন রূপে বর্ত্তমান।

এইরূপে দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বিষম কোলাহল করেন। কেহ বলেন দুই ; কেহ বলেন এক। কোলাহল তীব্র ও কর্ণভেদী। কথনও ইহার নিবৃত্তি হইবে বোধ হয় না।

কথা হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া, জগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

উপাদান উপকরণ লইয়া। এখন জগতের উপাদান কি? জগতের উপাদান সূর্য্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, জলবায়ু, রূপরস, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ ইত্যাদি। এই সকলই জগতের উপাদান। সূর্য্যচন্দ্রাদিও যেমন জগতে বর্ত্তমান, রূপরসাদি বা হর্ষবিষাদাদিও তেমনি জগতে বর্ত্তমান। সকলই আমাদের জ্ঞানের গোচর বা অনুভবগম্য। এই সকলকে লইয়াই এই বিশাল বিচিত্র জগৎ।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া দুইটা জাতির মধ্যে সবগুলিকে ফেলা চলিতে পারে। চন্দ্রসূর্য্য হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত একজাতীয় সামগ্রী; অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সহজবোধ্য সাদৃশ্য লইয়া ইহারা জ্ঞানগোচর হয়। আর সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ; উহারা যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের উপাদান।

সুতরাং জগতের পানে চাহিবামাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই দুই শ্রেণীর পদার্থ দেখা দেয়। এক শ্রেণীর পদার্থকে আমরা জড় পদার্থ ও অন্য শ্রেণীর পদার্থকে চিৎপদার্থ অভিধান দিই। জড় যেন চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সাদৃশ্য নাই। জগৎ যেন দুইটা,—একটা জড়জগৎ, একটা চিৎ-জগৎ বা মনো-জগৎ। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়, তাহা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমেই দেখা যায়, জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর জগৎ; অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি কতিপয় শারীরিক যন্ত্রযোগে আমরা জড়জগতের সহিত কারবার চালাইয়া থাকি। এই সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় আখ্যা দিয়া থাকি, এবং আমরা জানি, এই ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের জড়জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ঐ জ্ঞান

আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিয়া দিলে ঐ জগতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিজের শরীরটাও ঠিক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, সুতরাং জড়জগতের অন্তর্বর্ত্তী। কিন্তু চন্দ্রসূর্য্যকে ও জলবায়ুকে যেমন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, রাগদ্বেষ, হর্ষবিষাদ প্রভৃতি পদার্থকে তেমন ইন্দ্রিয়গোচর বলা যায় না। চন্দ্রসূর্য্য ও জলবায়ু রূপরসাদিযুক্ত; আর আমার রাগদ্বেষ হর্ষবিষাদাদি রূপরসাদি-বর্জ্জিত; সুতরাং তাহারা জড়জগতের অন্তর্ভূত নহে।

এইখানেই একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন পদার্থ কি থাকিতে পারে না, যাহা রূপরসাদিবর্জ্জিত, অথচ জড়পদার্থের মধ্যে গণ্য? আজকালকার পণ্ডিতেরা আকাশ বা ঈথর নামে একটা জড়পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, তাহা রূপ-রস-গন্ধাদি বর্জ্জিত; তবে কি সেই আকাশকে জড়পদার্থ না বলিয়া চিৎপদার্থের মধ্যে ফেলিব, না তাহার জন্য না-জড় না-চিৎ একটা মাঝামাঝি তৃতীয় জগতের প্রতিষ্ঠা করিব?

ইহার উত্তর এই। এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু ইহাতে বিবিধ গতি উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। যেমন স্থির বায়ু সহজে আমাদের স্পর্শগোচর হয় না, কিন্তু চলন্ত বায়ু আমাদের স্পর্শবোধ জন্মায়; সেইরূপ স্থির আকাশই আমাদের অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনেকেই আমাদের অনুভবগম্য। আকাশে যে সব ছোট ছোট ঢেউ উঠে, তাহা আমাদের দৃষ্টিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন; সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি না, কিন্তু ঢেউগুলির ধাক্কা চোখে না পড়িলেও আমরা অন্য জিনিষ দেখিতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে ঢেউগুলির ধাক্কা অনুভবের নামই দৃষ্টি; তবে সেই ধাক্কাগুলির সাহায্যে আমরা দূরস্থ অন্য পদার্থের

অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, সে আমাদের কল্পনার বা সৃষ্টিক্ষমতার একটা বাহাদুরি। আবার সেই ঈথরে যখন টান পড়ে, তখন যে বিবিধ ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গোচর ও অনুভবগোচর হয়, তাহাদিগকে তাড়িত ব্যাপার অভিধান দিই। আবার সেই ঈথরে যখন ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত জন্মে, তখন যে সকল ক্রিয়া অনুভবে আইসে, তাহাদিগকে চৌম্বক ব্যাপার বলিয়া থাকি। সেই ঈথরে যখন বড় বড় ঢেউ চলিতে থাকে, উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে আমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারি না বটে, কিন্তু কৌশলক্রমে সেই বড় বড় ঢেউগুলিকেই রূপান্তরিত করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে, কিরূপে বলিব? ঈথর যদি ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, তবে বায়ু, জল বা মাটিই বা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর কিরূপে? মাটি ও জল ও বায়ু ইহারাও ত আমাদের জ্ঞানগোচর নহে, উহাদের গতিই আমাদের জ্ঞানগোচর। বায়ু যখন বহিতে থাকে, তখন আমরা উহার ধাক্কা খাই; বায়ুর কণাগুলি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, তখনই আমরা শব্দ শুনি; বায়ুর, জলের বা মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যখন দুলিতে দুলিতে আমাদের ত্বকের উপর ধাক্কা দেয়, তখন আমরা উহাদের শীতোষ্ণতা বুঝিয়া থাকি; আবার এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির কম্পন যখন ঈথরে সংক্রান্ত হইয়া দূর হইতে আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন আমরা দূরে ঐ সকল কণিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। সময়ে সময়ে এমনও হয়, ঈথরের ঢেউগুলি আসিতে আসিতে ঘুরিয়া গিয়া এক মুখ হইতে অন্য মুখে চলিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা যে স্থানে উহাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি কল্পনা করি, সেখানে উহাদের অস্তিত্বও নাই, অবস্থিতিও নাই। উদাহরণ—প্রতিবিম্ব ও মরীচিকা। কোন জড়পদার্থই মুখ্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে; উহাদের

গতি, উহাদের প্রবাহ, উহাদের কম্পন, আন্দোলন, ঘূর্ণন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। আমরা ক্ষিতি জল মরুৎ অনুভব করি না; উহাদের ধাক্কা অনুভব করি; সেইরূপ আকাশ অনুভব করি না, কিন্তু আকাশের ধাক্কা অনুভব করি। সুতরাং ক্ষিতি জল মরুৎ যদি জড়পদার্থ হয়, আকাশ বা ঈথরও সেই অর্থে জড়পদার্থ। কোন জড়পদার্থই মুখ্যতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ হয় গতি; জড় একটা অনুমান মাত্র।

সুতরাং জড়পদার্থ ছাড়িয়া আর একটা নূতন পদার্থ জগতে উপস্থিত হইল, ইহার নাম গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে সম্বন্ধ কি? যতদূর দেখা যায়, এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। গতিহীন জড়পদার্থ আছে কিনা, আমরা জানি না। থাকিলেও বর্ত্তমান কালে তাহার আলোচনা মস্তিষ্কের নিষ্ফল ক্লেশমাত্র। সেরূপ জড়পদার্থ কোন কালে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না বা জ্ঞানগোচর হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে; তাহার আলোচনা বিফল।

গতি ছাড়িয়া জড় নাই; জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতির সহিত, গৌণতঃ জড়ের সহিত। যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিবে না কেন?

জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। যাহা জড়, তাহাই গতিশীল, অথবা যাহা গতিশীল, তাহাই জড়;—এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে ভুল হইবে না।

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি? না যাহা গতিশীল। গতি কি? না স্থান-পরিবর্ত্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কিনা, উহা এইক্ষণে

এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণ ও পরক্ষণ, এখানে ও ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্ত্তনকে আমরা কালগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে দেশগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে পরিবর্ত্তন, তাহারই নাম গতি। আমরা জড়দ্রব্য অনুভব করি না, আমরা উহার গতির অনুভব করিয়া থাকি। গতির অনুভব কি? না একটা পরিবর্ত্তনের অনুভব। পরিবর্ত্তনটা কিরূপ? ইহা বাক্য দ্বারা, ভাষাদ্বারা, বুঝাইতে পারি না, মনে মনে বুঝিয়া থাকি। আমিও বুঝি, তুমিও বুঝ। তবে এই পরিবর্ত্তনের একটা নাম দেওয়া যায়। সেই নামোল্লেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, পরিবর্ত্তনটা কিরূপ! একটা পরিবর্ত্তন দেশগত; যথা, উহা এখানে ছিল, ওখানে গেল। আর একটা পরিবর্ত্তন কালগত; এখানে ছিল তখন; ওখানে আসিয়াছে এখন। দুইটা পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবর্ত্তন কালের সহব্যাপী। একই ক্ষণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিতি কল্পনায় আসে না। এখানে ছিল, ওখানে গেল; উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। তাই কাল-ক্রমে দেশ-গত পরিবর্ত্তন, ইহাই গতি। এই গতি জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ; কেন না গতি ছাড়িয়া জড় নাই; গতিহীন জড় জ্ঞানগম্য নহে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের লক্ষণ; জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে। এখানে আছে, আবার হয়ত ওখানে যাইবে। এইক্ষণে আছে, আবার পরক্ষণে যাইবে। এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া থাকি। আর এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তি-গত যে পরিবর্ত্তন আমরা অনুভব করি, তাহাকেই আমরা গতি আখ্যা দিই।

সুতরাং আমাদের জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড়জগৎ ও গতি-

জগৎ। কেহ "জড়জগৎ ও গতিজগৎ" না বলিয়া হয় ত "জড়জগৎ বা গতিজগৎ" বলিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, গতিই জড়, গতি ভিন্ন জড়ের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সে তর্কে এখন কাজ নাই। কিন্তু বিশ্বজগতের আর একটা বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জড় জগতের বা গতি জগতের সামিল নহে। আমার আশা, আমার বাসনা, আমার হর্ষ ও আমার বিষাদ, সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর অস্তিত্ববিশিষ্ট সামগ্রী। বরং চন্দ্রসূর্য্য, ক্ষিত্যপ্তেজ ছাড়িয়া আমি দুই দণ্ড থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই। স্বপ্ন কালে যখন চন্দ্রসূর্য্য ক্ষিত্যপ্তেজ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, তখনও হর্ষবিষাদ আশাভয় স্মৃতি ও বাসনার ছায়া আমার সম্মুখে নৃত্য করে। ইহারা অস্তিত্ববান্; কিন্তু ইহারাও কি জড়পদার্থ? ইহাদের গতি আমরা বুঝি না; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের ধারণায় আইসে না। ইহাদের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধস্পর্শও নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই। মোটা কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, অথচ কালব্যাপ্তি আছে। ভয় এই ছিল, এই নাই; আশা তখনও ছিল, এখন আর নাই; বাসনা লুপ্ত হইয়াছে; স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে। ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি আছে। সুতরাং দেশ-কাল-ব্যাপ্ত গতিশীল জড়জগৎ ছাড়া কাল-ব্যাপ্তিমাত্র-বিশিষ্ট গতিহীন আর একটা চিৎ জগৎ বা মনোজগৎ আছে।

সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ দুইটা, অথবা জ্ঞানময় বিশ্বজগতের দুইটা ভাগ; একটা জড়জগৎ, গতিজগৎ, বাহ্য-জগৎ; দেশকালব্যাপ্তি ইহার মুখ্য লক্ষণ; রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ইহার গৌণ লক্ষণ; অথবা রূপরসাদি উল্লিখিত গতির ইন্দ্রিয়লব্ধ ফল। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় জগৎ বর্ত্তমান,—মনোজগৎ, চিৎ জগৎ বা অন্তর্জগৎ; কেবল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশব্যাপকতা নাই, আছে

কেবল কালব্যাপকতা ; ইহার অন্যান্য ধর্ম্ম ভাষায় প্রকাশ্য নহে, তবে অনুভবগম্য বটে।

সুতরাং জগৎ দুইটা ; অথবা একই জগতের দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ। এই হইল এক সম্প্রদায়ের উক্তি। এই দুই ভাগকে আর মিলাইয়া একটামাত্র ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য নাই ; ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। এই হইল এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতের দ্বৈতবাদ।

এইখানে জড়বাদী আসিয়া দাঁড়ান। তিনি জড়বাদী, কিন্তু অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, জড়জগৎই একমাত্র জগৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। গতি জড়ের ধর্ম্ম। গতির বিভিন্ন মূর্ত্তি। কখন স্রোত, কখন ঢেউ, কখন ঘূর্ণী। গতির বিবিধ মূর্ত্তি অনুসারে তাড়িত ক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া, আলোক ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়া, প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শরীর জীবন্ত পদার্থ। জীবন কি ? কতকগুলি বিভিন্ন গতির সমষ্টিমাত্র। জীবনে গতির ব্যাপার জটিল বটে, কেন এত জটিল ঠিক্ বুঝিতে পারি না ; কিন্তু কোন্ গতিই বা বুঝি ? আতা ফল মাটিতে পড়ে ; কেন পড়ে, বুঝি কি ? অম্লজানকণিকা উদজানকণিকার প্রতি ধাবিত হয় ; কেন হয়, কেহ বলিতে পারে কি ? অঙ্গারকণিকা ও উদজানকণিকা আর পাঁচটা কণিকার সহিত যুক্ত হইয়া বিচিত্র জীবনক্রিয়ার উৎপাদন করে ; ইহা অধিক আশ্চর্য্য হইল কিসে ?

কথাটার উত্তর দেওয়া কঠিন। মনুষ্যশরীরের সমগ্র ভাগে ও প্রত্যেক অংশে যে জীবনক্রিয়ার বিকাশ দেখি, ক্ষুদ্র জৈবনিক প্রোটাপ্লাজমে তাহাই দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই জীবন-ক্রিয়া সজাতীয়। শর্করা-দ্রবে মিছিরির দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায় ; বায়ুমধ্যে চারাগাছ বড় গাছে পরিণত হয় ; উভয় ঘটনা সমান জটিল না হউক, ভিন্নজাতীয় কে

বলিল ? অভিব্যক্তিবাদ কে না মানে ? যে আজিও মানে না, সে মূর্খ। নির্জ্জীবে ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে ইহা স্বীকার করিলে অভিব্যক্তিবাদ উলটাইয়া যাইবে।

আর একটা কথা। জীবন জড়ধর্ম্ম হউক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু চৈতন্য কি ? সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, এ সকল কি ?

জড়বাদীর উত্তর—মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ, আর মস্তিষ্ক মনুষ্য-শরীরের অন্তর্গত জড়পদার্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেইখানেই সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ। যেখানে মস্তিষ্ক নাই, সেখানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। অঙ্গারকণিকা গতিযুক্ত হইলে, তাপ জন্মে ; মস্তিষ্ককণিকা গতিযুক্ত হইলে হর্ষবিষাদের উৎপত্তি হয়। সুতরাং হর্ষবিষাদ একরূপ গতি, অথবা জড়পদার্থের গতিবিশেষে উৎপন্ন জড়ধর্ম্ম।

জড়বাদী—বলেন, অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জগৎ কল্পনা করিবার দরকার নাই। মস্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় নাই। মস্তিষ্কহীনের চেতনা নাই। ফস্‌-ফরস যেমন আলোক উদ্গিরণ করে, মস্তিষ্ক পদার্থ সেইরূপ চেতনা উদ্গিরণ করে। উভয়ের মূলে জড় ও জড়ের গতি।

এই হইল জড়বাদীর অদ্বৈতবাদ। জগৎ একটা, উহা জড়জগৎ ; গতি উহার ধর্ম্ম। গতির ফলে বিবিধ ঘটনা, তাড়িত, চৌম্বক রাসায়নিক, জৈব, মানসিক। জড়বাদীরা সকলেই আবার অদ্বয়বাদী নহেন ; কেহ কেহ জড়কে ও গতিকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। জড় এক রকম জিনিষ, গতি অন্যরূপ জিনিষ ; এক অন্যের আশ্রয়স্বরূপ ; কিন্তু উভয়ে বিভিন্নজাতীয় পদার্থ।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা আসিয়া আর একটা নূতন কথা বলে। পদার্থবিদ্যা প্রায় এক শত বৎসর হইল প্রমাণ করিয়াছে, জড়পদার্থের সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। আবার প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর হইল,

বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিনামক একটা পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে এই শক্তিরও সৃষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। এই শক্তি জিনিষটা কি, যিনি পদার্থবিদ্যা অনুশীলন করেন নাই তাঁহাকে বুঝান কঠিন। গতিবলে শক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু গতি আর শক্তি ঠিক এক পদার্থ নহে। গতির শাস্ত্রসম্মত ইংরাজী নাম motion; শক্তির শাস্ত্রসম্মত নাম energy। আবার পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে বল নামে আর একটা শব্দ পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজী নাম force। দর্শনশাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রের motion, energy ও force বা গতি, শক্তি ও বল এই তিনটাকে লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া ফেলেন। বড় বড় পণ্ডিতের রচিত দার্শনিক গ্রন্থে দেখা যায়, force এবং energy এই দুই শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হইতেছে, এবং একের সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, অপরের প্রতি তাহার প্রয়োগ হইতেছে। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বস্তুতই ফেলান হয়। বেইন ও স্পেন্সারের মত পণ্ডিতেও এখানে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। পদার্থবিদ্যোক্ত বল ও পদার্থবিদ্যোক্ত শক্তি এক পদার্থ নহে। শক্তির যে হিসাবে অস্তিত্ব আছে, বলের সে হিসাবে অস্তিত্ব নাই। শক্তির বেচাকেনা চলে; শক্তি ঠিক্ জড়পদার্থের মতই খরচ করা চলে বা মজুত রাখা চলে। জড় পদার্থের যেরূপ ধ্বংস নাই, শক্তিরও সেইরূপ ধ্বংস নাই অথচ শক্তি জড়পদার্থ নহে; জড়পদার্থ ইহার অবলম্বন মাত্র। শক্তি এক জড়দ্রব্য হইতে অন্য জড়দ্রব্যে যায়। যখন এক দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে যায়, তখনই গতি উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ বল বলিয়া কোন বস্তু নাই; বস্তু যদি থাকে, তাহা শক্তি। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করি, তাহাও শক্তি। শক্তি যখন বহিঃস্থ জড় দ্রব্য হইতে আসিয়া আমাদের শরীরে, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে, প্রবেশ করে, তখনই আমরা রূপ-রসগন্ধাদি যোগে সেই জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করি।

পদার্থবিদ্যার মতে জড় ও শক্তি উভয়ই অনশ্বর। ইহাদের সৃষ্টিও আমরা দেখি না, ধ্বংসও আমরা দেখি না। ইহাদিগকে লইয়া জড়বাদীর দ্বৈতবাদ। জগতের দুইটা ভাগ; একটা ভাগ জড়, আর একটা ভাগ শক্তি; তৃতীয় ভাগের কল্পনার প্রয়োজন নাই। শক্তি-যোগে জড়পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। সেই গতি সমুদয় জাগতিক ক্রিয়ার মূল।

একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সেই আপত্তির সম্মুখে জড়বাদ ও তদনুযায়ী দ্বৈত-বাদ উভয়ই সমূলে ধ্বংস পায়।

প্রথম কথা এই। জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই, কে বলিল? আমাদের দর্শনশাস্ত্রে একটা কথা আছে, অভাব হইতে ভাব অথবা ভাব হইতে অভাব জন্মে না। হর্বার্ট স্পেন্সার সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলেন, জড়ের ধ্বংস বা শক্তির ধ্বংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না; অতএব জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। হর্বার্ট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে পারেন না; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে, রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়াশিয়ের পূর্ব্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আসিত; এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে, শক্তির ধ্বংসও সক-লেরই কল্পনায় আসিত। জড়ের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য লাবোয়া-শিয়ের এবং শক্তির অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য হেলমহোলৎজের জন্মগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কি, যে হর্বার্ট স্পেন্সার শক্তির নশ্বরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, তিনিই স্বরচিত First Principles নামক বিখ্যাতগ্রন্থে পদার্থবিদ্যাবিদের Conservation of Energyর সহিত স্বকপোলকল্পিত Persistence of Forceকে এমন ভাবে জড়া-ইয়া ফেলিয়াছেন যে আধুনিক শক্তি-তত্ত্বের তাৎপর্য্যই তাঁহার কতদূর

ছন্দগত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় জন্মে। এই জন্য তাঁহাকে পদার্থবিদ্যাবিদের অনেক বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে, আমাদের ভূয়োদর্শন হইতে, আমরা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কত দিনের? আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কতদূর ব্যাপিয়া আছে? বিশাল জগতের অতি সঙ্কীর্ণ প্রদেশ যে কয়টা দিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি, সেই অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়া অতদূর লম্বা কথাটা বলিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনশ্বর, ইহা বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। কালই এমন একটা নূতন প্রদেশের আবিষ্কার হইতে পারে, যেখানে জড়পদার্থের অহরহঃ সৃষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অহরহঃ সংহার হইতেছে। হর্বার্ট স্পেন্সার জড়ের ও শক্তির সৃষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাঁহারা আধুনিক পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন, এখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক অক্লেশে উভয়ের সৃষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় আপত্তি,—জড় কোথায়? জড়বাদী বলিয়া থাকেন, জড় শক্তির আশ্রয়। কিন্তু জড় শক্তির আশ্রয়, তাহার প্রমাণ কি? শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; তখন আমাদের রূপরসস্পর্শাদি প্রতীতির উৎপত্তি হয়। শক্তি সঞ্চারে গতি উৎপন্ন হয়। শক্তি লইয়া আমাদের কারবার, শক্তি আমাদের অনুভবগোচর; শক্তি সঞ্চারের ফলে যে গতি, সেই গতিই আমাদের জ্ঞানগম্য। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি শক্তির প্রকারভেদ; ইহারাই আমাদের জ্ঞানগম্য। ইহাদিগকে আমরা জানি; ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পর্ক

নাই ; থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। শক্তির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। শক্তিময় জগৎ। শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ, শক্তিই বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ উপাদান। পদার্থবিদ্যা শক্তিরই আনাগোনার আলোচনা করে। কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। জড়ের উল্লেখ মাত্র না করিয়া সমগ্র পদার্থবিদ্যার আলোচনা আজকাল অসম্ভব নহে।

যাঁহারা বিচারসংস্কৃত দার্শনিকবুদ্ধিদ্বারা আধুনিক পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, জগতের মধ্যে গতিবিধির ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য জড়পদার্থ নামক একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষের কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে জড়ের যে উল্লেখ দেখা যায়, উহা গণিতবিদ্‌গণের কল্পিত একটা সংজ্ঞামাত্র, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণহীন। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র হইলে জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে।

জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইলেও শক্তিবাদ থাকিয়া যায়। জড় অস্তিত্বহীন হইলেও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যায়, শক্তিই বা কোথায় ? আলোক, তাপ, শব্দ প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি, স্পর্শ ও শ্রুতি মাত্র ; আমরা যে ব্যাপারকে শক্তির আনাগোনা আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কেবল আমাদের কতকগুলি প্রতীতির উৎপত্তি ও বিলয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই প্রত্যয়গুলিই আমাদের প্রত্যক্ষ ; প্রত্যয়ের মূলে, প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের মানসিক ব্যায়াম, তাহা আমাদের বুদ্ধির খেলা। জড় যেমন কল্পিত পদার্থ, শক্তিও সেইরূপ কল্পিত পদার্থ। বাহ্যজগতই একটা কল্পনা।

এই শেষোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে উত্তর আমি কোথাও দেখি নাই। উত্তর দিবার চেষ্টা অনেকস্থলে দেখিয়াছি, কিন্তু সে কেবল ছেলে-

খেলা। কিন্তু ইহাতে শক্তিবাদ বা জড়বাদ শূন্যে মিশিয়া যায়। ইহাকে আত্মবাদ বা চৈতন্যবাদ বলিতে পার। জড়বাদের সহিত ইহার প্রকৃতি-গত বিরোধ।

যাঁহারা এই প্রকৃতিগত বিরোধের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ বলেন। জগৎ প্রকৃতই দুইটা। একটা বাহ্য জগৎ, একটা অন্তর্জগৎ। এই উভয় জগতই এক অর্থে আমার পরিচিত বটে; কিন্তু আমার পরিচয় বস্তুতঃ উভয় জগতের বাহ্য মূর্ত্তির সহিত; উহার অভ্যন্তরের প্রকৃত স্বরূপ কখন আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

এমন একটা কিছু আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রকৃত রূপ আমার জানিবার কোন উপায় নাই। তাহা একটা বাহ্য মূর্ত্তি লইয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয়; সেই মূর্ত্তিকেই আমরা জড়জগৎ বলিয়া থাকি। যেটা উহার আসল স্বরূপ, যাহাকে ইংরাজীতে বলে thing-in-itself সেটা, আমাদের অগোচর, সেটা আমাদের অজ্ঞেয়।

আর জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র আর একটা অন্তর্জগৎ আছে, উহা বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ না হইলেও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। উহা জড়-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ জড়জগতের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই অন্তর্জগতেরও প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না, উহার বাহিরের মূর্ত্তিটার সহিতই আমাদের পরিচয়।

ইঁহারা বলেন, বাহ্যজগতের মূলে একটা কিছু আছে, যাহার স্বরূপ অজ্ঞেয়; তাহার নাম জড়। অন্তর্জগতের মূলেও অজ্ঞেয়স্বরূপ একটা কিছু বর্ত্তমান; তাহার নাম আত্মা। আমরা আত্মার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহি না; জড়ের অস্তিত্বও তোমরা যেন অপলাপের চেষ্টা করিও না। এত বড় বাহ্যজগৎ, ইহাকে একেবারে উড়াইলে চলিবে

কেন ? বস্তুতঃ উভয়ই বর্ত্তমান ; উভয়ের মধ্যে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ। আত্মা ভোক্তা, জড় ভোগ্য। সাংখ্যদিগের ইহাই বোধ হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা ; আর পুরুষের প্রকৃতিভোগ ব্যাপার লইয়াই জড়জগতের সহিত অন্তর্জগতের কারবার, এই দেনালেনা, আনাগোনা। পুরুষ অজ্ঞেয়, প্রকৃতিও অজ্ঞেয়। তবে প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হইলে জড়জগৎ তাহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি লইয়া অন্তর্জগতের নিকট দণ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয়, কেন এমন দেখায়, এ প্রশ্নের উত্তর নাই।*

এই দ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘসিয়া অদ্বৈতবাদে পরিণত করা না চলে, এমন নহে। জগৎ একটাই ; একেরই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। একটা মূর্ত্তি বাহ্যজগৎ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্তর্জগৎ। একই সত্তার এক রূপ জড়, অন্য রূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন একপিঠ কুব্জ, অন্য পিঠ ন্যুব্জ, এক পাশ হইতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পার্শ্ব হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতকটা সেইরূপ। উভয়ের এই সম্বন্ধ প্রকৃতিগত ; এ সম্বন্ধ আকস্মিক আগন্তুক সম্বন্ধ নহে। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। জড় ছাড়া চিৎ নাই ; আবার অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে বলিতে হইবে, চিৎ ছাড়াও জড় নাই। মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যদি চৈতন্যযুক্ত হয়, তবে অঙ্গারকণা ও জলকণাও কেন চৈতন্যহীন হইবে ? কেন না, অঙ্গারকণা ও জলকণা লইয়াই ত কীটাণু-দেহ ও মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত ; প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। অঙ্গার-কণাকে চৈতন্যযুক্ত বলিতে আপত্তি করিও না ; চৈতন্য শব্দের প্রয়োগে

* যাঁহারা এই মতের অতি বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত ৺উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধ সমূহ দেখিবেন। ঐ প্রবন্ধসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎপদার্থ অথবা এইরূপ আর একটা নাম ব্যবহার করিলে সে আপত্তি কাটিয়া যাইবে। ফলে যেমন পূর্ব্ব থাকিলেই পশ্চিম থাকিবে, ঊর্দ্ধ থাকিলেই অধঃ থাকিবে; সেইরূপ জড় থাকিলেই চিৎ থাকিবে। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা পদার্থতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী। উদাহরণ হর্ব্বার্ট স্পেন্সার ও লয়েড মরগান্।

জড়জগতের তরফে এইভাবে ওকালতি আরম্ভ করিলে, উহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে অত্যন্ত পাষণ্ড বিচারকেরও মায়া জন্মিতে পারে। কিন্তু তথাপি রূপরসগন্ধস্পর্শ নামধেয় আমার প্রত্যয় কয়েকটা ছাড়িয়া দিলে, এই বাহ্য জগতে আর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত কোন মতেই ঠাহর পাইতেছি না। রূপরসাদির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহারা আমারই প্রত্যক্ষ বস্তু; উহারা আমার অন্তর্জগতের উপাদান। কিন্তু উহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পদার্থ আমার বাহিরে কি আছে, তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইহা সত্য কথা। কিন্তু কাহার রূপ দেখিতেছি, এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? গাছের রূপ দেখিতেছি, পাহাড়ের রূপ দেখিতেছি, চাঁদের রূপ দেখিতেছি, এ সবই আমার মন-গড়া কথা। আগুনে হাত দিলে যাতনা হইতেছে; এই যাতনাটা সত্য কথা; একটা স্পর্শ ও একটা রূপের একত্রযোগে একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে, ইহাও প্রকৃত কথা। কিন্তু সেই যাতনার কারণ স্বরূপে, সেই স্পর্শের, সেই রূপের, সেই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে, আমা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব, বুঝিতে পারি না। যখন আমার ঐ বিশেষ রূপের অনুভব হয়, তার সঙ্গেই ঐ স্পর্শেরও অনুভব ঘটে; এবং স্পর্শ ও রূপ যখন একত্র প্রতীয়মান হয়, তখন ঐ প্রতীতিকে আমি অগ্নি আখ্যা দিয়া থাকি। এমন কি, যখনই অগ্নিনামক প্রতীতির সহিত আমার হস্ত

নামক আর একটা প্রতীতির স্পর্শ সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তখন একটা উৎকট যাতনাও প্রতীত হয়। এই কয়েকটা প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কেন ঘটিল তাহা না জানিতে পারি ; কিন্তু এই অন্যোন্যসম্বন্ধনিবদ্ধ প্রত্যয়-গুলি ছাড়িয়া আর কি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিল, তাহা কোন মতেই বুঝি না।

আসল কথা এই। সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুইটা অনির্ব্বাচ্য কাল্পনিক প্রত্যয় বিশালকায় বিস্তার করিয়া আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্বও এমন কি শক্তির, অস্তিত্ব, উড়াইয়া দিতে পারি ; কিন্তু এই দেশ ও কাল কি একটা বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখে। আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমার পূর্ব্বে ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, আমার আত্মাকে অবসন্ন করিয়া, কি এক বিভীষিকা দেখায়। আমি বুঝিতে পারি না, আমারই সৃষ্ট বিভীষিকা দর্শনে আমি আকুল হইতেছি ; আমারই মনঃকল্পিত পিশাচ-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে ভয় দেখাইতেছে। একখানা দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের সম্মুখস্থ সমগ্র প্রদেশ তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য লইয়া দর্পণের পৃষ্ঠভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই সেই ছায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমার চিত্তভ্রান্তিমাত্র, তাহা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় না ; কিন্তু আমার দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যে দেশ বর্ত্তমান দেখি, উহাও যে ঐরূপ আমার মনঃকল্পিত ভ্রান্তিমাত্র, তাহা বলিতে গেলেই একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা নিমেষমধ্যে যুগব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন করিতে পারি, সেখানে সেই যুগব্যাপী কাল আমার ভ্রান্তি বলিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের জাগ্রদবস্থায় লক্ষিত কালকে মনঃকল্পিত মনে করিতে গেলেই

আমরা একেবারে শিহরিয়া উঠি। ইমানুয়েল কাণ্ট, তোমার জন্মগ্রহণ নিতান্তই নিরর্থক হইয়াছে।

বস্তুতই দেশ ও কাল আমারই কল্পনা বা আমারই সৃষ্টি। আমার প্রত্যয়গুলিকে আমি দুইটা পদ্ধতিতে সাজাইয়া থাকি, একটা সজ্জার নাম দেশ, আর একটার নাম কাল। কেন সাজাই, তাহা স্বতন্ত্র কথা, কোন না কোন রকমে না সাজাইলে আমি সে প্রত্যয়গুলির পরিচয় পাই না। সেইজন্য কোন না কোন রকমে সাজাইতে আমরা বাধ্য। আমরা দুই রকমে সাজাইয়া থাকি। আমাদের রূপরসগন্ধাদি প্রত্যয়গুলিকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; ও এইরূপে সজ্জিত করিয়া যে জগৎ নির্ম্মাণ করি, তাহার জড়জগৎ বা বাহ্যজগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। আর তদতিরিক্ত সুখদুঃখ হর্ষবিষাদাদি সমুদয় ব্যাপারকে কালে সাজাই ও তদ্দ্বারা একটা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে অন্তর্জগৎ বলিয়া থাকি। দুইটা জগৎ আমারই নির্ম্মিত, এমন কি এই দুইটা জগতের সমষ্টিকেই "আমি" সংজ্ঞা দিতে কেহ কেহ আপত্তি কিছু দেখেন না।

আমার শব্দস্পর্শাদি প্রত্যয়ের এবং সুখদুঃখাদির সমন্বয়ে "আমি" নির্ম্মিত, ইহা বলিতে গেলেই একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়। কেননা, সহজেই বোধ হয়, এই সকলের ছাড়াও আমার অন্তর্গত আর একটা পদার্থ আছে, তাহার যেন এখনও হিসাব লওয়া হয় নাই। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই, এ সব সত্য; কিন্তু ইহা যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি জানি আমি দেখি, আমি জানি আমি শুনি, আমি জানি আমি চিন্তা করি, এইরূপ বলিলে সত্যটা যেন কতক সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট শ্রবণ, দর্শন, চিন্তয়ন প্রভৃতি ব্যাপারের অন্তস্তলে যেন কে একজন অবস্থান করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছে ও সেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির

বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিয়া বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। এই কি একটা কিছুর ইংরাজি নাম consciousness বা চেতনা। বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্যের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেখাইয়াছেন, ইহার বেদান্তসম্মত নাম সংবিৎ। সংবিৎ যেন ভিতরে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিতেছে; এই অন্তর্বর্ত্তী সংবিৎ না থাকিলে এই সম্বন্ধবন্ধন, এই একতাবন্ধন যেন ঘটিত না। আমি দেখি ও আমি শুনি, উভয় ব্যাপার পরস্পর অসম্বদ্ধ। যে আমি দেখিয়া থাকি ও যে আমি শুনিয়া থাকি উভয় "আমি"র মধ্যে ঐক্যসম্পাদন সংবিদের কার্য্য। আমি করি, আমি খাই, আমি হাসি, আমি নাচি, আমি গাই; আমি দেখি, আমি শুনি; এবং আমার দেখিবার জন্য ও শুনিবার জন্য এই দৃষ্টির বিষয় ও শ্রুতির বিষয় এই জড় জগতের কল্পনা করি; আমার হাসিবার গাহিবার নাচিবার জন্য এই বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র নির্ম্মাণ করি; এবং আমিই আবার অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া আমার এই হাসিকান্না, নাচগান, দেখাশুনা, আমি প্রত্যক্ষ করি। আমিই ভিতর হইতে দেখি, আমি ইহা করিতেছি, আমি ইহা দেখিতেছি। আমিই দেখি আমাকে; আমার প্রত্যক্ষ আমি। অদ্ভুত কথা; কিন্তু সত্য কথা। আমিই জ্ঞাতা ও আমিই আমার জ্ঞেয়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "সার সত্যের আলোচনার" মধ্যে এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, এতদুভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও উভয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া দর্শনশাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, সত্য কথা; ইহাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যে আমি দেখিলাম ও যে আমি শুনিলাম, সে যে একই আমি, তাহা উপলব্ধির জন্য যে আর এক আমি আড়ালের ভিতর অবস্থিত, তাহা সকলে স্বীকার

করিতে চাহেন না। অন্ততঃ হিউম চাহেন না; হক্স্‌লী চাহেন না; ভগবান্‌ বুদ্ধ সিদ্ধার্থও চাহিতেন না। অথচ এই জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমিকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার লীলাখেলা, তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায়ও সহজে দেখা যায় না। এই জ্ঞাতা আমি যেন স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং প্রকাশ; মাসাব্দ যুগকল্প অনেকধা গিয়াছে ও আসিবে; দেশকালের অতীত এই জ্ঞাতা আমি বসিয়া বসিয়া সেই দেশব্যাপী ও কালব্যাপী জ্ঞেয় আমার মাসাব্দযুগকল্প-ব্যাপী কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। যে আমি লীলাপর, ক্রীড়াপর, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করে, সে সোপাধিক, সে জ্ঞেয়; যে বসিয়া বসিয়া সেই লীলারচনা, সেই ক্রীড়াকল্পনা দেখে, সে জ্ঞাতা; তাহাকে কি উপাধিতে কি বিশেষণে বিশিষ্ট করিব তাহা আমি জানি না; কাজেই বলি সে নির্গুণ, সে নিরুপাধিক। অথচ দুই আমিই এক; দুই আমি অভিন্ন; যে দেখে ও যাহাকে দেখে, দুইই এক। ব্যবহারে দ্বয়—পরমার্থতঃ অদ্বয়। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব—অপরের নাম ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীবাত্মা—জ্ঞাতা আমি পরমাত্মা। ব্যবহারে দুই; কিন্তু বস্তুতঃ এক। ব্রহ্মই জীব—জীবই ব্রহ্ম—কেন না আমিই আমাকে দেখি। আমিই সেই—সোঽহম্‌।

এই খানেই নিরস্ত হওয়া উচিত; কিন্তু এখানেও মন মানে না। জিজ্ঞাসা হয়, কেন এমন? আমি আমাকে কেন এমন দেখি? কেন আমি আমাকে উপাধিযুক্ত করিয়া দেখি; কেন আমি আমাকে লীলাপর, ক্রীড়াপর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হর্ত্তা বিধাতা দেখি। কেন এখানে নীল, কেন ওখানে পীত? কেন চন্দ্র, কেন সূর্য্য? কেন আলো, কেন আঁধার? কেন সামান্য, কেন ভেদ? কেন চিৎ, কেন জড়? কেন দেশ, কেন কাল? কেন আকর্ষণ, কেন বিকর্ষণ? এইরূপ প্রশ্ন উঠে; কিন্তু এমন প্রশ্ন উঠে না, যে যদি এই নীল পীত, আলো

আঁধার, চন্দ্র সূর্য্য, চিৎ জড় না থাকিত, তাহা হইলে থাকিত কি ? তাহা হইলে চৈতন্যই বা কোথায় থাকিত ; সংবিৎই বা কোথায় থাকিত, আমিই বা কোথা থাকিতাম ? এ সকল আছে, সেই আমি আছি ; অথবা আমি আছি, সেই এ সকল আছে।

ঐ প্রশ্ন বোধ করি উঠিতেই পারে না—ঐ প্রশ্ন বোধ করি অর্থশূন্য। তথাপি প্রশ্ন উঠে ; প্রশ্নের উত্তর দিবারও চেষ্টা হয়। যে প্রশ্ন অর্থশূন্য, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টার নাম ফাঁকি—মনভুলান ফাঁকি। বৈষ্ণবের ভাষায় উত্তর হয়, এ আমার লীলা। আমি লীলাময়—আমি এইরূপে খেলা করি ; ইহা আমার খেয়াল। এই লীলাময়ত্বই আমার স্বরূপ ; কেন ? না, ইহাতেই আমার আনন্দ—আমি আনন্দময়। আমি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ; আমি এই লীলারচিত আনন্দ জগতের, এই গোলোকের, নির্ম্মাণ করিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপ জীবের সহিত, মদ্ভক্তা মন্ময়া গোপীর সহিত, মহারাসোৎসবে মগ্ন থাকি। ইহা আমার লীলা—ইহাতেই আমার আনন্দ, ইহাতেই আমার পরম প্রীতি। বৈদান্তিক ঘুরাইয়া বলেন, ইহা আমার মায়া ভেলকি কুহক ইন্দ্রজাল ; আমি ঐন্দ্রজালিক জাদুগির ; আমি মায়া রচনা করিয়া নিরুপাধিককে সোপাধিক করিয়াছি। যাহা এই জগতের সৃষ্টি ও আরম্ভ ঘটায়, তাহা অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান ; মায়ার অর্থ খেয়াল, ভ্রান্তি, ভেলকি। মূলে নির্গুণ নির্ব্বিকার সৎপদার্থ ; মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করে, অবিদ্যা তাহাকে আচ্ছাদন করে ; ফলে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হয় ; আপনাকে আপনি পৃথক করিয়া গুণমণ্ডিত, অলঙ্কৃত, উপাধিযুক্ত, বিবিধবিভূতিবিশিষ্ট দেখিতে পায়। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী আগষ্টিকের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, কেন এমন হয় জানি না ; এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। মায়া অর্থে যদি ভ্রান্তি বলা যায়, তাহা হইলেও সেই একই উত্তর দাঁড়ায়। যাহা

দেখিতেছ, তাহা ভ্রান্তি, প্রকৃত কি তাহা জানি না। মায়া অর্থে খেয়াল বুঝ, তাহা হইলেও অধিক স্পষ্ট হয় না, খেয়াল অর্থাৎ যাহার হিসাব নাই, যাহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই, যাহা গণনার, হিসাবের, কার্য্যকারণসম্বন্ধের বাহিরে। খেয়াল? কাহার খেয়াল? মায়া? কাহার মায়া? আত্মার। আত্মা আপনাতে মানুষ ধর্ম্ম, জীবধর্ম্ম অর্পণ করে। আত্মা অর্থে আমি; আত্মার মায়া অর্থে আমার খেয়াল, তদ্রচিত ইন্দ্রজাল ভেল্‌কি! নির্গুণ অথচ সগুণ, অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞানগোচর; কেন না অক্লেশে বলিতেছি, ইহা মায়া, ইহা খেয়াল, ইহা ইন্দ্রজাল!

আমি ব্রহ্ম—আমি মায়াবশে আমাকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেছি—জীব অবিদ্যাবশে আপনাকে সোপাধিক দেখিতেছে; মনে করিতেছে; আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি হাসিতেছি, আমি নাচিতেছি, মনে করিতেছে, আমার জন্ম আছে, আমার মরণ আছে, আমি জগতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি; উহা নীল, উহা পীত; উহা চন্দ্র, উহা সূর্য্য; ঐ দেশ, ঐ কাল; উহা ধর্ম্ম, উহা অধর্ম্ম; উহা নশ্বর, উহা অনশ্বর; আমি নশ্বর, আমি সাদি, জগৎ অনশ্বর, জগৎ অনাদি; আমি অসীম দেশে সান্ত, অনাদি কালপ্রবাহে সাদি। কিন্তু উহা অবিদ্যা—ভ্রম। আমার মায়াবশে আমি অবিদ্যাগ্রস্ত—আমার পক্ষে, ব্রহ্মের পক্ষে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞাতার পক্ষে উহা মায়া; আমার পক্ষে, জীবের পক্ষে, পরপ্রকাশ জ্ঞেয়ের পক্ষে উহা অবিদ্যা। এক পক্ষে মায়া বা ইন্দ্রজাল—অন্য পক্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ইন্দ্রজালও সত্য নহে—অজ্ঞানও সত্য নহে। মায়া মিথ্যা ইন্দ্রজাল—অবিদ্যা ভ্রান্ত অজ্ঞান। আমি মায়াবশে আমাকে সোপাধিক কল্পনা করি—কিন্তু এই উপাধি কল্পনাই আমার মায়া—উহা মিথ্যা; আমি নিরুপাধিক। জীব অবিদ্যাবশেই আপনাকে

ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ দেখে, উহা তাহার অবিদ্যা। জীবও ক্ষুদ্র নহে, সঙ্কীর্ণ নহে। আমিই আমি—যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞেয়—দুইই এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সেই আমি কে? বলিতে পারি না। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য সেখান হইতে ফিরিয়া আসে, মনও ফিরিয়া আসে—বলিব কিরূপে, বুঝাইব কিরূপে? নিতান্ত বলিতে হয়, বলিতেছি;—আমি সৎ—আমি আছি; আমি চিৎ—আমি চৈতন্য-স্বরূপ; আর—আর—নিতান্ত না ছাড়—আমি আনন্দ—আমি আনন্দ-স্বরূপ—আমি আছি, এই আমার আনন্দ।

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটন একদিন আতাফল ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে। অমনি মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এবং তদবধি আতাফল কেন পড়ে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রত্যেক পাঠশালার বালকে উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্ষণই উহার কারণ।

গল্পটা কত দূর সত্য, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গল্পটা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আতাফল যে কেন ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও আর সন্দেহ নাই।

মানুষের মন সর্ব্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চায়; এবং শুনা যায়, এই জন্যেই জীবসমাজে মনুষ্যের স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই কারণ-অনুসন্ধানস্পৃহাটা যদি এত সহজে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহা

হইলে বলিতে হইবে, জীবসমাজের [illegible]ভাগ কার্যটার এখনও পুনঃসংস্করণ আবশ্যক; মনুষ্যকে অত উচ্চে [illegible]লে চলিবে না।

নিউটনের বহুপূর্বে ভাস্করাচার্য অথবা [illegible] কোন পণ্ডিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা সগর্বে সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ আওড়ান, তাঁহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, নিউটন, পৃথিবীর কেন, কোন পদার্থেরই, আকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব নূতন আবিষ্কার করেন নাই। নিউটনের বহুপূর্বে এই আকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে জম্বুক আঙ্গুরের প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেও জানিত যে আঙ্গুর ফল পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। অপিচ, লেখকের এই উক্তিতে নিউটনের ও ভাস্করের মাহাত্ম্যময় যশোরাশির কণিকামাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই!

কিন্তু প্রকৃত কথা এই, আতাফল যে কি কারণে ভূপতিত হয়, এ পর্যন্ত তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে; এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণ যত দিন স্বাস্থ্য হইতে বিকৃত বা বঞ্চিত না হইবে, তত দিন সেই কারণ বাহির হইবার কোন আশা নাই।

নিউটন আতাফলের ভূপতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে তিনি যে একটা প্রকাণ্ডকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছিলেন, সেটার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত।

আতাফল যে বৃন্তচ্যুত হইলেই পৃথিবীর দিকে দৌড়ায়, ইহা নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন, মনুষ্য হইতে কীট পর্যন্ত সকলেই তাহা চিরকাল ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে আতার প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, অথবা পৃথিবীর প্রতি আতার অনুরাগ আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না।

ফলে বৃন্তচ্যুত আতাফল আপন প্রেমভরেই হউক বা মেদিনীর আকর্ষণবশেই হউক, চিরকালই মেদিনীর প্রতি ধাইতেছে।

এবং শুধু আতাফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকর্ষণরজ্জুতে বাঁধা রহিয়া পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহাও নিউ-টনের অতি পূর্ব্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে।

এইখানে আকর্ষণের কথা ও অনুরাগের কথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নীরস জ্যোতিষের কথায় অবতরণ করিতে হইল, তজ্জন্য পাঠকের নিকট পূর্ব্বেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে কতিপয় ব্যক্তি দেখিয়া আসিতেছিলেন যে, শুধু চাঁদ কেন, আরও কতিপয় জ্যোতিষ্ক বিনা কারণে পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অকারণে ভ্রমণশীল এই জ্যোতিষ্কগুলার সাধারণ আখ্যা গ্রহ। রবি শশী উভয়কে ধরিয়া এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বহুদিন হইতে মনুষ্যের নিকট বিদিত ছিল।

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই-তেছে; হয় ত এইরূপ নির্দ্দেশ ঠিক্ উচিত হইল না। গ্রহগণের এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পঁয়ত্রিশটি বিবাহ করিতে বাধ্য, ইহা অনেক পণ্ডিত অদ্যাপি অকুতোভয়ে বলিয়া থাকেন। গ্রহগণের অবস্থান মনুষ্যের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে; ইহাতে যে সন্দেহ করে, সে নির্ব্বোধ; কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে? আর ঐরূপ একটা 'বিরাট' উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গ্রহগুলা ঐরূপে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু দেখা যায়, উহাদের পরিভ্রমণের রাস্তা বড়ই আঁকাবাঁকা। প্রাচীনেরা অনেক চেষ্টাতেও সেই রাস্তার

জটিলতার অন্ত পান নাই। গ্রহগণের মধ্যে চন্দ্র আর সূর্য্য কতকটা সহজ নিয়মে চলিয়া বেড়ান। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ কখন কোথায় থাকেন, তাহার গণনা দুষ্কর। উঁহারা কখন ধীরে চলেন, কখন দ্রুত চলেন, কখন আবার চলিতে চলিতে পিছু হাঁটেন। যেখানে ঘুরিয়া না বেড়াইলে নিস্তার নাই, সেখানে আবার এত লুকোচুরি খেলা কেন?

হঠাৎ কোপর্নিকস বলিলেন, কি তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম! উহাদের গতির নিয়মে এত যে জটিলতা দেখিতেছ, সে তোমাদেরই দৃষ্টির দোষে। একবার মনোরথে চাপিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলে দাঁড়াও; দেখ কেমন সুন্দর সুশৃঙ্খলায় উহারা ধীরভাবে ও সুনিয়তভাবে সূর্য্যমণ্ডলেরই চারি দিকে ঘুরিতেছে। আর তোমার পৃথিবী, সেও স্থির নহে, সেও অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যেরই চারি দিকে ভ্রমণশীল। আর চন্দ্র, একা তিনিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন।

বস্তুতঃ, সূর্য্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না; পৃথিবীই সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে; এবং অন্য গ্রহেরাও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না, তাহারাও সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের ভ্রমণপথে বিশেষ কোন জটিলতা নাই; তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিয়ম নাই। তাহারা কলুর চোখঢাকা বলদের মত অপার গাম্ভীর্য্যের সহিত চক্রপথে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই মুখে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তুমি যদি সূর্য্যমণ্ডলের অধিবাসী হইতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, উহাদের গতি কেমন সুনিয়ত। যে কেন্দ্রের চারিদিকে উহাদের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেন্দ্র ছাড়িয়া দূরে পৃথিবীতে রহিয়াছ, ও স্বয়ং পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছ, তাই তোমার বোধ হইতেছে, উহাদের রাস্তা এত আঁকাবাঁকা, উহাদের গতি এমন অসংযত।

কোপর্নিকসের কথাটা সকলেই দুই চারি বার মাথা নাড়িয়া অবশেষে মানিয়া লইল। ধার্য্য হইল, সূর্য্যই স্থির, আর পৃথিবীই অস্থির;

সূর্য্য গ্রহ নহে; পৃথিবীই গ্রহ। কেন না এখন হইতে স্থির হইল যে যাঁহারা সূর্য্য প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারাই গ্রহ।

কোপর্নিকসের পর কেপলার। কেপলার দেখাইলেন, গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহাদের চলিবার পথ প্রায় বৃত্তাকার বটে, কিন্তু ঠিক্ বৃত্তাকার নহে। একটা গোলাকার আঙটিকে দুই পাশ হইতে চাপ দিলে যেমন হয়, পথ কতকটা সেইরূপ। এইরূপ পথকে জ্যামিতিশাস্ত্রে বৃত্তাভাস বলিয়া থাকে। সূর্য্য সেই প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বৃত্তাভাসপথের, ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত না থাকিয়া একটু পাশে অবস্থিত আছে। বৃত্তাভাস পথের যাহাকে অধিশ্রয় বলে, সূর্য্যের অধিষ্ঠান সেইখানে। এই জন্য প্রত্যেক গ্রহ কখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, কখন বা একটু দূরে যায়। এই আমাদের পৃথিবীই শীতকালে সূর্য্যের একটু নিকটে আসে, আর গ্রীষ্মকালে একটু দূরে যায়। শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়া পাঠক চমকিয়া উঠিবেন না; তাহাই ঠিক্। আর একটা কথা; কোন গ্রহ যখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর যখন একটু দূরে থাকে, তখন ঠিক্ সেই অনুপাতে একটু ধীরে চলে। কেপলার প্রত্যেক গ্রহের সম্বন্ধে কেবল এই কয়টা নূতন কথা বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি আরও একটা নূতন ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের সহিত উহাদের ভ্রমণকালের একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রহগণ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু আগে হইতে যেন একটা পরামর্শ আঁটিয়া ঘুরিতেছে। যে যত দূরে আছে, তাহাকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতে তত অধিক সময় লাগিতেছে; কত দূরে থাকিলে কত সময় লাগিবে, সে বিষয়েও একটা যেন নিয়ম পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। নিয়মটা এই। মনে কর, দুইটা গ্রহ ক আর খ;

খ'র দূরত্ব ক'র চারি গুণ। এখন চারিকে ত্রিঘাত করিলে চারি চারি ষোল ও চারি ষোলতে চৌষট্টি হয়। আর চৌষট্টির বর্গ-মূল হয় আট। এখন ক যদি ঘুরে এক বৎসরে, খ'কে ঘুরিতে হইবে আট বৎসরে। তেমনি যদি গ-এর দূরত্ব হয় নয় গুণ, তাহা হইলে ৯×৯×৯=৭২৯; আর ৭২৯ এর বর্গ-মূল ২৭; তাহা হইলে ক যদি ঘুরেন এক বৎসরে, তাহা হইলে গ, যিনি নয় গুণ দূরে আছেন, তাঁহাকে ঘুরিতে হইবে ২৭ বৎসরে। বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত ছয়টা গ্রহ এইরূপে যেন পরামর্শ করিয়া আপন আপন বিহিত সময়ে আপন আপন পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে।

কেপলার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে এই কয়টা নিয়ম আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক গ্রহই বৃত্তাভাস পথে চলিতেছে, এবং সূর্য্য হইতে দূরত্বভেদে কখন বা একটু দ্রুত, কখন বা একটু মন্দ গতিতে চলিতেছে। আর বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়াও আপন আপন দূরত্বের হিসাবে ভ্রমণকালের একটা নিয়ম স্থির করিয়া, সেই হিসাবে যথাকালে চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত হইল সত্য ঘটনা। ইহার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কেন না, সত্য বটে কি না, কিছু দিন ধরিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলেই বুঝিতে পারিবে। আতাফল বৃন্তচ্যুত হইলেই মাটিতে পড়ে, ইহা যেমন সত্য ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইহাও সেইরূপ সত্য ঘটনা।

কিন্তু উহারা ঐরূপে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। ঘুরিয়া বেড়ায় সে ত দেখিতেছি; কিন্তু কেন বেড়ায়?

গ্রহগুলার কি এত মাথা ব্যথা যে, সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেই হইবে?

আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই রাস্তাটা এমন কেন? আর বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু

দ্রুত যাইতে হইবে, দূরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে, ইহার অর্থ কি ?

আবার এতগুলি গ্রহ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, অথচ ভ্রমণকালের এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া লইয়াছে কেন ?

কেপলার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন নহে। উত্তর কতকটা এইরূপ ;—উহারা ঘুরে—উহাদের মরজি ; উহারা বড়লোক ও ভাললোক, উহারা কি আর অসংযত ভাবেঅনিয়মে ঘুরিতে পারে ? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন ; দেবতারা কি একটা মতলব আঁটিয়া ঐরূপ খেলা খেলিতেছেন। সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহগণ আপন পথে বিচরণ করে জানিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা কেপলারের উত্তরে হাসিলে অন্যায় হইবে।

কেপলারের পর দেকার্ত্তে। তিনি বলিলেন, সূর্য্যমণ্ডলকে ঘেরিয়া ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটা নিরন্তর ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা সেই ঝড়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। এই ঝড় যত দিন না থামিবে, উহাদিগকে ততদিন এইরূপে ঘুরিতে হইবে !

দেকার্ত্তের পর নিউটন। নিউটন কেপলার প্রদর্শিত গ্রহগণের গতির নিয়ম আলোচনা করিলেন। দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহ নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে। আরও দেখিলেন, যার দূরত্ব যত অধিক, তার ভ্রমণের কালও তত অধিক-দিন-ব্যাপী। দেখিলেন, এই দূরত্ব ও এই ভ্রমণকালের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিউটন সেই সমুদয় আলোচনা করিয়া গ্রহগণের গতির নিয়ম গুলি একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে ফেলিলেন। সূত্রটির আকার অতি সংক্ষিপ্ত ; কেপলারের আবিষ্কৃত সমুদয় নিয়মগুলি সেই সংক্ষিপ্তসূত্রের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। সেই সূত্রটির একটু আলোচনা করা যাউক।

সূত্রটি এই। প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সূর্য্যের অভিমুখে একটা আক-

র্ষণবল রহিয়াছে; যে গ্রহের দূরত্ব যত অধিক, এই আকর্ষণবলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত কম।

এই সূত্রে একটা নূতন শব্দ রহিয়াছে,—আকর্ষণবল। আকর্ষণ শব্দটার বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। বল শব্দটার তাৎপর্য্য হৃদ্গত করা একটু কঠিন।

বল কাহাকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শব্দ। যাহাতে গতি উৎপাদন করে, তাহাই বল। একবার দেখিয়াছিলাম, কোন পণ্ডিত গম্ভীরভাবে তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, ক্রোধে হস্তপদাদির গতি উৎপন্ন হয়, অতএব ক্রোধ একটা বল। নিউটনের প্রেতাত্মা তাঁহার পরিভাষার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন, বলিতে পারি না।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা আবশ্যক। কিন্তু ভাষার দোষে ভাব কেমন বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের সংজ্ঞার দুর্গতি দেখিলে কতক বুঝা যাইতে পারে। নিউটনের ভাষায় গতি উৎপাদন বলের কাজ; বল গতি জন্মায়। গতি জন্মায় ইহার অর্থ কি? মনে কর একখানা ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল, চলিতে লাগিল। উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উহার বেগ বাড়িতে লাগিল; ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রথম মিনিটে চলিয়াছিল আধ পোয়া, তার পর মিনিটে চলিল এক পোয়া; উহার বেগ বাড়িল; এখানেও বলিব উহার গতি জন্মিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পূরা দমে ঘণ্টায় ষাটি মাইল বেগে চলিতেছে, তখন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন খুব বেশী, কিন্তু বেগ আর বাড়িতেছে না; গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। এখন উহা মিনিটে এক মাইল চলিতেছে; এ মিনিটেও এক মাইল, আবার পর মিনিটেও এক মাইল; বেগ খুব বেশী বটে, কিন্তু সে বেগ আর বাড়িতেছে না, কাজেই এখন গতি আর নূতন করিয়া উৎপন্ন

হইতেছে না। নিউটনের ভাষায় বলিতে হইবে, যতক্ষণ বেগ বাড়িতেছিল, ততক্ষণ গতি উৎপন্ন হইতেছিল, ততক্ষণ বল ছিল। যখন আর বেগ বাড়ে না; তখন আর গতি জন্মে না; তখন আর বল থাকে না। বলের কাজ গতি উৎপাদন; বলের কাজ বেগ বাড়ান।

আবার ট্রেণখানা যখন সোজা রাস্তা ছাড়িয়া, সরল রেখা ছাড়িয়া, বাঁকা রাস্তায় কুটিল রেখায় চলে, তখনও উহাতে নিউটনের ভাষায় গতি জন্মায়। গতি ছিল এক মুখে, অন্য মুখে নূতন গতি জন্মাইয়া গতির মুখ বদলাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও নিউটনের ভাষায় বলা হয়, বলের কাজ গতি উৎপাদন; এখানে গতি জন্মিতেছে, অতএব বল আছে।

যাঁহারা পদার্থবিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আস্বাদ বুঝেন নাই, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, গতি উৎপাদনের কারণ বল। গতি উৎপাদন কার্য্য, বল তাহার কারণ। গতি উৎপন্ন হয় কেন? বল আছে বলিয়া। বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হইত না।

কথাটা এক হিসাবে ঠিক্, অন্য হিসাবে ঠিক্ নহে। বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হয় না; বলই গতি জন্মায়। ইহা ঠিক্ কথা। কেননা, নিউটন বলিয়াছেন, যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে, সেই খানেই বলিবে বল আছে। যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেই খানেই বলিবে, বল নাই। কাজেই ইহা ঠিক্ কথা।

ঠিক্ কথা বটে; কিন্তু তথাপি গতির উৎপাদনের কারণ বল এরূপ বলিলে ভুল হয়। গতি উৎপাদনের কারণ কি জানি না। কারণ যাহাই হউক, বল তাহার কারণ নহে। কেন বুঝাইতেছি।

ঐ জন্তুটার চারি পা ও উহা হাম্বা স্বরে ডাকিতেছে। উহার সর্ব্ববাদিসম্মত নাম গরু।

এখন জিজ্ঞাস্য, উহা গরু, এই জন্য উহা হাম্বা ডাকে? না হাম্বা

ডাকে বলিয়াই উহা গরু ? কোন্ প্রশ্নটা ঠিক্ ? হাম্বাধ্বনির কারণ উহার গোত্ব, না গোত্বের কারণ হাম্বা ধ্বনি ?

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেড়াই বল, নামে কিছুই যায় আসে না ; ও হাম্বা ডাক কিছুতেই ছাড়িবে না। উহাকে ঐরাবত নাম দিলেও হাম্বা ছাড়িয়া বৃংহিত ধ্বনি করিবে না। উহার হাম্বা ডাকই স্বভাব, উহা হাম্বাই ডাকিবে—অকাতরে ডাকিবে।

তবে যে চতুষ্পদ হাম্বা ডাকে, তাহাকে আমরা ভেড়া না বলিয়া গরু বলি ; ঐরাবত না বলিয়া সুরভি বলি। যে হাম্বা ডাকে সে গরু ; ও হাম্বা ডাকে, অতএব ও গরু ; ইহা বলাই ঠিক। হাম্বা ধ্বনির কারণ গোত্ব নহে ; গোত্বের কারণ হাম্বা ধ্বনি।

ঠিক্ এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে ; বলের বিদ্যমানতার কারণ গতির উৎপত্তি। বল আছে, অতএব গতি জন্মিতেছে বলা সঙ্গত নহে। গতি জন্মিতেছে, দেখিলেই বলিব বল আছে, ইহাই সঙ্গত। গতি উৎপাদনের নামান্তর বলের প্রয়োগ।

বৃন্তচ্যুত আতাফলে পৃথিবীর মুখে গতি উৎপন্ন হয়। কেন হয় ? পণ্ডিত অপণ্ডিত সমস্বরে বলেন পৃথিবী বল প্রয়োগ করে ; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল আছে, এই জন্য উহা গতি পায়। আমরা বলি উত্তরটা ঠিক্ হইল না। উহার ভূপতনের, ভূমি মুখে গতি উৎপাদনের কারণ মাধ্যাকর্ষণ নহে। উহা কেন পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা জানি না। গরুর যেমন হাম্বা ধ্বনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই স্বভাব। পতনকালে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি উহা মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূপতিত হইতেছে, উহা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

গ্রহ সূর্য্যকে ঘুরে কেন ? সূর্য্য-মুখে বল রহিয়াছে, এই জন্য কি ? না, তাহা নহে। বল রহিয়াছে, এই জন্য ঘুরে না ; ঘুরে তাই দেখিয়া

আমরা বলি, বল রহিয়াছে। একটা কথাই দুই রকম ভাষাতে ব্যক্ত করি।

হরিচরণ ভাত খাইতেছেন, অথবা অন্নের পিণ্ড গলাধঃকরণ করিতেছেন। গলাধঃকরণের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার কারণ কি গলাধঃকরণ? এ প্রশ্ন উপহাস্য। সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্যকে ঘুরিতেছে; সূর্য্যমুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বা আকর্ষণ আছে। ঘুরিবার কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরিয়া বেড়ান? এ প্রশ্নও ঠিক্ সেইরূপ। একটা ঘটনা দুই রকম ভাষায় বর্ণিত হইতেছে; একটা ভাষা সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রচলিত ভাষা; আর একটা ভাষা পণ্ডিতের ভাষা, সঙ্কেতের ভাষা, সংক্ষিপ্ত ভাষা; এই পর্য্যন্ত তফাত।

পৃথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল না। কেন ঘুরে, জানি না; দেখিতেছি ঘুরিতেছে; ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি, বল আছে; সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ও সূর্য্যের মুখে বল আছে। ঘুরিতেছে কেন, বল রহিয়াছে কেন, জানি না।

কেপলার দেখিয়াছিলেন, বুধ, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতি সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। নিয়মটা কেপলার সহজ ভাষায়; সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। নিউটন সেই কেপলারেরই নিয়ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, পণ্ডিতের বোধ্য ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

নিয়মটা কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের একটা বাঁধা সম্বন্ধ আছে। যে সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সকলেরই ভ্রমণপক্ষে সেই নিয়ম। কেপলার সেই নিয়ম দেখিয়াছিলেন; নিউটনও তাহাই ভিন্ন ভাষায় সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নিউটন আর একটু অধিক দেখিয়াছিলেন। কেপলার তাহা

দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগণে সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে; আবার চন্দ্রেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আতাফল ভূপতিত হয়; বৃন্তচ্যুত হইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উহা ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়; সুতরাং আতাফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। নিউটন কেপলার অপেক্ষা একটু অধিক দেখিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন, গ্রহগণ যে বাঁধা নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক্ সেই নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে. আর ঠিক্ সেই নিয়মে আতাফলও পৃথিবীর দিকে ধায়, বা যায়, বা চলে, বা আকৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই এক নিয়ম। নিয়মটা দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্বন্ধ লইয়া; এই সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই এক। কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে নিয়ম, যে সম্বন্ধ, দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আতাফলের গতিতেও সেই নিয়ম, সেই সম্বন্ধ, দেখিতে পান। এইটা নিউটনের বাহাদুরি।

নিউটন দেখিলেন, এতগুলা জড়দ্রব্যের গতিতে, গ্রহগণের সূর্য্য-মুখ গতিতে, চন্দ্রের ও আতাফলের পৃথিবীমুখ গতিতে, একই নিয়ম, দেশ-কালগত একই সম্বন্ধ বর্ত্তমান নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া বলিলেন, তবে জড়জগতের সর্ব্বত্র জড়দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। নিউটনের অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার, সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিণ্ডকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; সৌর জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থমাত্রই গতিবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে, কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, এই সকল গতি অসংযত,

অনিয়ত বোধ হইত। কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে বলিয়া দিলে, কাল বা দুই শত বৎসর পরে তাহা কখন কোন্ স্থানে থাকিবে, অব্যর্থসন্ধানে গণিয়া থাকি।

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, উপগ্রহগণ ও আতাফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে, তাই আতাফল গতিবিশিষ্ট হয়; সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী সূর্য্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয়;—বলিলে চোখে ধূলা দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ; ইহা প্রতারণা। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, ইহা সেইরূপ প্রতারণা। আতাফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে পার, পৃথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে বা আতাফলকে টানে। আকর্ষণের স্থলে অনুরাগ শব্দ বসাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আরও সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছু হয় না। আতাফল পড়ে, এই শাদা কথার যে অর্থ, পৃথিবী আতাকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট সেই অর্থ। আতাফল কেন পড়ে, তাহা জানি না। জানিবার উপায় আছে কি? পৃথিবী আতাফলকে কোন অদৃশ্য রজ্জুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্তু জানি না।

নিউটন সৌর জগতের অন্তর্ভূত দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে একটা বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায়

দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগণে সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে; আবার চন্দ্রেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আতাফল ভূপতিত হয়; বৃন্তচ্যুত হইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উহা ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়; সুতরাং আতাফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। নিউটন কেপলার অপেক্ষা একটু অধিক দেখিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন, গ্রহগণ যে বাঁধা নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক্ সেই নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে. আর ঠিক্ সেই নিয়মে আতাফলও পৃথিবীর দিকে ধায়, বা যায়, বা চলে, বা আকৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই এক নিয়ম। নিয়মটা দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্বন্ধ লইয়া; এই সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই এক। কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে নিয়ম, যে সম্বন্ধ, দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আতাফলের গতিতেও সেই নিয়ম, সেই সম্বন্ধ, দেখিতে পান। এইটা নিউটনের বাহাদুরি।

নিউটন দেখিলেন, এতগুলা জড়দ্রব্যের গতিতে, গ্রহগণের সূর্য্য-মুখ গতিতে, চন্দ্রের ও আতাফলের পৃথিবীমুখ গতিতে, একই নিয়ম, দেশকালগত একই সম্বন্ধ বর্ত্তমান নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া বলিলেন, তবে জড়জগতের সর্ব্বত্র জড়দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। নিউটনের অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার, সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিণ্ডকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; সৌর জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থমাত্রই গতিবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে, কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, এই সকল গতি অসংযত,

অনিয়ত বোধ হইত। কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে বলিয়া দিলে, কাল বা দুই শত বৎসর পরে তাহা কখন কোন্ স্থানে থাকিবে, অব্যর্থসন্ধানে গণিয়া থাকি।

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, উপগ্রহগণ ও আতাফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে, তাই আতাফল গতিবিশিষ্ট হয়; সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী সূর্য্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয়;—বলিলে চোখে ধূলা দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ; ইহা প্রতারণা। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, ইহা সেইরূপ প্রতারণা। আতাফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে পার, পৃথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে বা আতাফলকে টানে। আকর্ষণের স্থলে অনুরাগ শব্দ বসাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আরও সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছু হয় না। আতাফল পড়ে, এই শাদা কথার যে অর্থ, পৃথিবী আতাকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট সেই অর্থ। আতাফল কেন পড়ে, তাহা জানি না। জানিবার উপায় আছে কি? পৃথিবী আতাফলকে কোন অদৃশ্য রজ্জুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্তু জানি না।

নিউটন সৌর জগতের অন্তর্ভূত দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে একটা বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায়

সংক্ষিপ্ত ভাষায় উহার বর্ণনা দিয়াছেন। একটা সংক্ষিপ্ত সূত্রের ভিতর অনেকগুলা কথা পূরিয়াছেন ; একটা বিস্তৃত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বর্ণনামাত্র ; বর্ণনার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ব্যাকরণ-কৌমুদীর দশটা সূত্র মুগ্ধবোধের একটা সূত্রের সমান ফল দেয়। উভয়ই বিভিন্ন ভাষায় একই ব্যাপারের বর্ণনা দেয়। চলিত ভাষায় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে দশ পাতা কাগজ লাগে, এই দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠককে নির্য্যাতন করিয়াও যে বর্ণনা সম্যক্‌ভাবে দিতে পারি নাই, নিউটনের ক্ষুদ্র সূত্রে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্ব্বোধের চোখে ধাঁধা লাগে, বুদ্ধিমানের মানসিক শ্রমের সংক্ষেপসাধন ঘটে। নির্ব্বোধে বলে, নিউটন আতাফল পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; বুদ্ধিমানে জানেন, নিউটন দেখাইয়াছেন, আতাফল জগতে যে নিয়মে চলে, চন্দ্র হইতে বরুণগ্রহ পর্য্যন্ত সেই নিয়মেই চলে। কেন চলে, নিউটন জানিতেন না, আমরাও জানি না। নিয়ম আছে, ভাল। নিয়ম না থাকিত, হয় ত আরও ভাল হইত। অন্ততঃ এই দুর্ব্বহ মানবদেহধারণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।

নিয়মের রাজত্ব

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যায়, উহাতে লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই ; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্বের গুণগান করিয়া এক খানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং আইন ভঙ্গ করিলে

শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে বিস্মিত হন, ভাবাবেগে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের শরীরে বিবিধ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এই নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী, নির্ব্বোধ, পাগল ইত্যাদ মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। সময়ে সময়ে উভয়পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে ? দুই একটা উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে, ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল

কেন, যে কোন বস্তু ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে পাগল; কেহ বলিবে লোকটা গাঁজা খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ননামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি বলিবেন, হইতেও পারে; তবে ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেননা, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ হেন নারিকেল—কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশূটবিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুন উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম করিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব বস্তুমাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এই ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক্ আছে, পার্থিবদ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘুদ্রব্য তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘুদ্রব্য; সে উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না। বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না, ভাসিতে থাকে; শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল!

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিল না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে ও মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু। লোহা গুরু, তার মানে—লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারদের অপেক্ষা যে লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারদ অপেক্ষা লোহা লঘু, সেজন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ?

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত

আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষাযোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন—আমেণ্ডমেণ্ট—আবশ্যক।

তখন ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইল এই রকম ঃ—

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর দ্রব্য মধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন করিয়া ছাঁটিয়া লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। এবং বাইসি বার্সা।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহমাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল। পার্থিবদ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে. সুতরাং উহার লঙ্ঘন দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। পার্থিব দ্রব্য অবস্থা বিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব বস্তুই নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে, যে কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর

বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলমধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘুগুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার ব্যভিচার নাই। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের কারণ হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজ্যটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই অপরাধ এই তরল পদার্থের ও, বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রেই তেমনই মগ্নদ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে—"ন যযৌ ন তস্থৌ।"

এখন এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন, দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই ঊর্দ্ধগামী হয়।

৩নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই এক সঙ্গে কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেননা, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বর্ত্তমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের কিছু অধিক হইল একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল ফলেই ও আতাফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন, দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্য্যন্ত পৃথিবীমুখে চলিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটা ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবীমুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেই সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও ইচ্ছা নাই; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এতদূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন।

চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এতদূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরু ভার, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘু শরীর, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশালকায় লইয়া বহুদূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখণ্ডে গ্রথিত মালা পরিয়া এই ক্ষুদ্র পার্থিব লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহুদূরে থাকিয়া এতকাল লুকাইয়াছিলে, বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম;—একটা ভয়ানক কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্বসাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌর জগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌর জগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। নক্ষত্রসমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া নক্ষত্র দেখা যায়; নক্ষত্রযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্য্য আর এক যোড়া, কতকটা তেমনি। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার প্রয়াস দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌর জগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কিনা বলা যায় না। কেন না সংবাদের অভাব। দূরের নক্ষত্রগণ আমাদের হইতে ও পরস্পর হইতে এত দূরে আছে, যে পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহা এত সামান্য ও তাহার ফল এত সামান্য যে তাহা আমাদের গননাতেও আসে না ও আমাদের প্রত্যক্ষসীমাতেও আসে না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। দূরের নক্ষত্রেরাও সম্ভবতঃ সকলেই এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি এই নিয়মের অধীন না হয়, যদি কোন একটা নক্ষত্র বা কোন একটা প্রদেশের নক্ষত্রগণ এই আইন না মানে, তাহা হইলে কি হইবে? যদি বিশ্বসাম্রাজ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, সৌর জগতের মধ্যে নিউটন যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল বিশ্ব জগতের কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব জগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন,—জগৎ নিয়মের রাজ্য। তবে নিউটনের নিয়মই যে সর্ব্বত্র চলিবে, এমন কোন কথা নাই।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম; যতদিন তাহার ব্যভিচারের উদাহরণ দেখিলাম না, বলিলাম এই নিয়ম

অখণ্ডনীয়, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি আমেণ্ডমেণ্টের ব্যবস্থা! তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম! বলিলাম, অহো, এতদিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম;—যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম;—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কিনা নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্ত্তমান, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না। এ স্থানে ত ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা সুবিধা মত হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে, অথবা মৌশুমি হাওয়া আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটাইয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। ঠিক্ উত্তরমুখে ত থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে না? একটু হেলিয়া থাকে। উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লণ্ডন সহরে ততটা হেলিয়া নাই; না থাকিবারই কথা; উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া

আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ! উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; আজ দুই শত বৎসর ধরিয়া বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত উহার স্বভাব। প্রতি এগার বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। ইহাই ত নিয়ম।

প্রকৃতিতে একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সোজা পথে বা ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিলে সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না। চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিত না। সুতরাং আলোকের সোজা রাস্তায় যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক্ সোজা পথে না গিয়া আশে পাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্মছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে পাশে চলে। এখন বলিতে হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আলোকের এইরূপ ক্ষেত্রে আশে পাশে যাওয়াই স্বভাব। বস্তুতঃ এস্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারি; কিন্তু যে কোন সময়ে একটা নূতন অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে অবলীলাক্রমে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহার মানসিক অবস্থার জন্য শোক করি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায় সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে হাঁটিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প; কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক এক যোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রাকৃতিক রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বদ্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসি-

তেছে; সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্ঠরূপী ইন্ধন-যোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোকবিজ্ঞান ও তাড়িতবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞানঘটিত কত নূতন তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্পদিনমাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শিখে, ততই জানে; যতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষসীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই উহাদিগকে জড়াইয়া একটা নূতন তথ্যের, একটা নূতন প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে জানিতে পারে, কাল কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

সে যাহাই হউক, যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে একত্র করিয়া, তাহাদের সাহচর্য্যগত ও পরম্পরাগত সম্বন্ধ যাহা প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে, তাহাই নিরূপণ করিয়া, যখন প্রাকৃতিক নিয়মের সৃষ্টি, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই আজগুবি বোধ হউক না, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা কথা কি? আর নিয়মের শাসনে জগৎযন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন অতি প্রাকৃত শাস্তার, একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়?

অমঙ্গলের সৃষ্টি

একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের বড় বড় জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর বড় অত্যাচার করিয়া থাকেন, সেইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয়, প্রবল দুর্ভিক্ষে গরিব লোকের নিতান্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহুলোকের ঘরবাড়ীর নির্ম্মাণ উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

এক শরে দুইটি শীকার সচরাচর সম্ভব হয় না। একটিমাত্র ঘটনা দ্বারা এত প্রকাণ্ড দুইটা উদ্দেশ্যের যুগপৎ সাধন কেবল বিশ্ববিধাতার পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু কূটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক জমিদার অত্যাচারী ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা বেশ সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তিটা, যাহার সুশীলতায় এ পর্য্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথাটা চেপটা করিয়া দিয়া তাহার অবীরা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল?

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি না হয় কায়মনোবাক্যে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর চরিত্রের কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাক, তার বাপের দোষ ছিল,

অথবা পিতামহের দোষ ছিল; অথবা এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্ব্বজন্মের সাফাই কি আছে? ব্যাঘ্র মেষশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার কোন উপায় নাই, তখন জুবিলির বৎসরে উত্তর-বাঙ্গালায় দুষ্কৃতকারীর যে বিশেষ জটলা হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

ইহুদী জাতির রচিত বাইবেল নামক বিশেষ প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধেয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থূল ঘটাইয়া দিতেন এবং পরবর্ত্তী কালে প্রদর্শিত তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া দণ্ডের ভারটা বাল-বৃদ্ধবনিতার উপর অপক্ষপাতে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজকাল আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া নূতন ধরণের উপাসনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের পরমকারুণিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সম্বন্ধে ঐরূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বেণ্টিঙ্ক ও মেকলের প্রেতপুরুষ, তোমরা ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে যে জ্ঞানবৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া গিয়াছ, তাহার ফলভোজনে প্যারাডাইস্ নষ্ট হইবার অধিক বিলম্ব নাই!

সে যাহাই হউক, জগতের যে সকল ঘটনা স্থূলদর্শীর চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরমকারুণিক বিধাতৃপুরুষের যে গূঢ় মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী লোকের কোন সংশয় নাই।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তি অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন,

অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি জীবের নিবাস না থাকিত বা জীবের অভ্যুদয় না ঘটিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমগ্র ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা ভাবিবার কোন আবশ্যকতাও উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখদুঃখ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীব মধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহাই অমঙ্গল। ইঁহাদের ভাবটা এই;—এই প্রকাণ্ড জগৎটা তাহার বৈচিত্র্য লইয়া কেবল মনুষ্যের ভোগের জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে; মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের এত মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য। মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থ সৃষ্ট হইবার বা বর্ত্তমান থাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকিত না। সৃষ্টি-কর্ত্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যেটা মানুষের উপভোগে যত সাহায্য করে, সেটার অস্তিত্ব ততদূর সার্থক এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি ততদূর সফল, এবং তাঁহার নৈপুণ্য ও বিবেচনাশক্তি ততদূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমা-দিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে আমাদের জীবনরক্ষার

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিকর, কেন না, এত কৌশল ও এত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে মানুষের অসুবিধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞতাভাজন ও প্রীতিভাজন, কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্ত্তিসহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম ইত্যাদি।

সূর্য্য কেমন অদ্ভুত পদার্থ! সূর্য্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞানশাস্ত্র শতমুখে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পৃথিবী এমন থাকিত না, এবং পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না; মাধ্যাকর্ষণের ব্যবস্থা কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শস্যে ও আমাদের শীত নিবারণের জন্য কাপাসের ফলকে তূলায় পরিণত করিয়া কি অপূর্ব্ব মানবহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান;—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও নীতিকার সকলেরই মুখে এই একই সুর চিরকাল শুনা যাইতেছে।

সমগ্র জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য ও সুবিধার জন্য নির্ম্মিত ও সৃষ্ট, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে, সেই জন্য এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত।

যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতিসহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এই খানে একটা খট্‌কা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণামাত্র. এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কিছুদিন পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন অন্যে সন্দেহ করে না। বিশ্ব জগৎটার কিন্তু সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন্ কাল হইতে জগৎ বর্ত্তমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া জগৎ রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র সাদি ও সান্ত মনুষ্যের জন্য এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্তু বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরে অনন্ত আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্ত্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রে জীব বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কাজেই জগৎটা কেবল মনুষ্যের জন্য নির্ম্মিত, মানুষেরই একচেটে ভোগ্য বস্তু এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চৈতন্যযুক্ত সুখদুঃখভোগী জীবমাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চৈতন্য আছে, যাহার সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারই সুবিধার জন্য, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য

ও আরামে রাখিবার জন্য জগতের সৃষ্টি। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই। যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়। কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের বিজ্ঞানেতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল ?

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনি জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা ; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়ালের ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দ্দেশে তর্কশাস্ত্র কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক, মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে একচেটিয়া রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রযোজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর সমুদয় মঙ্গলার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে।

অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বত্র প্রয়াস, কাজেই অমঙ্গলের মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

মনুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হঠিবার নহে। মনুষ্য তর্কের খাতিরে মঙ্গলনিদান ঈশ্বরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলনিদান আর এক ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছে। এক ঈশ্বর মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক ঈশ্বর অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের নাম জেহোবা, অন্যের নাম শয়তান। একের নাম অহুরমজদ, অন্যের নাম আহ্রিমান। উভয়ে চিরন্তন বিরোধ; একে অন্যকে পরাভবের চেষ্টায় রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী। শয়তান জেহোবার কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য, তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে চিরকাল হাঙ্গামা চলিতেছে। ঈশ্বর শয়তানকে জব্দ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিন্তু শয়তান বুদ্ধিপ্রাচুর্য্যে ও শয়তানীতে দ্বিতীয় শিবাজি। আরঙ্গজেবের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষপর্য্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে। সে দিন কবে আসিবে, তাহা কেহ গণিয়া বলেন না।

শয়তানে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে বিশ্বাস যাঁহার যত দৃঢ়, তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে সেই পরিমাণে বাধ্য। গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময়। ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ; বাড়ীগুলা ভূমিসাৎ করা, মানুষগুলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাজ। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সেই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদের আস্পদ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? অবশ্য

শয়তানের অত্যাচারে যে সকল জননী পুত্রহীনা ও রমণী পতিহীনা হইয়াছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দয়া প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের নিকট ধন্যবাদ দাবি করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।

কাজেই শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ পড়ে। কিন্তু তাহাতে আবার তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের শক্তির অপরিসীমত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

কাজেই অন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্য স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব। মনুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা রাস্তা আছে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে রাস্তায় ইচ্ছা চলিতে পারে। যে ভাল রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন; যে মন্দ রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, সে সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ। মনুষ্যের দোষে মনুষ্যকে শাস্তি দিবার জন্য, মনুষ্যকে সাবধান করিবার জন্য, মনুষ্যের পাপক্ষালনের জন্য অমঙ্গলের উৎপত্তি।

প্রকৃত হইলে উত্তরটা সুন্দর হইত, কিন্তু কথাটা বিচারের বিষয়। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহার সমগ্র মানসিক গঠনও তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় নাই। পিতৃপিতামহাদি সহস্র পূর্ব্বতন পুরুষ তাহার শারীর প্রকৃতির ও তাহার মানস প্রকৃতির জন্মদাতা; সে সেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার মানসিক প্রকৃতির একটা অঙ্গমাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি

পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে, সে তাহারই ব্যবহার করিতেছে, তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিও না।

কথাটা তর্কের বিষয়। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক চলিতে পারে; বস্তুতই এখনও ইহার মীমাংসা হয় নাই। স্বীকার করা গেল, ইচ্ছা স্বাধীন। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী কে? সংসারের প্রচণ্ড নির্ম্মম দ্বন্দ্বে সে কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার যথেচ্ছ পথে চলিবার শক্তি আছে? সহস্র শত্রু তাহাকে গন্তব্যপথে চলিতে দিতেছে না; সহস্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। ভাগ্যবান্ সে, যে এই শত্রুকুলকে অতিক্রম করিয়া, প্রলোভনসমূহ এড়াইয়া, যথেচ্ছ পথে চলিতে সমর্থ হয়।

আবার মনুষ্যের পাপে না হয় মনুষ্যের অমঙ্গল উৎপন্ন হইল। কিন্তু অমঙ্গল মনুষ্যমধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্নস্থ জীবপর্য্যায়ে নিদারুণ নিষ্ঠুর নির্ম্মম জীবনদ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? জীবসমাজে যে দুঃখের যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, এইরূপ অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের শোণিত ব্যতীত অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তির যখন উপায়ান্তর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন আহারদাতৃত্বে ও রক্ষাকর্ত্তৃত্বে সামঞ্জস্য ঘটান বুদ্ধির অসাধ্য হইয়া পড়ে।

চারিদিকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাঁহার দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলসৃষ্টির ভারটা শয়তানের উপর চাপাইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় দোষ পড়ে। নিরীহ মনুষ্যকে দায়ী করিলে অত্যাচারপীড়িতের উপর আরও অত্যাচার করা হয়। দায়িত্ব-

শূন্য ইতর জীবের যাতনার উদ্দেশ্য ত একেবারে পাওয়াই যায় না। অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক; অগত্যা বলিতে হয়, মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ। বলিতে হয়, অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি লোকে দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে অসমর্থ। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল।

কথাটা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীবসমাজেই দেখা যায়, দারুণ জীবনসংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্ব্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; তাহার ফলে জীবসমাজেই অযোগ্যের বিনাশ, যোগ্যের অভ্যুদয়। জীবের উন্নতির এই মুখ্যতম উপায়। অভিব্যক্তির এই প্রধান পথ। এই পথে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, জগতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্য্যের বিবিধ রূপের ক্রমশঃ বিকাশ। সমস্তই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া। ভালর জয়, মন্দের ক্ষয়, সবলের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, সর্ব্বত্র এই একই সূত্র। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য, প্রকৃতির এই কারখানা চলিতেছে না। ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি নহে; জাতির জন্য সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে সুখের আশা না থাকিতে পারে; কিন্তু জাতির জীবনে সুখের আশা আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান। জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ভূপঞ্জরের স্তরমালা উদ্ঘাটন করিয়া দেখ! কত লুপ্ত জীবের কঙ্কাল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুম্ভীর, কত বিশাল বিহঙ্গম এককালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। এখন তাহারা কোথায়?

এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে, তাহাদের শিলীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান। তাহারা গিয়াছে; তাহারা জীবনদ্বন্দ্বে পরাভূত হইয়াছে; অন্যে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজ্যে নূতন রাজপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিয়াছে, নূতনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে।

জীবন সংগ্রাম আজিও চলিতেছে। এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন মৃত্যু। কিন্তু ভাবী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র্য, ভাবী ফল সৌন্দর্য্য, ভাবী ফল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব। অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহস্য, বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

ঠিক কথা, দুঃখের পর সুখ এবং দুঃখ হইতেই সুখ। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নহে। বিধাতার বিধানই এইরূপ। কিন্তু হায়, বিধান কি অন্যরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপাদন কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্য, অভিব্যক্তির জন্য, মৃত্যুর পথ বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; মৃত্যুর পথের পরিবর্ত্তে জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিলে কি বিধাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিত না? উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ না করিলে কি তাঁহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত পড়িত? জীবের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্য উপায় অনন্ত বুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই? এক বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়; তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র উত্তর আছে। মনুষ্যের বুদ্ধি দিগ্বিজয়ী। ইহার অনধিগম্য দেশ নাই, ইহার অসাধ্য কাজ নাই। ইঙ্গিতমাত্রে

মনুষ্যবুদ্ধি না-কে হাঁ ও হাঁ-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন আর ভয় কি? নীতিকার ও শাস্ত্রকার, ধর্ম্মপ্রচারক ও দার্শনিক এক-বাক্যে একস্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কোথায়? অমঙ্গল একেবারে অস্তিত্বহীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছ; বৃথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাইতেছ। মিথ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের আবরণ ও ভ্রান্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিয়া দেখ; পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ তুমি; তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ,—জ্যোতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ। অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না। আনন্দের কোলাহলে আমার শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে আমার নয়ন ঝলসিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর উথলিতেছে; জ্যোতির তরঙ্গ, আলোকের হিল্লোল, তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। কাহাকে তুমি দুঃখ বলিতেছ? দুঃখই সুখ, দুঃখই আরাম, দুঃখই আনন্দ। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের সার, মৃত্যু জীবনের সোপান, মৃত্যু জীবনের সহচর, আনন্দময় বিরামময় সহচর।

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ প্রেমিকের কথা এইরূপ। যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবন সুখের জীবন, কেন না, অমঙ্গল তাঁহার নিকট মঙ্গল। অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোক। তিনি পিতা;—পুত্রের অকালমৃত্যুতে বিধাতার মঙ্গলহস্তের আহ্বান দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া থাকেন। তিনি স্বামী;—পত্নীর অবমাননা তাঁহাকে বিধাতার করুণার পরিচয় প্রদান করে। তিনি নিরপরাধ ক্ষুৎপীড়িতের মরণ

যাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দলাভ করেন। তিনি সুখী, তিনি আনন্দে বিভোর, তিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন না। তাঁহার সৌভাগ্যে আমাদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, তাঁহার ক্ষমতায় আমরা বিস্মিত হই, তাঁহার প্রসাদের জন্য আমরা ভিখারী। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধ্যসাধনে পটীয়ান্, তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই। তাঁহার চরণে প্রণাম।

তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতে আমরা অসমর্থ। তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি, ভয় করি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি না। তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন; স্বয়ং তিনি সুখী। তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন; তিনি শক্তিশালী, তিনি ভাগ্যবান্। আমার সে শক্তি নাই; আমি তাঁহার সুখে সুখী হইব কিরূপে? তিনি চক্ষুষ্মান্; তিনি আলোকে থাকিয়া আনন্দে পূর্ণ। আমি অন্ধ, অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার আনন্দে যোগ দিতে অসমর্থ. কিন্তু ইহা সত্য, তাঁহার জগৎ যেমন মঙ্গলময়, আমার জগৎ তেমন নহে। তিনি সৌভাগ্যশালী, ক্ষমতাশালী, বিশ্ববিধানের পরমভক্ত। আমি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত, সে ক্ষমতায় হীন, আমার ভক্তিরস তেমন উথলিয়া উঠে না। তিনি আমার মত হতভাগ্যকে কৃপা করুন; কিন্তু সংসারবিষে জর্জ্জরিত-কলেবর আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহার সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না।

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। তাহার অপর অর্থ কিরূপ, তাহা ঠিক আমরা বুঝি না। আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল

ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলো নাই, শাদা ছাড়িয়া কাল নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্ব্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আর আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই, আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর, মঙ্গলকে আটকাইয়া রাখা অসাধ্য হইবে; মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে আছে বলিয়াই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব, নতুবা মঙ্গল অস্তিত্বহীন অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

কবিকল্পিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে। সেখানে মলয় পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রজনী নিরন্তর জ্যোৎস্নাময়ী, সেখানে যৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ। সেখানে বিরহ নাই, মিলনের আনন্দ সেখানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিত্য জ্যোৎস্নায় কবিকল্পনা নিত্য সুখের অস্তিত্ব দেখিতে পায়; কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা এই নিত্য জ্যোৎস্না ও নিত্য বসন্তে সুখ দেখিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। অথবা এই প্রাকৃত স্বভাবরাজ্যে জ্যোৎস্নার ও বসন্তের ও আরামের ও মিলনের নিতান্ত অসদ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবিকল্পনা এই অতিপ্রাকৃত সুখাবতীর নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে। অন্ধকারের পার্শ্বেই জ্যোৎস্না সম্ভব। বিরহদুঃখের পরেই মিলনসুখ উপভোগ্য। যে

বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আস্বাদনে অধিকারী নহে। যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন।

অমঙ্গলকে জগৎ সংসার হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া অকূলে হাবু ডুবু খাইবার দরকার নাই। যে দিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝরধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে; একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলিব? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এ পার হইতে বলি সুখ, ও পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ। দক্ষিণ পারে সুখ, বাম পারে দুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই। যেখানে এপার নাই, সেখানে ওপারও নাই। সেখানে স্রোতস্বতীও চক্ষুর অগোচর। জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির তারিখ নির্দ্দেশ মহাসমস্যা; কিন্তু সেই তারিখে তাহার সহচর মঙ্গলেরও উৎপত্তি। যদি এককে পরিহার করিতে চাও, তবে অন্যের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের নিয়ম এই; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কিরূপ? অভিব্যক্তির নাম উন্নতি বল ক্ষতি নাই, কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও না। উন্নতিসহকারে সুখের বৃদ্ধি, উন্নতিসহকারে দুঃখেরও বৃদ্ধি। যখন সুখ ছিল না, তখন দুঃখ ছিল না; যখন সুখের আধিক্য ঘটে, তখন দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়। অচেতন জগতে, জড়জগতে, অনুভবশক্তি নাই; অর্থাৎ সুখও নাই, দুঃখও নাই। চেতনাসহ সুখ দুঃখ উভয়েরই পার্থক্যবিকাশ। যে যত সুখ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, সে তত চেতনাযুক্ত তাহার চেতনা সেই পরিমাণে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। জীবপর্য্যায়ে যত উন্নতি, যত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই সুখদুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ. জীব-সমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্যসমাজেও তাহাই। সভ্যতার উন্নতির অর্থ কি? সুখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বলে, সভ্যতার সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে; কেহ বলে, দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়িতেছে; কেননা একে ছাড়িয়া অন্যের স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না। জীবনের সহিত সুখদুঃখের সম্বন্ধ। যাহার জীবন নাই, তাহার দুঃখও নাই, সুখও নাই। জীবনের অর্থ জড় হইতে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টা। জড়জগৎ জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানিতেছে। জীবন জড় হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াসী। জীবনের জড়ত্বে পরি-ণতির নাম অমঙ্গল। জীবনের স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় সফলতার নাম মঙ্গল। জীব অমঙ্গল পরিহার করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায়। কেননা উহাতেই জীবের জীবত্ব; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। উহা ছাড়িয়া জীবনের সার্থকতা নাই। অমঙ্গল কেন হইল, মঙ্গল কেন হইল, ইহার উত্তর চাও, তবে জীবনের উৎপত্তি কেন হইল, ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। কেননা জীবনের সহিত মঙ্গলামঙ্গলের নিত্যসম্বন্ধ; জীবনকে

ছাড়িয়া মঙ্গলামঙ্গলের অর্থ নাই ও অস্তিত্ব নাই। জীবনের সহিত আবার চেতনার সম্বন্ধ। অন্ততঃ জীবনের অভিব্যক্তি সহকারে চেতনার স্ফূর্ত্তি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্শ্বে মঙ্গলকে বুঝে, সুখ দুঃখে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়—জিজ্ঞাসা করিতে চাও; মঙ্গলের জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব মঙ্গলই বা কেন? এক প্রশ্নের উত্তর মিলিলেই অন্যেরও উত্তর মিলিবে। অথবা পূর্ব্বে চেতনার উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান কর; চেতনার উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চেতনা কি? না, সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধই চেতনা। যেখানে সুখে ও দুঃখে পার্থক্য বোধ নাই, সেখানে চেতনাও ফুটে নাই। আবার যাহাতে সুখ, তাহা মঙ্গল, যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যেদিন চেতনার সৃষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের সৃষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্ত্তমান, জগতে দুঃখ অবর্ত্তমান, চেতন জীব কেবল একই শান্তি, একই আরাম, একই আনন্দ উপভোগে নিরত রহিয়াছে,—ইহা চিন্তার অগোচর, ইহা অলীক কল্পনা।

অতএব এস বন্ধু, অকারণ আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না, অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইও না। সত্যের আশ্রয় কর, মিথ্যাবাদ বর্জ্জন কর। অমঙ্গলকে মানিয়া লও, অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার চেতনার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমান ভাবে তোমাকে জড়াইয়া থাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ

তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার ব্যক্তিত্বের বিলোপ। যতদিন জাগিয়া আছ, ততদিন তোমার ব্যক্তিত্ব; ততদিন মঙ্গল তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিবে। একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ; উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পন্থা। জীবনের পন্থা তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্যদেশ তোমার সম্মুখে প্রসারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি তোমাকে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে সেই গন্তব্যপথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। বৃথা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। একজে আলিঙ্গন কর ও প্রেমের বন্ধনে জড়াইয়া ধর; অপরকে ভক্তিভরে নমস্কার কর। গন্তব্যপথে তোমার গতি হউক, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমার গতিবিধির প্রেরণা করিতে রহুক। ধীরপদবিক্ষেপে অটলভাবে তোমার কর্ত্তব্য কাজ সম্পন্ন কর, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাক। কর্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি বা অমঙ্গলের প্রতি, তুমি দৃক্‌পাত করিও না। শ্রুতি স্মৃতি সদাচার তোমার পথপ্রদর্শক হউক। সকলের উপর আত্মতৃপ্তি তোমার পথপ্রদর্শক হউক। যিনি তোমার অভ্যন্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, তাঁহার তৃপ্তিবিধানে তোমার মতি থাকুক। তৎপ্রদর্শিত মার্গে তুমি নির্ভীকচিত্তে অগ্রগামী হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক; উভয়ের জয়েই তোমার জয়।

ভীত ভ্রান্ত স্বাস্থ্যচ্যুত মানব বহুকাল ধরিয়া মঙ্গলের জয় গান

করিয়া আসিতেছে; অমঙ্গলের জয়বার্ত্তা কি কখন গীত হইবে না? অমঙ্গলের জয়বার্ত্তা গীত হইয়াছে। রামায়ণের আদি কবি সেই গীত গাহিয়াছেন; ভারতের সমগ্র ইতিহাসে সেই গীত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অতিপ্রাকৃত

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিব কি না, একালের একটা প্রধান সমস্যা। সেকালের লোক নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিত। এ কালেরও এত লোকে বিশ্বাস করে, যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অস্বাভাবিক হইলেও একালের বৈজ্ঞানিকেরা অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস করেন। আর যাঁহারা আপনাদের অবৈজ্ঞানিকতা স্বীকারে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও একালের বিজ্ঞানের খাতিরে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু যখন শোনা যায়, দুই একজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, তখন বড়ই খট্‌কা দাঁড়ায়। থিয়সফিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলেই তাঁহারা উল্লাসের সহিত ওয়ালাশ, ক্রুকস ও লজের নাম করিয়া ফেলেন। তখন তাঁহাদের দশনপ্রভায় আঁধার ঘর আলো হইয়া পড়ে। আমাদের মত অপণ্ডিত লোকে, যাঁহারা উক্ত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য-মহিমায় মুগ্ধ আছেন, তাঁহারা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

অগত্যা তখন বলা যায়, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজশাসন নাই। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য নহি। তিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তাঁহার কথা শুনিব। নাম দেখিয়া ভয় বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তর দেওয়া যায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর গোল থাকিয়া যায়। কথাটা যদি নিতান্তই অমূলক হইবে, তবে ওয়ালাশ সাহেব মানেন কেন? আর কেহ নহে,—যে সে নহে—ওয়ালাশ কেন মানেন?

বড় কঠিন সমস্যা। হিউম নাকি বলিয়া গিয়াছেন অতিপ্রাকৃত,—যাহার ইংরাজি নাম মিরাক্‌ল,—তাহা ঘটিতে পারে না। টিণ্ডাল নাকি বলিয়াছেন, জগতে মিরাকলের স্থান নাই। এখন কোন্ পথে যাই?

থিয়সফিষ্ট বন্ধুগণকে খুসী করিতে পারিব না জানি, তথাপি একবার বিচারসমুদ্রে অবগাহন করা যাক।

ইংরাজি মিরাকল শব্দের অর্থ কি ঠিক্ জানি না; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ জানি। প্রাকৃত অর্থে যাহা প্রকৃতির অঙ্গ, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে; অতিপ্রাকৃত অর্থে, প্রকৃতিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির বাহির।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্রকৃতির অঙ্গীভূত—তা সে যতই অদ্ভুত হউক না কেন। অদ্ভুত হইলেও তাহা যখন ঘটিতেছে, তখন তাহা প্রাকৃত, তাহা অতিপ্রাকৃত নহে।

বাইবেলে গল্প আছে, জোশুয়ার আদেশে সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়াছিল। যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুর পর অনেককে দেখা দিয়াছিলেন। ঐ ঐ গল্প হয় সত্য, নয় মিথ্যা। হয় উহা ঘটিয়াছিল, নয় ঘটে নাই। যদি ঘটিয়া থাকে—তবে উহা প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত নহে—অত্যদ্ভুত হইলেও অতিপ্রাকৃত নহে। যদি না ঘটিয়া থাকে ত কথাই নাই।

যাহা ঘটে, তাহাই যখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ। কাজেই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই।

এইরূপে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত

করা চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীমাংসা হয় না। আসল কথা এই, জোশুয়ার আদেশে সূর্য্যের গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না? যীশু খৃষ্টের প্রেতমূর্ত্তি লোকে দেখিয়াছিল কি না? ভূত মানিব কি না?

কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না। ঐ সকল ব্যাপার অসম্ভব; উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। যাহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা ঘটিতে পারে না। টিণ্ডাল হয়ত ঐরূপ বলিতেন।

ভাল; কিন্তু উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা জানিলে কিরূপে? প্রকৃতির নিয়ম কি?

হয়ত বলিবে, ঐ ব্যাপার অতি অদ্ভুত, অতি নূতন; বাইবেলের গল্পে ছাড়া এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই। উহা অতি অদ্ভুত, অতি অসাধারণ, অতি নূতন—কাজেই উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

এরূপ বলিতে পার না। এই কয়েক বৎসর মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র কত অদ্ভুত নূতন কাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছে। বায়ু মধ্যে আর্গন, ক্রিপটন প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত নূতন পদার্থ বাহির হইল; কত কি রকম অদ্ভুত আলো বাহির হইল, তাহা কাঠ পাথর মানে না, তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়;—এই সকল অত্যদ্ভুত অতি নূতন স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারে বিশ্বাস কর, আর বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না?

ইহার উত্তর নাই। নূতন বলিয়া, অদ্ভুত বলিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া, অবিশ্বাস করিবার জো নাই। অজ্ঞাতপূর্ব্ব হইলেই বা অদ্ভুত হইলেই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না।

তার চেয়েও সূক্ষ্ম তর্ক আছে। প্রকৃতির নিয়ম কি? প্রকৃতিতে যা ঘটে, তাহা লইয়াই ত প্রকৃতির নিয়ম। যাহা ঘটে, তাহা নিয়মবিরুদ্ধ হইতেই পারে না। আমি বলিতেছি সূর্য্যের গতিরোধ যখন

ঘটিয়াছিল, তখন উহা নিয়মসঙ্গত। তুমি যদি বল, উহা নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা হইলে যাহা বিচারের বিষয়, যাহা বিরোধস্থল, যাহাকে অসম্ভব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগেই অসম্ভব ধরিয়া লইতেছ। এ কিরূপ যুক্তি? ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ যুক্তি টিকে না। তুমি হয়ত বলিবে, চিরকাল ধরিয়া মানুষে যখন সূর্য্যকে গতিশীল দেখিয়া আসিতেছে, তখন সূর্য্যের অবিরাম গমনই নিয়ম; এত সহস্র বৎসর মধ্যে কেবল একবার মাত্র গতির রোধ নিয়মবিরুদ্ধ।

বিখ্যাত ব্যাবেজ সাহেব ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মবলে সেই যন্ত্র আঁক কষিয়া উত্তর বাহির করিয়া দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তেত্রিশ হাজার পাঁচ। তার পর আবার নিয়ম মত যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের মিরাকল বটে, তবে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে, ঐ সময়ে এই সংখ্যা বাহির না হইয়া ঐ সংখ্যাই বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্ম্মাতা অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে, মনে করিতে পারে।

এইরূপ জগদ্‌যন্ত্র সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। সূর্য্য দিনের পর দিন যথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। এক দিন অকস্মাৎ যদি থামিয়া যান, তাহা হইলে জগদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। যিনি যন্ত্রের নির্ম্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য চলিতে চলিতে সহসা এক একবার থামিবেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপই আছে।

বস্তুতঃ ব্যাবেজ সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, ঐটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যভিচার নাই বা হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক। এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমান্‌কে সাজে না।

মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা, প্রভৃতি কয়েকটি ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাবদূকতা প্রদর্শন করিতেন। আজি কালি অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা ছাড়াইয়া কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। যে কাল-টুকু ও যে দেশটুকু ব্যাপিয়া আমরা ঐ সকল নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, উহারা ততটুকুর মধ্যেই ঠিক্। তাহার বেশী আমরা বলিতে পারিব না। ঐ সকল নিয়মের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। হয় ত কিছুদিন পরে শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে জড়ের নূতন সৃষ্টি ঘটিতেছে, শক্তির ধ্বংস ঘটিতেছে; তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু যদি ঘটে, তাহার অপলাপ করিতে পারিব না। প্রকৃতিতে যাহা ঘটিবে, তাহাকেই প্রাকৃত ও প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে অনশ্বর জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ও কত বক্তৃতা করিয়াছি; এখন উহাকে স্থলবিশেষে নশ্বর দেখিলে দুঃখিত হইব, কিন্তু দুঃখই সার হইবে। যাহা যেখানে নশ্বর, তাহা আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না।

তাই যদি ব্যাবেজের কলের মত সূর্য্য লাখ বৎসর অন্তর একবার করিয়া কাহারও আদেশমত থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। অসম্ভব বলিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে উড়াইতে পারিব না।

কোন নূতন ধরণের সামুদ্রিক জীব যদি মাঝে মাঝে জাহাজের নিকট ভাসিয়া উঠে, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় কি? তবে মাঝে মাঝে যদি কোন নূতন ধরণের জীব তাহার ঈথরীয় ছায়াময় শরীর লইয়া আসিয়া দেখা দেয় বা ভয় দেখায়, বা নাকি সুরে কথা কয়, তাহাতেই বা প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়?

কখনই না। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, অতএব অসম্ভব,—এটা কোন কাজের কথাই নয়। প্রকৃতির নিয়ম কি তাহাই যখন পূরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠোক্তিমাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয় লেনাদেনা কারবার রহিয়াছে; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে কি আজ হইতে ভূত মানিব? বাইবেলের যত অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তর হক্‌সলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে একবারে অসম্ভব কিছুই নাই, সূর্য্যের গতিরোধ হইতে ভূতের উৎপাত পর্য্যন্ত কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। তেমনি গুলিখোরের সভায় যত গল্পের সৃষ্টি হয়, তাহারও কোনটাও হয়ত অসম্ভব নহে। তথাপি এই ক্ষেত্রে আমরা ঐ সকল গল্পে বিশ্বাস করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। ঘটনা সম্ভব হইলেই সত্য হয় না। সত্যতার প্রমাণ আবশ্যক হয়। বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রমাণ কিন্তু যথোচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ যথোচিত কথাটাতেই যত গোল। সর্ব্বসাধারণে যে প্রমাণে সন্তুষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে। কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতায় বিশ্বাস করা যাইবে, এ বিষয়ে ন্যায়-

শাস্ত্র নীরব। ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার যো নাই। চোখে ভুল দেখে। কাণে ভুল শোনে। বুদ্ধি বিকৃত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যচরিত্র দুর্ব্বোধ। কাহার মনে কি আছে, বলা অসাধ্য। নিজের উপরেই যখন সর্ব্বদা বিশ্বাস চলে না, তখন সাক্ষীর কথায়—তিনি যত বড় সাক্ষীই হউন,—সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিলে ঠকিতে হইবে, ইহাতে বিস্ময় কি?

মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে, এবিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে। সকলের আদর্শ সমান নহে; সমান হইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় তুমি অবলীলাক্রমে বিশ্বাস কর, আমি তাহাতে আদৌ আস্থা করি না। পরস্পর গালি গালাজ করিয়া শান্তিভঙ্গ করি। ফল কিছু হয় না।

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে ওপক্ষের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ আমরা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তোমরা ধীরভাবে প্রমাণ গ্রহণ করিতেই অসম্মত; তোমরা গোঁড়াতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বা অন্ধ প্রতারিত বলিয়া ধ্রুব জানিয়া রাখিয়াছ। আমাদের প্রমাণ না দেখিয়াই, না জানিয়াই, তোমরা রায় দিতেছ, এটা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিচার।

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাফাই এই যে আমরা বার বার প্রমাণ শুনিয়া ও সাক্ষ্য শুনিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি, যে আর ও মিছা অভিনয় ভাল লাগে না। আমাদের অনেক কাজ আছে; আর পুনঃ পুনঃ সময় নষ্ট করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত নহি।

সাফাই নিতান্ত ফেলিবার নহে। এতবার বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠকিতে হইয়াছে, যে তাঁহারা পুনরায় ঠকিতে কুণ্ঠিত হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত হয় না। তবে তাঁহারা প্রতিপক্ষকে একবারে না চটাইয়া এইরূপ জবাব দিলেই বোধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মনুষ্যের ক্ষমতা

৯। উপাদান—উপাদান শব্দে অনুরাগ বা আসক্তির ভাব আসে। তৃষ্ণার ফলে বহির্জগৎকে আপনার দিকে টানিয়া ধরিবার যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে উপাদান বলা যাইতে পারে।

১০। ভব—ইংরাজিতে being, becoming, existence; বাঙ্গালায় বলিলে সত্তা, অস্তিত্ব।

১১। জাতি—জন্ম, উৎপত্তি। সহজবোধ্য।

১২। জরা-মরণ—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। শাস্ত্রসঙ্গত অর্থ দিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পারিভাষিক শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন প্রবল মতভেদ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া যথেষ্ট বিসংবাদ রহিয়াছে। এইখানেই নানামুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

একটা বিষয়ে সকলেই একমত। নিদানের শৃঙ্খলা বা সূত্র একটা অভিব্যক্তির প্রণালীমাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। অভিব্যক্তি শব্দ ইংরাজি evolution অর্থে ব্যবহার করিলাম। অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

অভিব্যক্তি জরামরণের। জরামরণ আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও জরামরণের উৎপত্তি অর্থাৎ origin of evil একটা প্রধান সমস্যা। খ্রীষ্টানেরা একটা প্রাচীন উপকথার সাহায্যে এই তত্ত্বের অক্লেশে ও এক নিশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তত সহজে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় তেমন

মীমাংসা সর্ব্বত্র দুর্লভ। জরামরণের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি; সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত জরামরণ উৎপন্ন। শিকলের একপ্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ; মধ্যস্থলে অন্য অন্য নিদান। এখন এই সূত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে। আচার্য্যেরা ও পণ্ডিতেরা কিরূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক।

কোন কোন আচার্য্যের মতে নিদানশৃঙ্খলা মনুষ্য জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণমধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ভ। তখন সে সম্পূর্ণ অবিদ্যাচ্ছন্ন বা অজ্ঞানাবৃত থাকে। ক্রমশঃ তাহাতে স্পর্শ বেদনাদি সংস্কারের উৎপত্তি হয়। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ চিত্ত বৃত্তি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। সকল চিত্তবৃত্তিই ক্রমে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে ভ্রূণ তাহা জানিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের সঞ্চার হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বে সুখ দুঃখ স্পর্শ বেদনা ছিল, শঙ্কা চেষ্টা প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হয় ত বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ভ্রূণ যেন বিজ্ঞানের অভাবে তাহা জানিয়াও জানিত না, এখন বিজ্ঞানের উদয়ে ঐ সকল কতকটা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে ভ্রূণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তখন তাহার নামরূপের বিকাশ হয়, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ শিশু তাহার অন্তঃশরীরকে ও জড়শরীরকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পায়। তখন ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য আরম্ভ হয়। তার পর সেই ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য জগতের সহিত 'স্পর্শ' ঘটে, বাহ্য জগতের সহিত তাহাদের আদান প্রদান আরম্ভ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের

উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় তাহা ভাঙিয়া যাইবে, সেই ভয়ে কতকটা ব্যাকুল হন। সেই সৌধের কোন প্রকোষ্ঠমধ্যে এই নূতন জিনিষটাকে স্থান দিতে না পারায় তাঁহার সামঞ্জস্যবুদ্ধিতে, তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। এই নূতন জিনিষটাকে কতকটা সংশয়ের, কতকটা ভয়ের চোখে দেখেন, এবং যদি কোনরূপে উহার অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে যেন হাঁফ ছাড়িবার অবসর পান। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ আছে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক মানুষ ও সাধারণ মানুষ বস্তুতই এক শ্রেণীর মানুষ; জগদ্‌যন্ত্র যদি একেবারে এলোমেলো, শৃঙ্খলারহিত, একটা গণ্ডগোলমাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মানুষেরও জীবনযাত্রা সুকর হইত না। জগৎযন্ত্রে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে, সেই জন্যই মনুষ্যমাত্রের জীবনধারণ সম্ভব হইয়াছে। ভাত খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; হঠাৎ যদি এই নিয়মটা বদলাইয়া যায়, এবং যত খাবে, তত ক্ষুধা বাড়িবে, এইরূপই যদি নূতন বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধি দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায়নির্দ্ধারণে একবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি বা অনিয়মের প্রতি যাঁহার যত ভক্তি থাক, জগদ্‌যন্ত্রে যদি কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকিত, তাহা হইলে কাহাকেও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে হইত না। কাজেই কতকটা সামঞ্জস্য ও কতকটা শৃঙ্খলা মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই প্রীতিকর না হইলে চলে না। সামঞ্জস্যের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি, মনুষ্যমাত্রেরই কতকটা আন্তরিক অনুরাগ রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ পশুর উপরে; রহিয়াছে বলিয়াই সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের উপরে। মনুষ্যমাত্রেই ন্যূনাধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক।

ন্যূনাধিক মাত্রায় ; কেন না, সামঞ্জস্যে প্রীতি সকলের পক্ষে সমান নহে ; সকলের জগৎ ঠিক্ সমান মাত্রায় সমঞ্জস নহে। ব্যবহারিক হিসাব ছাড়িয়া একটু পরমার্থের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমরা আপন আপন জগৎকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ জগৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। বস্তুতই বলা চলে না। এই প্রত্যয়গুলি মানসিক পদার্থ; প্রত্যেক বক্তি উহাদিগকে নানাভাবে সাজাইয়া আপন আপন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সকলের প্রত্যয় ঠিক সমান নহে, সেই জন্য সকলের জগৎ ঠিক এক রকম নহে ; প্রায় এক রকম; কিন্তু ঠিক এক রকম নহে।

দর্শনশাস্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটা শব্দ গ্রহণ করিলে বুঝাইবার কতকটা সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনার তিন অবস্থা ; জাগরণের, স্বপ্নের ও সুষুপ্তির অবস্থা,—জাগরণের অবস্থায় জগৎ সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, সমঞ্জস ; স্বপ্নাবস্থায় জগৎ শৃঙ্খলাশূন্য, অসমঞ্জস, এলোমেলো ;—তবে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা থাকে, ততক্ষণ উহা সুশৃঙ্খল বলিয়াই বোধ হয়। আর সুষুপ্তির অবস্থায় জগৎ প্রায় নাস্তিত্বে লীন হইয়া যায়। অবস্থা এই তিনটা, কিন্তু চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; চেতনা পূর্ণ জাগ্রত, বা পূর্ণ স্বপ্নাবস্থ, বা পূর্ণ সুষুপ্ত কোন সময়ে থাকে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। জাগরণে স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে মিলাইয়া মিশাইয়া চেতনার প্রকাশ। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কিয়দংশ স্বপ্ন দেখে, ও কিয়দংশ স্বপ্নহীন ঘুমে নিমগ্ন থাকে। আজ কাল subliminal self বা subliminal consciousness নামে একটা কথা শুনা যায়। প্রেততাত্ত্বিকেরা ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার করেন, এবং উহার দ্বারা নানাবিধ মানসিক বিকারাবস্থার ব্যাখ্যা করেন। ঐ শব্দের অর্থ এইরূপে

বুঝান যাইতে পারে। মানুষের চেতনার একটামাত্র প্রকোষ্ঠ পূর্ণ চেতন বা পূর্ণ জাগ্রত; যাহা সেই প্রকোষ্ঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী, তাহাই আমাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাতায়াত করিতেছে; যতক্ষণ উহা সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ হয় না; ততক্ষণ উহা subliminal থাকে, ততক্ষণ উহা জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেই সবলিমিনাল অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা বলিতে পারি, এবং যাহা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়াছে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, যাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, মায়ার্স সাহেব যাহাকে supraliminal বলেন, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে পারি। সুপ্ত অবস্থার যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারে, কখন ক্ষণেকের মত দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার তখনই পলাইয়া যায়, তাহাদিগকে স্বপ্নাবস্থ মনে করিতে পারি। মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় বা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ইংরাজিতে যাহাকে হিপনটিক অবস্থা বলে সেই অবস্থায়, এবং ওষধিমুগ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ নেশার অবস্থায়, এই আকস্মিক আগন্তুক অপরিচিত বা অল্পপরিচিত প্রত্যয়গুলি আসিয়া উঁকি মারে। তখন উহাদিগকে আমরা দেখি; কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত পূর্ণপ্রকাশ প্রত্যয়গুলির সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। প্রেততাত্ত্বিকের ভাষায় আমাদের পূর্ণ জাগ্রদবস্থাতেও এই সবলিমিনাল বা প্রকোষ্ঠের বহিঃস্থ চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তম্ভিত হই এবং তাহাদের সহিত পূরা সাহসে কারবার চালাইতে সাহস করি না; তাহাদিগকে জীবনের কাজে লাগাইতে সাহস করি না। তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কা ও আতঙ্কের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হই।

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক্। আমা-

দিগের চেতনায় সর্ব্বদা জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মিলিয়া যুগপৎ অবস্থান করিতেছে। তিনের তারতম্যানুসারে চেতনার অবস্থাভেদ ঘটে। আমরা যাহাকে পূর্ণ জাগরণ বলি, তাহা পূর্ণ জাগরণ নহে—তাহাতে স্বপ্নের অভাব নাই ; এবং সে সময়ে চেতনার কিয়দংশ যে নিদ্রিত নাই, তাহাও বলা যায় না। যাহা জাগরণে দেখি, তাহা সুশৃঙ্খল, যথাবিন্যস্ত ; যাহা স্বপ্নে দেখি—তাহা শৃঙ্খলাহীন, বিপর্য্যস্ত, তাহা জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত প্রণালীর সহিত অসম্বদ্ধ। কিন্তু যাহা এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অসংযত, তাহাকে সংযমের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। অন্ততঃ তাহাতেই চেতনার অভিব্যক্তি। ইহা প্রেততাত্ত্বিকেরাও অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার করিলে তাঁহারা নরদেহমুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত কারবারের জন্য এত উৎসুক হইতেন না। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তার জন্য, চিঠি চালাচালির জন্য, এত ব্যগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপ স্বপ্নকে জাগরণে লইয়া আসিবার জন্যই আমরা ব্যাকুল। স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই চেতনার স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতা।

প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হয় ? জাগরণের অবস্থাতেই প্রত্যয়গুলি কেন এমন সংযত ও সুশৃঙ্খল, এবং স্বপ্নাবস্থাতেই বা কেন এমন অসংযত ? ব্যবহারিক হিসাবে ইহার উত্তর যে জগৎপ্রণালীর অন্ততঃ খানিকটা সংযত নিয়মবদ্ধ সমঞ্জস না হইলে মানুষ ধরাধামে টিকিত না। নিম্নপর্য্যায়ের জীবে জগৎকে মানুষের মত সুনিয়ত দেখে না। মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্য্যায়ের জীব ; মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত সুনিয়ত দেখে, সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষী ; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্বপ্ন জীবনসংগ্রামে অনুকূল নহে ; তাহার সাক্ষী পাগল। সে কেবল স্বপ্ন দেখে—তাহার

জগতে শৃঙ্খলা নাই—সে জীবনসমরে অশক্ত। সেইজন্য বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবদ্ধ, সংযত, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত জগতে, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জাগ্রত: নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই যে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ।

অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি বৈজ্ঞানিকের বিষদৃষ্টির মূল এইখানে। অতিপ্রাকৃত লইয়া কোলাহলের মূলও এইখানে।

ফলিত জ্যোতিষ

পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা। উভয় পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহুকাল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; আর নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা বোধ হয় না। অথচ এক পক্ষ অকস্মাৎ এরূপ বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন, যে তখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মরিচাধরা অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া কোন রূপে শাণ দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইল না; অথচ আমার বোধ হয়, এক কথায় ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একটা উত্তর দিলেই যেন গোল-যোগ মিটিয়া যাইতে পারে।

উত্তরটা এই। মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন; অবশ্য মহাশয় যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার তৃপ্তি হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রমাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; আমার তৃপ্তি জন্মে বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্য আমাকে নির্ব্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না। কেননা এই শেষোক্ত অধিকারে আপনিও যেমন বঞ্চিত নহেন, আমিও তেমনি বঞ্চিত নহি। পাল্টা গালি দিতে আমাকে বাধ্য করিবেন না।

এ কালে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে, যে তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, এবং মাঝে মাঝে তাঁহারা এজন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের কারণ ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ আনয়ন করিবার সময় তাঁহাদিগকে একবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়; এবং যখনি তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তখনি তাঁহারা প্রমাণের বদলে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হন।

তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের পুত্রের জন্মকালে বুধগ্রহ যখন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইনপুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইবামাত্র পাখীসব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা

বৎসর বৎসর দেখিয়া আসিয়াছি, সূর্য্যদেব বিষুবসংক্রমণ করিবামাত্র দিন রাত্রি অমনি সমান হইয়া যায়; তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাইবীরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা যখন কালিদাস হইতে কেলবিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল? বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন জিনিষ কত আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত!

বাস্তবিকই স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্ত্যেই দেখ, প্রীষ্টলি ক্যাবেণ্ডিশ লাবোয়াশিয়ের সময় হইতে একশত বৎসর কাল আমরা রসায়নগ্রন্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের বায়ুমণ্ডলে গোটা পাঁচেকের বেশী বায়ু নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই চিরপরিচিত বায়ুমণ্ডলে অচিন্তিতপূর্ব্ব, অননুভবনীয় ছত্রিশ গণ্ডা নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চলিল, এবং পৃথিবীর যাবতীয় রসায়ন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ আপ-টু-ডেট্ রাখা কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিল; দশ বৎসর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত মনুষ্যের বীভৎস অস্থিকঙ্কালকে মোলায়েম সুচিক্কণ ত্বকের আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়া পেলীর ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট দূরদর্শিতার ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া আসিতেছিলেন, সহসা ক্রুক্স্ টিউবের ভিতর হইতে নূতন রশ্মি বাহিরে আসিয়া সেই ভীষণ কঙ্কালকে নয়নগোচর করিয়া দিবে, তাহাই বা কে জানিত?

সুতরাং এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি জ্ঞানগোচর হইল না, পরন্তু নিত্য নূতন ঘটনা মনুষ্যের বিজ্ঞান শাস্ত্রকে এক একটা ধাক্কা দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে, ঐ সূর্য্যটার আয়তন বারলক্ষ পৃথিবীর সমান; ঐ নক্ষত্রটা হইতে আলোক আসিতে বার বৎসর পোনের দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলোক আবার সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে, ইত্যাদি। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওঠা অসম্ভব, এরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে।

অহো সকলি যথার্থ; তথাপি দুরাত্মা আপনার জেদ ছাড়িবে না। সে বলিবে সবই যথার্থ—সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। উল্কাবর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব, যোগসিদ্ধিবলে আকাশবিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচবশীকরণ, কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকূল ইত্যাদি বলিয়া অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে। এমন কি ত্রেতার মহাবীর গন্ধমাদন উল্‌টাইয়াছিলেন, এবং কলির মহাবীরেরা টেবিল উল্‌টাইয়া থাকেন, ইহাতেও অসম্ভব বলিয়া উপহাসের কথা কিছুই নাই। আমার বোধ হয় না, এ কালের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস আছে যে, তিনি যুক্তিবলে ঐ সকল ঘটনার অসম্ভাব্যতা সপ্রমাণ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক বিশ্বাস সচরাচর আরোপিত হয়, যাহা তাঁহার আদৌ নাই। লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যভিচারিতায় নিতান্ত বিশ্বাসী, অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়মের যে ব্যভি-

চার বা ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত আমি একখানি খাঁটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখিলাম না, যাহাতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা সূর্য্যদেব পৃথিবীকে চতুঃপার্শ্বে ঘুরাইতে বাধ্য। বস্তুতঃ জগতে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ পর্য্যন্ত কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই; তাহাই পদার্থবিদ্যাবিদেরা বলেন, কাঁঠাল ফলের ঐরূপ স্বভাব, সে ভূমিতেই পড়ে, আকাশে উঠে না; এতকাল তাহাই করিত, সম্ভবতঃ কাল পরশুও তাহাই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঁঠাল ফল আর ভূমিতে পতন অন্যায় ভাবিয়া আকাশে আরোহণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিতান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে আপন আপন গ্রন্থের মধ্যে ও বক্তৃতার মধ্যে তখন লিখিতে ও বলিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের স্বভাবটা অমুক দিন হইতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এতকাল সে ভূমিতে পড়িত, এখন সে আকাশে উঠে। এবং কাঁঠালের দেখাদেখি অন্য সকলেই যদি সেই পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যাগ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা যাইবে, পৃথিবী এখন আর সকল জিনিষকে আকর্ষণ না করিয়া দূরে ঠেলে। প্রকৃতির নিয়মটা যদি বদলাইয়া যায়, কেন বদলাইল তাহা প্রকৃতি দেবীই বলিতে পারেন; বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য মাথাব্যথার কোনই প্রয়োজন নাই, এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ত চাহিয়াও ফল নাই।

ফলতঃ আম কাঁঠালের ভূতলপাতে সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট স্বার্থ আছে, বিশেষতঃ ঐ ঐ পদার্থ যখন সুপক্ক অবস্থায় থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলীলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিষ্ট্রার বাবু তাহা রেজিষ্টার করিয়া যান, তাঁহার পারিশ্রমিক

লাভ ব্যতীত অন্য উদ্বেগের কোন কারণই নাই ; বৈজ্ঞানিক সেইরূপে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে কেবল রেজিষ্টার করিয়া যান ; ঘটনাটা এমন কেন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক নহে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন বা তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন।

তবে কোন একটা ঘটনার সংবাদ পাইলে সেই সংবাদটা প্রকৃত কি না এবং ঘটনাটা প্রকৃত কি না, তাহা রেজিষ্টারির পূর্ব্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের যথেষ্ট আছে, এবং এই অনুসন্ধান কার্য্যই বোধ করি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিবিধ সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করে। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে তফাত। আমরা যত সহজে একটা ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া লই, তিনি তত সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না ; নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক কাজ ও অন্যায় কাজ বলিয়া স্থির করি, কিন্তু তাঁহার এই সামাজিকতার জ্ঞানটা অত্যন্ত অল্প। তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ও নিরীহ ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না। এইটাই বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ ; তবে তাঁহার এই সংশয়-পরতা কেবল অন্যের প্রতিই নহে; তাঁহার নিজের প্রতিও তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। তিনি সকল সময়ে আপনার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে, কখন্ কবে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন, এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা

আকুল। তাঁহার যথন নিজের প্রতি এইরূপ অবিশ্বাস, তথন তাঁহার পরের প্রতি অবিশ্বাসটা কতকটা মার্জ্জনাযোগ্য।

অবশ্য প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন, এমন নহে। এমন অনেক নূতন ঘটনা সচরাচর আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর সে দিন যে একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল, যে এমন এক রকম আলোক আছে, যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মনুষ্য শরীরের হাড়কয়খানা গণিয়া দেখান চলে। এই ব্যাপার সত্য কি না প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা কাচের পাত্রের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া তন্মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে দ্রব্যবিশেষের প্রলেপ মাখাইয়া আঁধার ঘরে সেই কাগজখানা ঐ কাচপাত্রের সম্মুখে ধর; এখন উভয়ের মাঝে ধরিলেই বাক্সর ভিতরের টাকার ছায়া ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে পাইবে। পাঁচ মিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপারটা যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সত্য কিনা প্রমাণ করিতে কোনই কষ্ট নাই। কিন্তু যদি আমার কোন বন্ধু আসিয়া বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও সবুজ দাড়ি, তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যা বলিলেও আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত হইতে হইবে, আর সত্য স্থির করিয়া অন্যের নিকট গল্প করিতে গেলেও অনুরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিবে। অথচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা কোন ন্যায়শাস্ত্রের সাধ্য নহে, যে সাহস করিয়া বলে। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্ লোকে কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও

তিনি 'বানরে সঙ্গীত গায়' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা কি সত্য, তাহা অপর সাধারণের জানিবার কোনই অবকাশ ঘটে না।

অমুক তারিখে বৃহস্পতি মকরে প্রবেশ করায় আমার বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ জুটিবে, এরূপ আশাতেও অনেকটা আনন্দ আছে, এবং কোন বৈজ্ঞানিক যখন ইহার অসম্ভাব্যতা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে পারেন না, তখন অকারণে সেই আশাভঙ্গ করিয়া আমার মনোভঙ্গের প্রত্যবায়গ্রহণে তাঁহার লাভ নাই। তবে আমার আশা সফল হইল কি না, এই ব্যাপারে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে শুধু আমার বাক্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে বলা অনুচিত। তিনি যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অসামাজিক অভদ্র ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে নির্ব্বোধ বা পাপিষ্ঠ বলিতে পারি না। তিনি যতটুকু প্রমাণ না পাইলে তৃপ্ত হইবেন না, অন্ততঃ সে প্রমাণটুকু তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের অবিশ্বাসের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠালগাছ ভাঙিয়াছে, সুতরাং হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতির সহিত আমার নিমন্ত্রণপ্রাপ্তির কোন সম্বন্ধই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিতেও কিছু আসে যায় না। নেপোলিয়নের কোষ্ঠীছাপানর পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর যাহা না মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব

অথবা গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। সূর্য্যও অকস্মাৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে পারে। অগ্নির দাহিকা শক্তিও নষ্ট হইতে পারে। মরা মানুষও সমাধি হইতে উঠিতে পারে। আমারও অদ্য নিমন্ত্রণ জুটিতে পারে। কিন্তু জুটিল কি না তাহার প্রমাণ অন্যরূপ। এবং অবিশ্বাসীরা যেরূপ প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আত্যন্তিক সংশয়পরতার জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন; আমি কি এতই নির্ব্বোধ, আমি কি এতই অন্ধ, আমি কি এতই বধির ইত্যাদি। এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। এবং এ সকল যুক্তি বিফল দেখিয়া যখন তাঁহারা লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। কেন না প্রাণের আশঙ্কা সকলেরই আছে; এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম নাই।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে, ইহা একটা সমস্যা। বড় বড় পণ্ডিতে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোন চেষ্টা হইবে না।

অন্যান্য মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরাজিতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহাই

দেখিয়া চলে। ইউটিলিটির বাঙ্গালা অর্থ হিতকারিতা, উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা। যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবনসংগ্রামে অনুকূল, কোন না কোনরূপে জীবনসংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, প্রকৃতি তাহাই নির্ব্বাচিত করিয়া অভিব্যক্ত করেন। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুইখানা অস্ত্র-নির্ম্মাণের ও অস্ত্রব্যবহারের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবনরক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। অতএব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়া লয়। কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয়; বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা, বর্ত্তমান লালসা, বর্ত্তমান প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমনে রাখিতে হয়; এই জন্য মনুষ্য মধ্যে নীতিধর্ম্মের উদ্ভব। ইহাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাজ। কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষায় সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষা ব্যতীত জাতিগত জীবন রক্ষা বা বংশরক্ষা আছে; বংশরক্ষার অনুকূল ধর্ম্মসকলও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেই অভিব্যক্ত হয়।

এইরূপে যাবতীয় প্রধান মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন এক দিন ছিল, যখন মনুষ্য মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তখন তাহার বানরজাতীয় পূর্ব্বপুরুষে পশুত্বমাত্র বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিবিধ মানব ধর্ম্ম বিকশিত করিয়া তাহাকে

মানবপদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি মানব ধর্ম্ম। মানব ধর্ম্ম এই হিসাবে, যে মানবেতর প্রাণী এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ আছে কিনা, বলা কঠিন। ইংরাজীতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, সেই ফাইন আর্টের যে সৌন্দর্য্য লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরাজীতে যাহাকে ইসথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দ[illegible] কারবার। ইতর জীবের মধ্যেও এক রকম সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা [illegible], কিন্তু তাহা সাধারণ জীবধর্ম্ম; তাহাকে বিশিষ্ট মানবধর্ম্মের স[illegible] এক পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগী[illegible] মন ভুলায়; কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়; [illegible]র কলাপ-শোভা বিস্তার করিয়া কেকারবসহকারে নাচিয়া ময়ূরীর [illegible] ভুলায়। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সাধারণ জীবধর্ম্মের অন্তর্গত। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, যৌন নির্ব্বাচনে ঐ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি [illegible] ময়ূরীর সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই ময়ূর সুন্দ[illegible]য়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপ সৌন্দর্য্যের ও এইরূপ সৌন[illegible]প্রিয়তার অসদ্ভাব নাই। নারীদেহের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এই [illegible] নির্ব্বাচন হইতেই উৎপন্ন। চম্পক অঙ্গুলির প্রতি ও খঞ্জন নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারীজাতি চম্পক অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছে। ইহা বুঝা যায়; কিন্তু জবা শেফালিকা ছাড়িয়া কেন চম্পক অঙ্গুলির প্রতি এবং পেঁচা হাড়গিলা ছাড়িয়া কেন খঞ্জন নয়নের প্রতি অকস্মাৎ পুরুষের আকর্ষণ হইল, ইহা বুঝা যায় না। ইহার অর্থ ও কারণ পাওয়া যায় না। মনুষ্য যেখানে সেখানে অকারণে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তুমি আমি

যেখানে মুগ্ধ হইবার কোন কারণ দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবিকুল এইজন্য বিজ্ঞ-সমাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচকধ্বনিতে অর্থাৎ বাঁশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতাগীতি শুনিতে পাইতেন; ওয়ার্ড-সোয়ার্থ কোকিলের ডাক শুনিয়া অশরীরী বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন; এই শ্রেণীর অদ্ভুত সৌন্দর্য্যবোধ অপর সাধারণের হৃদ্গত হয় না। এবং এই সৌন্দর্য্যবোধে জীবনরক্ষায় কোন কার্য্য-কারিতা আছে, তাহাও বোধ হয় কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচরকমের বর্ণের বিন্যাস করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কলাবৎ নানা রকমের স্বর বিন্যাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে কিরূপে কেন উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। সকলের চোখ কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সমর্থ হয় না; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাঁহার এই মোহ, তাহা বুঝান যায় না। জীবনসংগ্রামে এই মোহ কোনরূপ আনুকূল্য করে, বলিতে গেলে বাতুলের প্রলাপ হইবে। কাজেই এই সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক হেতু নির্দ্দেশ এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনরূপ মহামন্ত্রের অন্যতর ঋষি আলফ্রেড রসেল ওয়ালাশ এইজন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে নাই। যৌন নির্ব্বাচনেও

ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ যখন মানবত্বের একটা প্রধান লক্ষণ, হয়ত অনেকের মতে মানবত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, সৌন্দর্য্যবুদ্ধিবর্জ্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন পূর্ণ মানবত্বই যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, একথা স্বীকারে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। মানবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, মানবোৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়ালাশের চরম সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ।

ওয়ালাশের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে রাজি হয়েন নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যবুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোন কার্য্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি জন্মাইতে পারে, এই কথা স্পষ্টতঃ বলিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দর্শাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল চেষ্টা বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলেন, এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা একটা bye-product of evolution—জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক ফলমাত্র। পাখীর সৌন্দর্য্য পাখীর ব্যক্তিগত জীবন রক্ষায় বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহার জাতিগত জীবনরক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও প্রমাণাভাব; সুতরাং এই সৌন্দর্য্যে পাখীর কোন লাভ নাই, তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। ময়ূরীর খাতিরে ময়ূরকে কলাপের দুর্ব্বহ বোঝা বহিতে হয়। কিন্তু ময়ূরীর এই বোঝার প্রতি আকস্মিক অনুরাগ জীবনদ্বন্দ্বে ময়ূরবংশের রক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য

না করিয়া বরং প্রতিকূলতাই করে; ময়ূরকে তাহার শত্রুর নিকটে আত্মরক্ষায় একান্ত অসমর্থ করে। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যখন শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে, জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ ধর্ম্ম তাহাতে বিকাশ পায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও দুই একটা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যাহার জীবনে কোন উপযোগিতা নাই; এই সকল আগন্তুক বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন জীবন রক্ষার অনুকূল না হইতেও পারে। পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে তাহার নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবন রক্ষায় তেমন কার্য্যকারী না হইতেও পারে। ময়ূরীর যে সৌন্দর্য্যবোধের কথা বলা যাইতেছে, তাহা এইরূপ আগন্তুক আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তনমাত্র।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আগন্তুক আনুষঙ্গিক লাভ মাত্র; জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ মানবধর্ম্মের বিকাশের সহকারে দৈবক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটিয়াছে মাত্র। সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের আনন্দ ঘটে; তাহা বেশ বুঝা যায়; কেন না এই আনন্দ জীবনের অনুকূল; অতএব এই আনন্দানুভব শক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়া তাহার নেশাতেও মানুষের একরকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের কোন লাভ নাই, বরং লোকসান আছে; এই আনন্দলাভ-শক্তি জীবনরক্ষার প্রতিকূল; এবং মনুষ্য পদে পদে এই অহিতকর প্রবৃত্তির জন্য অনিষ্ট ভোগ করিতেছে। অথচ আর পাঁচটা হিতকর প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অনিষ্টকর প্রবৃত্তিটাও মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই। মানুষের সৌন্দর্য্য-

নুরাগও এইরূপ একটা নেশা; ইহার কোন উপকারিতা নাই; তবে অন্য নেশার মত জীবনের বিশেষ অপকার করে না; বরং সময়ে সময়ে আনন্দ জন্মাইয়া উপকার করে। অন্যান্য নেশার মত এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্বলাভের আনুষঙ্গিক আগন্তুক ফলমাত্র। ইহার জন্য মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যাহার ছেলেখেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, যে বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই, এবং বিরহজ্বরসন্তপ্ত হইয়া চন্দ্র-কিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রকৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে একটু ইতস্ততঃ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুক্কুটের মাথায় শিখার মত, যেমন পুরুষ মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোঁপ গজাইয়াছে,—ডারুইন হয়ত বলিবেন যাহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরঞ্জন, তথাপি যাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে,—তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই অনর্থক সৌন্দর্য্য-নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে। তবু ভাল যে সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কারবার, এবং ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা মনুষ্যে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি, বা সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার প্রয়াস পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। এই জন্যই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কোন জৈবিক নিয়মে সৌন্দর্য্যবোধের

উৎপত্তি বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ফল কিন্তু সন্তোষজনক হয় নাই। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অক্ষমতা স্বীকারের পূর্ব্বে এইখানে একটু ভাবিবার আছে। জীবনরক্ষায় যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বলা কঠিন। একটা কথা আছে, যে ভাবের প্রমাণ অপেক্ষা অভাবের প্রমাণ সর্ব্বদাই কষ্টসাধ্য। এই বিষয়টাতে আমার কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য্যবুদ্ধিও মানবজীবনে আনুকূল্য করে না, একবারে এত বড় কথাটা বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত; এবং যদি মানবজীবনে ইহার কোন উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনি ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই বিষয়টা যে এখনও আলোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

মাক্সওয়েলের ভূত

মাক্সওয়েলের ভূত অর্থে কেহ মনে না করেন, মাক্সওয়েল স্বয়ং ভূত; উহার অর্থ মাক্সওয়েলের সৃষ্ট ভূত।

সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। স্পিরিচুয়ালিষ্টরা ভূতের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু কেহ ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই। জেমস ক্লার্ক মাক্সওয়েল পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি একজাতীয় ভূতের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; সেই ভূতই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতিপাদ্য।

প্রদীপ জ্বালিয়া আমরা রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকি; এবং তজ্জন্য কাঠ, তেল, চর্ব্বি পোড়াইয়া আলো জ্বালি। একালের লোকে গ্যাস পোড়ায়, অথবা কয়লা পোড়াইয়া বা দস্তা পোড়াইয়া বিজুলি বাতি জ্বালায়। মানুষে মনে করে, এ একটা প্রকাণ্ড বাহাদুরি; অগ্নির আবিষ্কারের মত এত প্রকাণ্ড আবিষ্কারই বুঝি আর কখনও হয় নাই। সূর্য্যদেব সন্ধ্যার পর সরিয়া পড়িয়া আমাদিগকে আলোকে বঞ্চিত করেন; কিন্তু আমরা কেমন সহজ উপায়ে ঘোর অন্ধকারেও আমাদের কাজ সারিয়া লই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ কথা নহে, বিশেষতঃ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে।

আমরা অবলীলাক্রমে নিশ্চিন্তভাবে জাপানী দিয়াশলাই ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালি, এবং একটা উৎসবের উপলক্ষ পাইলে হাজার হাজার মশাল ও প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ও নগর আলোকিত করিয়া কতই আনন্দে উৎফুল্ল হই। সাধারণ পাঠকবর্গ কিন্তু জানেন না, একালের জনকয়েক বৈজ্ঞানিকের নিকট এই দীপশিখার মত যন্ত্রণাদায়ক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

কথাটা নিতান্ত হেঁয়ালি গোছের হইল, কিন্তু কথাটা প্রকৃত। বাস্তবিকই একালে যে ব্যক্তির মজ্জা বৈজ্ঞানিক ধাতুতে নির্ম্মিত, যিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক, প্রদীপের আলোকে কখনই তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না।

প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া দেয়, তুমি বড় নির্ব্বোধ অথবা তোমার ভবিষ্যতের চিন্তা আদৌ নাই; তোমার চোখের সম্মুখে এত বড় সর্ব্বনাশটা ঘটিতেছে; তাহার নিবা-

রণে তোমার আজ পর্য্যন্ত ক্ষমতা জন্মিল না ; ধিক্ তোমার জ্ঞানগর্ব্বকে, ধিক্ তোমার উনবিংশ শতাব্দীকে। দীপশিখার এই নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের নিকট তীব্র শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয় ; তাঁহাকে যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে হয়।

এখনও বোধ হয় হেঁয়ালি ভাঙিল না! কিন্তু এই হেঁয়ালি ভাঙিবার প্রয়াস করিলেই কবিত্ব ছাড়িয়া অকস্মাৎ বিকট গদ্যে অবতরণ করিতে হইবে।

কথাটা এই। একটা গরম জিনিষের কাছে বা পাশে একটা ঠাণ্ডা জিনিষ রাখিলে সেই ঠাণ্ডা জিনিষটা একটু গরম হয়, আর সেই গরম জিনিষটা একটু ঠাণ্ডা হয় ; বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, খানিকটা তাপ গরম জিনিষ হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইহাকে তাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ধর্ম্ম বলিলেও চলিতে পারে। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে স্বভাবতই নীচে নামে, তাপও সেইরূপ স্বভাবতঃ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। ইহা অত্যন্ত পুরাতন ও চিরন্তন ঘটনা ; ইহাতে কোনই নূতনত্ব নাই। জল যেমন স্বভাবতঃ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামে, আপনা আপনি কখনও নীচে হইতে উচ্চে যায় না, তাপও সেইরূপ কখন আপনা আপনি ঠাণ্ডা জিনিষ হইতে গরম জিনিষে যায় না : পাঠক কখন যাইতে দেখিয়াছেন কি ? যদি দেখিয়াছি বলেন, তাহা হইলে আপনাকে জল-উচুর দলে ফেলিব।

কিন্তু এরূপ সম্ভব হইলে মন্দ হইত না। মনে কর, কয়লার উনানের উপর এক ঘটি জল রাখিয়াছি। নিয়ম এই যে গরম কয়লা হইতে তাপ নির্গত হইয়া ঠাণ্ডা জলে যায়, ও ঠাণ্ডা জলকে আস্তে আস্তে গরম করিয়া তোলে। যদি ইহার বিপরীত ঘটনা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ঠাণ্ডা জল হইতে তাপ বাহির হইয়া গরম কয়লায় ক্রমে প্রবেশ

করিত, ও জলটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া শেষটা বরফে পরিণত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়লার জ্বালে জল ঠাণ্ডা করিয়া বরফ উৎপাদনের প্রণালী এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের বর্ত্তমান নিয়মই এই।

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পুরঃসর এই নিয়মটা অন্ততঃ বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়া রাখিবেন।

আর একটা কথা। তাপ নামক নিরাকার বা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থটা যে নিতান্তই কাজের জিনিষ, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য হইবে; বিশেষতঃ এই ষ্টীম এঞ্জিনের যুগে। কলিকাতায় তাড়িত প্রবাহযোগে ট্রাম গাড়ি চালাইবার প্রস্তাব হইতেছে শুনা যায়। কিন্তু তাড়িত প্রবাহের মূল কোথায়? কতকটা কয়লা পোড়াইয়া তদুৎপন্ন তাপকে তাড়িত প্রবাহে বিকৃত করিয়া পরে তদ্দ্বারা ট্রাম গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা হইবে। এবং হয়ত সেই তাপেরই কিয়দংশ হইতে সহরের রাজপথগুলি রাত্রিকালে আলোক পাইবে, গৃহস্থেরা আপন আপন ঘরে দীপ জ্বালিবে ও রান্না করিবে, আফিস ঘরের পাখাটানা হইবে, ময়দা ও শুরকির কল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। অতএব তাপ পদার্থটা কাজের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাপ হইতে আমরা কাজ পাই কিরূপে? একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

একটা উদাহরণ লও। মনে কর বর্ত্তমান কালের ষ্টীম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র তাপকে কাজে পরিণত করিয়া, তদ্দ্বারা জল তোলে, গাড়ী টানে, জাহাজ চালায়, ময়দা পিষে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রণালীটা কিরূপ? কয়লা পোড়াইয়া তাপ জন্মান হয়। সেই তাপের কিয়দংশ—কিয়দংশমাত্র—জল গরম করিতে যায়। গরম জল হইতে গরম বাষ্প উঠিয়া ঠাণ্ডা জলে গিয়া মিশে ও ঠাণ্ডা হয়;

খানিকটা তাপ সেই বাষ্পের সঙ্গে গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যায়। এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার সময় সেই তাপের কিয়দংশ—আবার কিয়দংশমাত্র—কাজে পরিণত হয়। এখন এই কথা দুইটি মনে রাখিতে হইবে—(১) তাপ গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় তাহা হইতে কাজ পাওয়া যায়। গরম জল যত গরম হইবে আর ঠাণ্ডা জল যত ঠাণ্ডা হইবে, তত বেশী কাজ পাওয়া যাইবে। গরম জল যদি বেশী গরম না হয় আর ঠাণ্ডা জলও যদি বেশী ঠাণ্ডা না হয়, অর্থাৎ উভয় জলই যদি সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলে কাজ পাইবার আশা নাই। (২) তাপের কিয়দংশমাত্র কাজে লাগে—সমস্ত তাপটা কোন রকমেই কাজে লাগে না; যেমনি যন্ত্র তৈয়ার কর না কেন, সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগাইতে কোন মতেই পারা যায় না। গরম জল যদি ফুটন্ত জলের মত গরম হয়, আর ঠাণ্ডা জল যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলেও গরম জল হইতে যতটা তাপ আসে, তাহার সিকি ভাগও অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র যোগেও কাজে লাগে না। এক্ষণে যে সকল যন্ত্র লইয়া আমরা কারবার করি, তাহাতে সিকি দূরের কথা, সিকির সিকি কাজে লাগিলে যথেষ্ট। বাকি সমগ্র তাপটার এক রকম অপব্যয় হয় মাত্র।

কাজেই তাপ থাকিলেই কাজ পাওয়া যায় এমন নহে; সেই তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবার সময় তাহাকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু তখনও আবার সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগান চলে না; তার কিয়দংশমাত্র, অতি সামান্য অংশমাত্র কাজে লাগে, বাকি সমস্তটা গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে চলিয়া যায়।

এখন বোঝা যাইবে, কেবল তাপ খানিকটা পাইলেই বিশেষ লাভ হয় না; সেই তাপটা আবার গরম জিনিষে থাকা চাই; যত গরম জায়গায় থাকিবে, ততই তাহার কার্য্যোৎপাদন ক্ষমতা অধিক

থাকিবে ; আর যত ঠাণ্ডা জায়গায় থাকিবে, ততই তাহার কাজ করিবার ক্ষমতা কম থাকিবে। মনে কর তোমাকে কেহ এক সের ফুটন্ত জল দিল, আর একসের বরফের মত ঠাণ্ডা জল দিল ; এখন এই দুই রকম জল দুইটা স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া ফুটন্ত জলের তাপ ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় উপযুক্ত যন্ত্রযোগে উহার কিয়দংশ,—দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক,—কাজে পরিণত করিতে পারিবে। বাকি চৌদ্দ আনা কি পোনের আনা ঐ ঠাণ্ডা জলে গিয়া জলকে একটু গরম করিয়া দিবে। যাহাই হউক, দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক, কিছু কাজ এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই এক সের ফুটন্ত জল ও এক সের ঠাণ্ডা জল, দুই স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্র মিশাইয়া ফেল ; দুই সের মাঝামাঝি রকম গরম—না-গরম না ঠাণ্ডা-জল পাইবে ; এক্ষেত্রে জলেরও এক কণা নষ্ট হইবে না, তাপেরও এক কণা নষ্ট হইবে না ; কিন্তু কাজ এক আনা দূরের কথা, এক ক্রান্তিও পাইবার আশা রহিবে না।

এক কথায় এইরূপ দাঁড়ায়। কোন দ্রব্যের যদি একাংশ উষ্ণ থাকে, অন্য অংশ শীতল থাকে, তাহা হইলে উষ্ণাংশ হইতে শীতলাংশে তাপ চলিবার সময় তাহা হইতে কতক কাজ মিলিতে পারে। কিন্তু সেই দ্রব্যের সকল অংশই যদি সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপ এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেও চাহে না, তাহা হইতে কাজ পাইবারও আশা থাকে না।

ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্রটাকে ত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রটার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। বিশ্বযন্ত্রের পক্ষেও নিয়ম স্বতন্ত্র নাই। যে নিয়মে বাষ্প যন্ত্র চলে, এখানেও সেই নিয়মেই তাপ হইতে কাজ হয়। বিশ্ব যন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সকল স্থল সমান উষ্ণ নহে। উদাহরণ সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হইতে হইবে না। ঐ সূর্যটা কি ভয়ানক

গরম, আর এই পৃথিবীটা তাহার তুলনায় কি ভয়ানক ঠাণ্ডা। আর তাপ স্বভাবতই গরম সূর্য্য হইতে ঠাণ্ডা পৃথিবীতে আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রতিদিন সূর্য্য হইতে যে তাপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে লাগে। কতকটা কাজে লাগে সন্দেহ নাই, কেননা সেই কতকটার জোরেই আমাদের অশ্বো ধাবতি, বায়ুর্বাতি, জলং পততি, গৌঃ শব্দায়তে; এমন কি এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় সকল কার্য্যই তাহারই বলে নির্ব্বাহিত হইতেছে; কিন্তু বাকি যে তাপটা কোন কাজেই লাগে না, কেবল উষ্ণরশ্মিমণ্ডিত সূর্য্য হইতে শীতলা বসুন্ধরায় যায়, ও শীতলা বসুন্ধরা হইতে শীতলতর আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, কাহারও কোন কাজে লাগে না, কেবল অপচয়ে ও অপব্যয়ে যায়, তাহার তুলনায় উহার পরিমাণ কত সামান্য।

হা হতোঽস্মি, যাহা যায় তাহা আর আসে না। কত কবি ও কত দার্শনিক কালস্রোতের ও জীবনস্রোতের অপচয় দেখিয়া হা হুতাশ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই তাপস্রোতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ এক ছত্র কবিতাও লিখিল না, কোন পণ্ডিতও একটা তত্ত্ব কথার উপদেশ দিল না।

হায়! এই সংসারের নিয়মই এই যে যাহা যায়, তাহা আর ফিরে না। তাপ যাহা গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়, তাহা আর ফিরে না। কেননা, তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নমুখ, তাপ তেমনি স্বভাবতঃ শৈত্যপ্রবণ,—ইহার স্বাভাবিক গতিই উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থানে; একবার শীতল পদার্থের ক্রোড়ে স্থান পাইলে আর উষ্ণ পদার্থে সহজে আসিতে চায় না। মানুষে চেষ্টা করিয়া আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিয়া তোলে, সেইরূপ শক্তি ব্যয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা হইতে গরমে তুলিতে পারে বটে; কিন্তু এমনি প্রকৃতির বিধান, যে এক গুণ তাপকে

উষ্ণ-স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র তিন গুণ তাপ শীতল স্থল হইতে শীতলতর স্থলে নামিয়া যায়।

ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাপ ক্রমেই উষ্ণ হইতে শীতল দ্রব্যে চলিতেছে; ক্রমেই তাপের কার্য্যোৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস হইতেছে; যাহা ছিল গরম, তাহা শীতল হইতেছে; যাহা ছিল শীতল, তাহাও হয়ত গরম হইতেছে। কিন্তু ভবিতব্য অবশ্যম্ভাবী; শেষ পর্য্যন্ত জগতে বর্ত্তমান সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবেক। জগতের এখানটা গরম, ওখানটা ঠাণ্ডা, এরূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে না, সর্ব্বত্রই সমান গরম বা সমান শীতল হইয়া যাইবে। তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না; সেই তাপ হইতে কোন কাজ উৎপাদন করিবার কোন উপায় থাকিবেক না। জগৎযন্ত্র তখন নিশ্চল হইবে; বিশ্বঘটিকার পেণ্ডুলম তখন স্পন্দহীন হইবে; চাকাগুলি আর নড়িবে না; কাঁটা থামিয়া যাইবে। সেই দিন জগতের মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয় নিবারণে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই—তবে তাপের অপচয় যথাসাধ্য নিবারণ করিয়া সেই শেষের ভয়ঙ্কর দিন যৎকিঞ্চিৎ বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে আছে বটে। কিন্তু মনুষ্য কি সেই অপচয়ের নিবারণে চেষ্টা করে? ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত বৈজ্ঞানিক উন্নতি এই তাপের অপচয় প্রতিবিধান করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছে কি? বরং তাহার বিপরীত কাণ্ডই দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিদেবী কতকটা যেন দয়াপরবশ হইয়া যে মৃদঙ্গাররাশি ও কেরোসিন তৈলের রাশি অপরিণামদর্শী মনুষ্যের চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভমধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্য তাহার সন্ধান পাইয়া সেই যুগান্তসঞ্চিত মহামূল্য সম্পত্তি নির্ব্বিকারচিত্তে তুলিয়া আনিতেছে ও আপনার ক্ষণিক সুবিধা ও ক্ষণিক আরামের জন্য ভবিষ্যবংশধরগণকে

বঞ্চিত করিয়া তাহাকে শীতল বায়ুতে পরিণত করিতেছে। এঞ্জিনিয়ারের উদ্ভাবিত সংখ্যাতীত অসম্পূর্ণ যন্ত্রযোগে এই নৈসর্গিক শক্তিসমষ্টি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপচিত হইয়া যাইতেছে; তজ্জন্য কেহ পরিতাপ করে না, কেহ আক্ষেপও করে না। কেবল দুই একজন বিজ্ঞানসেবক মনুষ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিহ্বল হন ও সেই সঙ্গে জগতের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হন মাত্র।

এতক্ষণে বোধ হয় হেঁয়ালি ভাঙিল; দীপশিখার বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর চার্জ খাড়া করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপক্রমণিকা করা গিয়াছে, তাহার কতকটা তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে আমরা চাই কিঞ্চিৎ আলোক, যৎকিঞ্চিৎ শক্তি। আকাশ বা ঈথর মধ্যে কিয়ৎকাল ধরিয়া গোটাকত কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ চলে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়া, গ্যাস পোড়াইয়া, দস্তা পোড়াইয়া, সহস্র গুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমরা একখানা হাত পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপায় একটা অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলে। চাই আমরা চারি পয়সায় ময়দা ভাজিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে; আমাদের পাচক ঠাকুর বাক্স ভাঙ্গিয়া হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করেন। আচমনে এক গণ্ডূষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহ দ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্য একটা পূর্ত্ত বিভাগের খরচ জোগাই। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন; কিন্তু এই প্রহসনের পরিণাম যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে ইহাতে হাস্যরসের অপেক্ষা করুণরসের সঞ্চার হওয়াই উচিত।

ভরসা করি এখনও কোন সংস্কারক উপস্থিত হইয়া মনুষ্যজাতিকে সমস্ত কলকারখানা এঞ্জিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন; রাত্রিতে অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন, এবং রন্ধনার্থ ব্যবহৃত চুল্লীর ও উনান গুলির অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া মনুষ্যজাতিকে সত্যযুগোচিত আমান্ন ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছুকাল বিলম্বিত হইতে পারিবেক।

বিলম্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। প্রকৃতি সর্ব্বদা বিলাসী ধনিসন্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি দুই হাতে অজস্র অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা যায় না। প্রকৃতিকে এই অপব্যয়ে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিবে, এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ অসাধ্য।

মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মাক্সওয়েলের কল্পিত ভূতের অসাধ্য নহে। যদি আমরা কোনরূপে সেই পিশাচটিকে কোনরূপে সর্ষপাদি প্রয়োগে বশীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বযন্ত্রটা আরও কিছুদিন টিকিলেও টিকিতে পারে; এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতাও হয়ত যত্ননির্ম্মিত যন্ত্রটিকে অকালে অচল হইতে দেখার যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

সেই ভূতের সম্পাদ্য কার্য্যটা এইরূপ। জগতের বর্ত্তমান বিধান এই যে খানিক গরম জল ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল একত্র মিশাইলে দুই সমান গরম হইয়া পড়ে; গরম জলটা একটু ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা জলটা একটু গরম হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎটাকে উপস্থিত মহা-প্রলয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যের দর-কার। খানিকটা না-গরম না-ঠাণ্ডা "নাতিশীতোষ্ণ" জল একটা পাত্রে রাখিলাম; একটু পরে গিয়া যেন দেখিতে পাই পাত্রের অর্দ্ধেক জল

ফুটিতেছে; বাকি অর্দ্ধেক বরফ হইয়া রহিয়াছে। তাপ আপনা হইতেই সরিয়া গিয়া জলের একাংশ হইতে অন্য অংশে গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব—এই ব্যাপারটা সাধ্যে পরিণত করিতে হইবে। মাক্সওয়েল নিজে ইহা পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট ভূতে ইহা পারে; কিরূপে পারে, পরে বলিতেছি।

একটা উদাহরণ লইয়া বুঝাইলে সহজ হইবে। মনে কর, দুইটা ঠিক সমান আয়তনের কুঠরির মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান আছে ও সেই দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র জানালা আছে। জানালাটা অতি ছোট; এত ছোট যে বিনা আয়াসে কেবল ইচ্ছামাত্রে খোলা যায় বা বন্ধ করা যায়। কুঠরি দুইটার অন্য কোথাও জানালা দরজা বা কোন ফাঁক পর্য্যন্ত নাই। একটা কুঠরিতে বাতাস পুরিয়া রাখিয়াছি; আর একটা কুঠরিতে বায়ু পর্য্যন্ত নাই, উহা একেবারে শূন্য। প্রথম কুঠরিতে যে বায়ুটা আছে, মনে কর তাহা চৈত্র বৈশাখ মাসের বায়ুর মত উষ্ণ। এখন মাঝের দেওয়ালের জানালা খুলিয়া দিবামাত্র খানিকটা হাওয়া এ কুঠরি হইতে ও কুঠরিতে যাইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উভয় কুঠরি বায়ুপূর্ণ হইয়াছে। যে বায়ু একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন দুইটা ঘর অধিকার করায় তাহার চাপ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উষ্ণতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ব্বে একটা ঘরে বায়ু যেমন গরম ছিল, এখন সেই বায়ু দুই ঘরে আসিয়াও তেমনি গরমই রহিয়াছে। এইরূপে এক ঘরের বায়ু অন্য শূন্য ঘরে চালাইয়া দিলে তাহার উষ্ণতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জূল সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক বিধান।

বায়ুর উষ্ণতার কারণ কি জান? বায়ুর অণুগুলি অনবরত এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে; যাহার গায়ে লাগে, তাহাকেই ধাক্কা দেয়; যত জোরে ধাক্কা দেয়, ততই বায়ু গরম বোধ হয়। একটা ছোটখাট

কুঠরিতে কত কোটি কোটি বায়ুর অণু আছে। প্রত্যেক অণুই ইতস্ততঃ বেগে ছুটিতেছে; সে বেগই বা আবার কি ভয়ঙ্কর! যে বায়ু লইয়া আমরা গৃহপূর্ণ করিয়াছি, তাহার বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল। আমাদের রেলের গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল হিসাবে চলে; আর এই বায়ুকণিকাগুলি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল, ঘণ্টায় প্রায় বারশ মাইল বেগে ছুটাছুটি করে। আবার উষ্ণতা যত বাড়ে, এই বেগও ততই বাড়ে।

মনে করিও না, যে সকল অণু ঠিক একই বেগে চলে। উপরে যে মিনিটে বিশ মাইল বেগের কথা বলিলাম, তাহা একটা গড় হিসাবে। কোন অণু হয়ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা হয়ত বিশ মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে। তবে সকলের বেগ গড়ে বিশ মাইল। উষ্ণতাবৃদ্ধিসহকারে বেগের এই গড়টা বাড়িয়া যায় ও উষ্ণতা কমিলে গড়টা কমিয়া যায় মাত্র।

এখন মনে কর, এই বায়ু একটা কুঠরিতে আবদ্ধ আছে; ও তাহার কোটি কোটি অণু গড়ে বিশ মাইল হিসাবে প্রতি মিনিটে এদিক ওদিক ছুটিতেছে, কুঠরির দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে ও ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য মুখে ছুটিতেছে। বেগ গড়ে বিশ মাইল; কাহারও বা বিশ মাইলের বেশী, কাহারও বিশ মাইলের কম; গড়ে বিশ মাইল। এখন মনে কর, আমাদের ভূতটি সেই জানালার কাছে বসিয়া আছেন এবং ইচ্ছামত জানালা খুলিতেছেন বা বন্ধ করিতেছেন। তাঁহার দেহখানি অতি সূক্ষ্ম; দেবযোনি কি না! তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট। আমাদের কি সাধ্য যে বায়ুর অণু পরমাণু লইয়া কারবার করি? কিন্তু সেই সূক্ষ্মদেহ পিশাচ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক অণুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণুকে তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে পারেন। এখন

মনে কর, তিনি গবাক্ষদ্বারে বসিয়া নিবিষ্টমনে বায়ুর অণুগুলির গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছেন; যে অণু বিশ মাইলের অধিক বেগে গবাক্ষদ্বারে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাকে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া পাশের কুঠরিতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, আর যে অণুটা মন্দ গতিতে অর্থাৎ বিশ মাইলের কম বেগে আসিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ "প্রবেশ নিষেধ" বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্রসহকারে বিদায় দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কি দেখিবে? পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অণুগুলি জমিতে থাকিবে; তাহাদের সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক; কাজেই গড়ে বেগ বিশ মাইলের অধিক হইবে। আর অন্য গৃহে দ্রুতগামী অণুর সংখ্যা ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অণুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে; সেখানে অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কমিয়া যাইবে। আবার বেগের বৃদ্ধির ফল বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি; আর বেগের হ্রাসের ফল বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস। কাজেই কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, একটা কুঠরির বায়ু ক্রমেই শীতল হইতেছে ও অন্য গৃহ ক্রমেই উষ্ণতর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। দুটি ঘরের বায়ুর উষ্ণতা তফাত হইয়া গেল, অথচ পিশাচ মহাশয়কে শক্তি খরচ করিতে হইল না; কেন না, তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির সঞ্চালনে ক্ষুদ্র গবাক্ষের ক্ষুদ্র কপাটখানির নাড়াচাড়ায় শক্তি ব্যয়ের অপেক্ষাই রাখে না। তাঁহার দেহখানি যেমন ইচ্ছা সূক্ষ্ম মনে করিতে পার। যে কপাটখানি তিনি নাড়িতেছেন, তাহাও যত ছোট হোক, তাতেও ক্ষতি নাই। অত ছোট কপাট খুলিতে বা বন্ধ করিতে আর শক্তি খরচ কোথায়? কিন্তু ফলে হইল কি? ছিল একটা ঘরে সর্ব্বত্র সমান গরম খানিকটা হাওয়া; এখন পাওয়া গেল দুইটা ঘরের একটায় গরম হাওয়া, আর একটায় ঠাণ্ডা হাওয়া। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে একটা এঞ্জিন যোগে উষ্ণ বায়ুর তাপ শীতল বায়ুতে চলিতে দিয়া সেই তাপের কিয়দংশ কাজে লাগাইতে পার। আমাদের যাহা অসাধ্য, ঐ ভূতের তাহা সাধ্য।

তিনি মনে করিলে যে কোন দ্রব্যের দ্রুতগামী অণুগুলিকে একধারে ও মন্দগামী অণুগুলিকে অন্য ধারে গোছাইয়া রাখিয়া এক ধার তপ্ত ও অন্য ধার ঠাণ্ডা করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া জগদ্‌যন্ত্রের বর্ত্তমান বিধানটাই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারেন।

এই দেবযোনি ক্লার্ক মাক্সওয়েলের মানস-পুত্র। ব্রহ্মার মানস-পুত্র হইতে জগতে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই অধ্যাপকের মানস-পুত্র, ব্রহ্মা আমাদের যে উপকারটুকু করেন নাই, তাহা সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দেবযোনিটির সহিত কুটুম্বিতা সংস্থাপনের ও তাঁহার বশীকরণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। সুতরাং আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

দুঃখ-ব্যাধি-প্রপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধিপ্রমোচনের জন্য ভগবান্ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বৈদ্যরাজের স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, মানবজাতির তৃতীয়াংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা নিদান-শাস্ত্রে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করেন। ভব-ব্যাধি-প্রমোচক জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীব-ব্যাধির কারণ স্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই ;—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ।

এই নিদানতত্ত্বের বা প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা লইয়া বিবিধ

মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ আচার্য্যেরা সকলে একমতে ইহার ব্যাখ্যা করেন না। হীনযান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা মহাযানীদের সহিত ঠিক্ মিলে না। মহাযানীদের মধ্যেও সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যা আছে, বোধ হয় না। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের বাহিরে অন্যান্য দার্শনিকেরাও ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরাও একটা শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা সচরাচর যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের এটা প্রথা। এই প্রচলিত প্রথার সমালোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। তবে পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা সর্ব্বস্থানে শিরোধার্য্য না করিলে বে-আইনি কাজ হইবে না, এই ভরসায় বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

বৌদ্ধ নিদানতত্ত্বের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে, দ্বাদশটি নিদানের অর্থ বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য নামকয়টি পরিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের অর্থ ঠিক না বুঝিলে বিচারবিভ্রাট ঘটে। এক একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমরা বাঙ্গালা শব্দের অপেক্ষা ইংরাজি শব্দের অর্থ ভাল বুঝি। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবে মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকবর্গ এই রুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার মার্জ্জনা করিবেন।

১। অবিদ্যা—এই শব্দটি আমাদের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রচলিত। উহা কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়া নহে। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান; জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। মোটের উপর সহজ হইল। কিন্তু অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে কতটুকু তফাত, স্থির করা একটু দুষ্কর। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বোধ হয় বলিতে চাহেন, জগতের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা প্রকৃত সত্য জ্ঞান নহে; তাহা একটা মহাভ্রম। উহা জ্ঞান নহে, উহা ভ্রান্ত জ্ঞান। একালের অজ্ঞেয়বাদী অথবা আগনষ্টিক বলেন, জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না, আমাদের

জানিবার উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার একটু মতভেদ আছে। আগ্নষ্টিকদের মধ্যেও আবার সম্প্রদায়ভেদ আছে। হক্স্‌লী আগ্নষ্টিক নামটির সৃষ্টিকর্তা। তিনি ঐ নামে আপনার পরিচয় দিতেন। লোকে স্পেন্সারকেও আগ্নষ্টিক বলিয়া জানে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ে ঠিক একই রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্সার বলেন জগতের খানিকটা অংশ, জগতের মূল রহস্য, মূল তথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ, আমাদের চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। হক্স্‌লী কোন জাগতিক তথ্যকে একেবারে অজ্ঞেয় বলিতে সাহস করিতেন না; তবে ইহা আমি সম্প্রতি জানি না, উহা আমি সম্প্রতি জানি না, বহুস্থলে এই মত প্রকাশ করিতেন। যে কোনও দুর্ভাগ্য জীব সেই সকল স্থলে জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সেই স্পর্দ্ধা হক্স্‌লীর প্রচণ্ড মুদ্গরাঘাতে জীর্ণ পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে স্পেন্সারকে অজ্ঞেয়বাদী আর হক্স্‌লীকে অজ্ঞানবাদী বলা যাইতে পারে। ভ্রান্তিবাদের ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন কঠিন কাজ। বৌদ্ধ ও বৈদান্তিকের অবিদ্যাবাদকে ভ্রান্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগৎ কি আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ; জগতের যে জ্ঞান টুকু আছে, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান, ইহা ভ্রান্তিবাদ। এই দুই মতের মধ্যে কত টুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিসংবাদ বাধাইবার সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই।

ফলে উভয়ের মধ্যে কোনও সীমাজ্ঞাপক রেখা টানা কঠিন। প্রকৃত সংবাদ জানিনা বলিলেই বুঝায় যে সংবাদ জানি, তাহা মিথ্যা; সুতরাং অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে। সে যাই হউক, বৌদ্ধদর্শনের অবিদ্যা অর্থে ভ্রান্তি মনে করিলে গুরুতর দোষ ঘটিবে না।

২। সংস্কার—এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থগ্রহ দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনে সংস্কার শব্দের আর এক স্থানে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধ দর্শনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয় পরে বলা যাইবে। নিদান মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্ধমধ্যে গৃহীত সংস্কার উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, বোধ হয় না। সেই সংস্কার কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গোটা কতক উদাহরণ লওয়া যাক্।

সংস্কারসমূহের মধ্যে বৌদ্ধাচার্যগণের মতে বায়ান্নরূপ প্রকারভেদ বর্ত্তমান। বায়ান্নটা নামের উল্লেখে সম্প্রতি দরকার নাই। কতকগুলির নাম উল্লেখ করিলেই, সংস্কার কি, তাহা কতক বুঝা যাইবে। একটা সংস্কারের নাম স্পর্শ—বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ; আর একটার নাম বেদনা,—স্পর্শ ফলে উৎপন্ন অনুভূতি বা sensation ; আর একটা চেতনা—perception এর কাছাকাছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সংস্কার যথা,—স্মৃতি, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মোহ, লজ্জা, করুণা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি। ফলে মানসিক ব্যাপার মাত্রই,—মনুষ্যের যে কিছু চিৎবৃত্তি বর্ত্তমান,—ইংরাজিতে বলিলে sensations, cognitions, volitions, emotions এ সমস্তই, সংস্কার। মনে কর সহসা আমার সম্মুখে একটা সাপ উপস্থিত। এস্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে ? একটা দীর্ঘ চাকচিক্যশালী বক্রগতিশীল পদার্থের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পর্শসহকারে তাহার রূপের বেদনা বা প্রতীতি, এবং উদ্যত সবেগাক্ষিপ্ত ফণা হইতে তীব্র ছোঁ শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ সহকারে এই শব্দের বেদনা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেকে সর্পবুদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যবিচার বা বিতর্ক,—তার পর পলায়ন-চেষ্টার প্রণোদক শঙ্কা অর্থাৎ একটা মোহ, এবং পরক্ষণেই সবেগে পলায়নে প্রবৃত্তি।

এখন এই স্পর্শ হইতে পলায়নে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যত কিছু মানসিক

ব্যাপার, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। ইংরাজিতে আজ কাল psychosis নামে একটা শব্দের ব্যবহার হইতেছে, সেই psychosis মাত্রকে সংস্কারের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে কিনা বিবেচ্য। রূপ একটা সংস্কার। রস সংস্কার। শব্দ সংস্কার। অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার। ভয়, মোহ প্রভৃতিও সংস্কার। এই সকল সংস্কার একত্র যোগে আমার অন্তঃ-শরীর। অন্তঃ-শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যে সকল টুকরা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। কেননা, রূপ, রস, গন্ধ, শীত, গ্রীষ্ম, জ্বালা, যাতনা, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতীতি, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, চেষ্টা, প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেবল সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া সমষ্টি করিলেই আমার অন্তঃশরীর সম্পূর্ণ হয় কি? বোধ হয় ঠিক হয় না। আর একটার দরকার; সেটা সংস্কারের অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ; তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্ত্তী তৃতীয় নিদান।

৩। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ইংরাজি নাম consciousness; এই বিজ্ঞানের সহিত সংস্কারগুলির সম্পর্ক কি? আমার মধ্যে যে সকল রূপ রস গন্ধ বুদ্ধি স্মৃতি প্রতীতি শোক হর্ষ লজ্জা ভয় প্রভৃতি আছে, তাহারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধশূন্য, স্বস্বপ্রধান হইয়া বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে আমার বলিয়া জানিতে পারিতাম না। ঐ সকল ছাড়া আর একটা চিৎবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়া আনে, জড়াইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে বিন্যাস করে, সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার অন্তঃশরীর নির্ম্মাণ করে। নাপিত যখন ক্ষুরপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক

যখন তাঁহার ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কয়টিকে কাটিয়া লয়েন, তখন সে কেশ, সে অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি তখন যতই মমতার সহিত চাহিয়া দেখি না কেন, তাহারা আর আমার নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন করিতে পারি না, তখন সেই অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার থাকে না। সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার অন্তঃশরীরের অঙ্গস্বরূপ হইলেও, তাহারা যতক্ষণ যথাস্থানে বিন্যস্ত ও আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার হয় না। এই বিন্যাসের, সন্নিবেশের ও যথাবিহিত কার্য্যে বিনিয়োগের ভার যাহার উপর, তাহারই নাম বিজ্ঞান। সাপ দেখিলাম ও সাপের ছোঁ শব্দ শুনিলাম, এই দুই অসম্বন্ধ প্রত্যয় মাত্রে আমার সর্পবুদ্ধি জন্মে না। এই রূপের সহিত এই শব্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক; পূর্ব্বদৃষ্ট তাদৃশ রূপের ও পূর্ব্বশ্রুত তাদৃশ শব্দের স্মৃতি তাহার সহিত যুক্ত হইলে তবে সর্পবুদ্ধির উদ্বোধন হইবে। তবে আমি জানিব যে আমি একটা সাপ দেখিতেছি। এই সর্পদর্শন-রূপ ব্যাপারের অঘটন-ঘটনা-পটীয়ান্ কর্ত্তার নাম বিজ্ঞান।

৪। নামরূপ—এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা সচরাচর জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি, একটার নাম বাহ্যজগৎ, আর একটা অন্তর্জগৎ। আমার জড় শরীরটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে; প্রকৃত পক্ষে ইহা বাহ্য জগতের অন্তর্গত। সমগ্র জগতের দুই ভাগ,—চলিত ভাষায় একটাকে মনোজগৎ, একটাকে জড়জগৎ বলিলে অধিক দোষ হয় না। এই দুইটা জগৎ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়; ইহাদিগকে লইয়াই আমার কারবার; এই দুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় জগৎ নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলেও সমগ্র জগতের দুই ভাগ; একটা 'নাম'—স্থূল কথায় অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ; আর একটা 'রূপ'—স্থূল কথায়

বাহ্যজগৎ বা জড় জগৎ। নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমগ্র প্রত্যক্ষ জগৎ—বৌদ্ধ মতে উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। নাম এবং রূপ একত্র যোগে নাম-রূপ বা সমগ্র জগৎ। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় এই নামরূপ পদার্থ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি স্কন্ধ একত্র যোগে নাম। আর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ, এই চারিটি মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চম স্কন্ধ অথবা রূপ। বেদনা অর্থে sensation মাত্র অর্থাৎ অনুভূতি মাত্র বুঝিতে হইবে। সংজ্ঞা বলিলে বুদ্ধি বা প্রতীতি অর্থাৎ perception মাত্র বুঝিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধ সংস্কারের অর্থ উপরেই বলা গিয়াছে। এস্থলে সংস্কার অর্থে বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়িয়া অপর সমস্ত চিদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ শোক হর্ষ, ঘৃণা লজ্জা, ভয় ক্রোধ, স্মৃতি, বিচার বিতর্ক, চেষ্টা প্রয়াস, ইত্যাদি সমস্ত বুঝিতে হইবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কারশব্দ আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞা পর্য্যন্ত সংস্কারের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এস্থলে সংস্কারকে বেদনা ও সংজ্ঞা হইতে পৃথক্ করিয়া ধরায় একটু লজিকের দোষ ঘটে। কিন্তু সে দোষটুকু ছাড়িয়া দিলে, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিনের উল্লেখে সমুদয় চিত্তবৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের সহিত আবার বিজ্ঞান বা consciousness যোগ করিলে অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই প্রকাণ্ড মনোজগৎ, যাহা লইয়া আমাদের এত কারবার, সুখ-নিদ্রার সময়েও আমরা যে জগৎ ছাড়িয়া পলাইতে পারি না, বৌদ্ধ-দর্শনের ভাষায় সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নাম মাত্র। কেবল একটা নাম; ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না।

অন্তর্জগৎ ত একটা নামমাত্রে পরিণত হইল। বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎটাই বা আবার কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বালুকাসমান, যাহা

মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, যাহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রান্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রকাণ্ড জড়জগৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা রূপমাত্র—একটা প্রতীতি মাত্র ;—ইংরাজিতে বলিলে mere appearance বা phenomenon মাত্র। বৌদ্ধাচার্য্যকে যাহা ইচ্ছা গালি দিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না। আরও বলিয়া রাখা উচিত, বৌদ্ধগণ আত্মবাদীও নহেন। বেদান্তশাস্ত্র নামরূপ হইতে স্বতন্ত্র, নামরূপের অনধীন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধ সেই আত্মার অস্তিত্বও মানেন না। বৌদ্ধগণের মতে নামরূপই সব ; নামরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই ; জড়ও নাই, আত্মাও নাই। এ বিষয়ে বৌদ্ধের সঙ্গে এ কালের phenomenon-মাত্রবাদী হিউম প্রভৃতির বরং মিল আছে।

৫। ষড়ায়তন—ষড়ায়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ধরিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অকস্মাৎ একটি বাড়িয়া গেল কেন, তাহা বুঝা যাইবে। চলিত ভাষায় ইন্দ্রিয় অর্থে দেহগত যন্ত্র বা অবয়ববিশেষ বুঝায় ; কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে রূপরসাদি জ্ঞানসংগ্রহের শক্তির নাম ইন্দ্রিয়।

৬। স্পর্শ—অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ছয় ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য জগতের স্পর্শ বা আদান প্রদান সম্বন্ধ।

৭। বেদনা—বেদনা শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে ; সহজ ভাষায় বেদনা অর্থে উক্ত স্পর্শজাত অনুভূতি—রূপরস-গন্ধাদির অনুভূতি, বাহ্য জগতের অনুভূতি।

৮। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা অর্থে কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্পর্শ ও সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজিতে will, desire, appetite প্রভৃতি তৃষ্ণার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে যথোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; সেই বাহ্য জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার 'বেদনা' বা নানাবিধ নবনব রূপরসগন্ধের অনুভব ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখ পরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' অর্থাৎ জগতের প্রতি আসক্তি এবং সুখ-লাভের ও দুঃখ পরিহারের জন্য প্রযত্ন চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব'; এতক্ষণে ভ্রূণের মনুষ্যত্ব অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। এই সময়েই সে 'জাতি' লাভ করে অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে তাহার মনুষ্যজন্ম পূর্ণতা লাভ করে। তাহার এই জাতিলাভের অর্থাৎ পূর্ণ-মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী ফল জরামরণ।

এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিয়লজির তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এম্ব্রায়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ত্ব স্বীকার করিবে কি না, জানি না; কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে মার মহাশয়ের ততদূর ভয় পাইবার দরকার ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্য্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওলডেনবর্গ, রিস্ ডেবিডস্, চাইলডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল অবলম্বনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার ডাক্তার ওয়াডেল অজণ্ট গ্রামে গুম্ফা মধ্যে বৌদ্ধগণের অঙ্কিত ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ওয়াডেল সাহেব তিব্বত হইতেও ভবচক্রের ছবি আনিয়াছেন। ওয়াডেলের মতে এই ভবচক্রের চিত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের খাঁটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেই ছবির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ভবচক্র বা সংসারচক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চাকার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত, সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতি স্বরূপ অঙ্কিত আছে। এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। চক্রের নেমির বা পরিধির গায়ে বারটি ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশটি মূর্ত্তি মনুষ্যজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্ট্রকে চালিত করিতেছে। অন্ধ উষ্ট্র অবিদ্যান্ধ মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি। চালক স্বয়ং কর্ম্ম। ইহ জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মশলায় বা কর্দ্দমে মনুষ্যের অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। তৃতীয় ঘরে বানর-মূর্ত্তি মানুষের বিজ্ঞানের অপূর্ণতার ও অপকর্ষের পরিচয় দিতেছে। চতুর্থ ঘরে বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব বা 'নামরূপ' বাহ্য জগতের সহিত স্পর্শ লাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন' রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির ভিতর হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্য-জগতের প্রতি চাহিতেছে।

এই অবস্থায় মানব শিশুর সহিত বাহ্য জগতের কারবার রীতিমত আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতি মনুষ্যের সহিত জগতের, অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সংযোগ বা স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ; সাত চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দুঃখানুভবের পরিচয় দিতেছে। আটের ঘরে সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার প্রতিকৃতি। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে, সংসারের বৃক্ষ হইতে আগ্রহের সহিত ও আসক্তির সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সেইজন্য নয় ঘরে বৃক্ষের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদানের বা

সংসারাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি রূপে বর্ত্তমান। দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব' অর্থাৎ সংসারী মনুষ্যের গৃহস্থরূপের পরিচায়ক। মানুষ এখন ঘরকন্না পাতিয়া গোটা মানুষ হইয়াছে। তার পর একাদশ চিত্রে নবপ্রসূত শিশুসহ জননীর মূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থ বুঝাইতেছে। পুত্রোৎপত্তির পর মনুষ্যের জীবনে আর কোন কাজ নাই; তখন কেবল উপসংহারের অপেক্ষা। উপসংহার জরামরণ; কাজেই দ্বাদশ ঘরে 'বাঁশের দোলার' উপরে শয়ান শবমূর্ত্তি। মানুষের দশ দশার কথা শুনা যায়। এই ভবচক্র মানুষের মাতৃগর্ভে আবির্ভাব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দ্বাদশ দশা দেখাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন। অজণ্ট গুহামধ্যস্থ ভাস্কর-শিল্প বার তের শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তিব্বতে প্রসিদ্ধ আছে যে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্যতর স্থাপয়িতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর দাঁড়ায়। একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত; কাজেই এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অধিক কথা বলিতে শঙ্কা হয়। ব্যাখ্যাটা মোটের উপর দাঁড়ায় এই। আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা দশের উপর দুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ দশা। প্রতীত্য সমুৎপাদ মানুষের সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক বিবরণ। সেক্সপীয়ার মনুষ্য জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত উপমিত করিয়াছেন। মানবশিশুর 'mewling and puking in the nurse's arms" এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং বার্দ্ধক্যে "sans eyes, sans teeth" অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য সেক্সপীয়ারকে বুদ্ধদেবের অনেক উচ্চে বসাইবেন।

আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটা অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীর।

উহা মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক পরিণামের বিবরণ নহে বা সাংসারিক মানুষের দশ দশার বিবরণও নহে। মনুষ্যদেহ বা মনুষ্যের অন্তঃশরীর কিরূপে গঠিত, বর্দ্ধিত ও পরিণত হয় বা মনুষ্য সংসারে আসিয়া কিরূপ ধারাবাহিক দশাবিপর্য্যয় লাভ করে, তাহা বুঝান প্রতীত্যসমুৎপাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল বৌদ্ধদর্শন কেন, আমাদের সাংখ্যদর্শনের ও বেদান্তদর্শনের সৃষ্টিপ্রণালীর সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রণালী মিলাইতে যাওয়াই ভ্রম। অনেক পণ্ডিতে সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত মিলাইবার চেষ্টা করেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্যক্তির নিরূপণ আজকাল বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌর জগতের অভিব্যক্তি বুঝান আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদের প্রধান কার্য্য হইয়াছে। পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা ব্যস্ত। জীবকুলে অভিব্যক্তির প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ডারুইন কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র ব্যাকুল। মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক নিযুক্ত। এই সকল অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বা ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি নাম দিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে, তাহাকে দার্শনিক বা পারমার্থিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। সাংখ্য দর্শনে ও বেদান্ত দর্শনে যে অভিব্যক্তির বিবরণ আছে, তাহা এই দার্শনিক অভিব্যক্তি। আমার বোধ হয় বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদও সেই দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিবিধ মতভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও একটা বিষয়ে মিল আছে। তাহা এই অভিব্যক্তি ব্যাপার লইয়া। তাঁহারা

জগতের সৃষ্টি যে প্রণালীতে বুঝাইতে চাহেন, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; কেননা উভয়ত্র বিচার্য্য বিষয় স্বতন্ত্র; উভয়ত্র বিচারের প্রণালী স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের প্রণালীর সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রণালীকে মিলাইতে গেলে বিচার বিভ্রাটেরই সম্ভাবনা। এই দার্শনিক অভিব্যক্তি ব্যাপারটা কি বুঝিলেই প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আমরা লৌকিক বা ব্যাবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অন্তর্জগৎ বা mind ও বাহ্যজগৎ বা matter, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। জড়জগৎ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরোভাগে বিস্তৃত ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া তাহার সহিত কারবার ও দেনা-লেনা করিতেছে। আমার জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত জড় জগতের কারবার ও আদানপ্রদান চলে। বাহ্যজগৎ একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। জড়পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই, সেইরূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত। তদ্ব্যতীত অন্তর্জগৎও তাহার সুখদুঃখ শোকহর্ষ প্রভৃতি লইয়া আমার নিকট পরিচিত। এই উভয় জগতের স্বরূপ কি ও উহাদের সম্বন্ধ কি, কেন উহারা ওরূপ দেখায়, কেন উহাদের ওরূপ সম্বন্ধ হয়, বিজ্ঞান শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র উভয়েরই ইহাই বিচার্য্য। তবে বিজ্ঞান শাস্ত্র যে চোখে দেখেন, দর্শনশাস্ত্র ঠিক্ সে চোখে দেখেন না।

জগৎকে দুইটা ভাগ করা যায় এবং সেই দুয়ের মধ্যে কারবার দেখা যায়। জড় জগৎ যে রূপ লইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা বিবিধ গন্ধস্পর্শরসাদির সমষ্টিমাত্র। জড়জগতের এই গন্ধস্পর্শরসাদির সহিত আবার অন্তর্জগতের সুখদুঃখ ভয়ক্রোধাদির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায়। আগুনের স্পর্শে আমাদের জ্বালা

বোধ হয়; সূর্য্যালোকে আমাদের স্ফূর্ত্তি হয়; বাঘ দেখিলে আমাদের আতঙ্ক ঘটে; সঙ্গীত শ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপ-শব্দ-স্পর্শাদির সহিত এই এই স্থলে জ্বালা স্ফূর্ত্তি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অন্তর্জগতের সহিত জড়জগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, আমাদের জীবনযাত্রা চলিত না। আবার সেই বাহ্য জগতের রূপরসগন্ধাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে; তদুভয়ের সহিত আবার চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে; সূর্যাচন্দ্রাদির সহিত, জলবায়ু আগুনের সহিত আবার জীবজন্তুর সম্বন্ধ আছে। জীবজন্তুর আবার পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায়, যে সকল নিয়মের অনুসারে জড়জগতের ক্রিয়াপরম্পরা চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম এই সকল সম্বন্ধ ধরিয়াই বর্ত্তমান।

কিন্তু প্রশ্ন, এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায় কেন? এই সম্বন্ধ না থাকিলে মনুষ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু মনুষ্যের অস্তিত্বই বা কিসের জন্য? বিজ্ঞান শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উভয়ে ঠিক্ এক চোখে দেখে না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র উভয়েই জাগতিক রহস্যঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। দার্শনিক সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বাহ্যজগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব গোঁড়াতেই মানিয়া লয়। বাহ্যজগতের পারমার্থিক স্বরূপ যেমনই হউক, আমাদের বাহিরে আমাদের স্বতন্ত্র আমাদের নিরপেক্ষ একটা জগৎ বহুকাল হইতে বিদ্যমান আছে, ইহা আমাদিগকে মানিতে হয়। আমরা জ্ঞানবান্

জীব যখন ছিলাম না, তখন হইতে উহা বিদ্যমান আছে ও আমরা যখন থাকিব না, তখনও উহা বিদ্যমান থাকিবে, ইহা মানিতে হয়। না মানিলে জীবনের পথে একপদ অগ্রসর হওয়া যায় না। যে মানেনা, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কেননা আমাদের জীবন এই বাহ্যজগতের সর্ব্বতোভাবে অধীন। বাহ্যজগৎ আমাদের অধীন নহে; উহা আপন নির্দ্দিষ্ট বিধান ক্রমে চলে। আমরা চেষ্টা দ্বারা সেই বিধানগুলির সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদের জীবনপ্রণালীর সহিত জগৎপ্রণালীর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লই মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য আমরা মানিয়া লই, বাহ্যজগৎ আমার পূর্ব্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে, তবে যেমন ছিল, তেমনই থাকিবে না। বাহ্যজগৎ কেবল পরিবর্ত্তনপরম্পরা মাত্র; সেই পরিবর্ত্তনপরম্পরায় যাহা অব্যক্ত ছিল, অব্যাকৃত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, নিরবয়ব ছিল, তাহা ব্যক্ত, ব্যাকৃত, স্পষ্ট, সাবয়ব হয়। ইহার নাম জগতের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি; ইহা সমস্ত জগতে ও জগতের প্রত্যেক অংশে চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র এই অবিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির শিকলের গ্রন্থিগুলি পর পর আবিষ্কারের চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু দার্শনিক অভিব্যক্তি অন্যরূপ। দর্শনশাস্ত্র জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা উপস্থিত করে। কেহ বলেন, বাহ্যজগতে যখন রূপরসগন্ধস্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই আমাদের উপলব্ধির বা জ্ঞানের বিষয় হয় না, তখন ঐ রূপরসাদি ছাড়িয়া বাহ্যজগতে আর কিছুই নাই; এবং রূপরসাদি যখন জ্ঞানেরই নানাবিধ আকার মাত্র, এবং জ্ঞাতার অভাবে যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তখন জ্ঞাতার অভাবে বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও অস্বীকার্য্য। যাহা জ্ঞানের অগোচর, তাহা অস্তিত্বহীন। আমি যখন ছিলাম না, তখন জগৎ ছিল না; আমি না থাকিলে জগৎও থাকিবে না। সকলে কিন্তু একথা বলেন না। কেহ কেহ বলেন, একটা

কিছু বাহিরে আছে, তাহা রূপরসগন্ধ নহে, তবে তাহা জ্ঞাতার সম্মুখে রূপরসাদি স্বরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। সেই অনির্ব্বাচ্য কোন-কিছুকে ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই; কেননা বুঝাইতে গেলেই উহাতে-জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম অর্পণ করিতে হইবে। সাংখ্যেরা ঐ অনির্ব্বাচ্য একটা-কিছুর প্রকৃতি নাম দেন; স্পেন্সারের ভাষায় উহা অজ্ঞেয় তত্ত্ব। বৌদ্ধ এই অনির্ব্বাচ্য কোন-একটা-কিছুর অস্তিত্ব আদৌ মানেন না এবং বলা বাহুল্য এবিষয়ে তিনি একাকী নহেন। বৌদ্ধ বলেন, প্রতীয়মান রূপরসাদির অন্তরালে কিছুই নাই। ঐ রূপরসাদির সমষ্টিকেই আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া মনে করি। এই মনে করাকে বিদ্যা না বলিয়া অবিদ্যা বলাই সঙ্গত। কেননা, কেন ঐরূপ মনে করি, তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারি না। ঐরূপ মনে না করিয়া অন্যরূপ মনে করিলেও যখন সেই প্রশ্নই আবার উপস্থিত হইত, তখন ও কথাটা অবিদ্যা বা ভ্রান্তি বা জ্ঞানাভাব বলিয়া চাপা দেওয়াই ভাল।

বাহ্যজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধের এই কথা। তার পর অন্তর্জ্জগতের স্বরূপ। অন্তর্জ্জগতে যে স্মৃতি-উপলব্ধি, বিচার-বিতর্ক, শোক-হর্ষ, সংকল্প-চেষ্টা, সুখ-দুঃখ, এ সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। উহাদের জ্ঞানগম্য আকার ভিন্ন অন্য আকার আমরা অবগতও নহি, কল্পনাতেও আনিতে পারি না; কল্পনা করিতে গেলে তাহাও জ্ঞানগম্যই হইবে। উহাদের অন্তরালে অজ্ঞেয় কোন একটা কিছু নাই। একটা অনির্ব্বাচ্য কিছু আছে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

বৌদ্ধমতে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয়েরই ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ভিন্ন পারমার্থিক অস্তিত্ব কিছুই নাই। যাহা দেখি তাহাই আছে—তাহা কতিপয় ভিত্তিহীন ক্ষণিক জ্ঞানের সমষ্টি। মরীচিকা বা আকাশলম্বী গন্ধর্ব্বনগর বা স্বপ্ন যেমন ভিত্তিহীন জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, বাহ্যজগৎ ও

অন্তর্জগৎও ঠিক সেইরূপ। উভয়ই ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরামাত্র। আর সেই পরম্পরামধ্যে একটি জ্ঞানের সহিত তৎপরবর্ত্তী জ্ঞানের কোন সম্পর্কই নাই। বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য কি-একটা-কিছু স্বীকার করিতে একবারে নারাজ। একালের যে সকল দার্শনিক sensationalist বা প্রত্যয়বাদী ও phenomenalist বা প্রপঞ্চবাদী বলিয়া অভিহিত হন, বৌদ্ধ তাঁহাদের অগ্রগামী।

বাহ্য ও আন্তর জগৎ যদি কেবল ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরামাত্র বা সমষ্টিমাত্র হয়, যদি সেই সকল ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্কই না থাকে, তবে সেই সকল ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ দেখি কেন? জ্ঞানগুলা যে অন্যোন্য সম্বন্ধে বিজড়িত, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই; কেন না প্রাকৃতিক নিয়ম না মানিলে জীবন চলে না। তাহাদের ঐ সম্বন্ধ কোথা হইতে আসে? আর আমি ঐ সকল জ্ঞান উপলব্ধি করিতেছি, ঐ সকল জ্ঞান আমার জ্ঞান, আমিই দ্রষ্টা, আমিই শ্রোতা, আমিই কর্ত্তা, এই ধারণাটাই বা আসে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বেদান্ত একটা অনির্ব্বাচ্য কোন-কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উহা অনির্ব্বাচ্য বটে, কিন্তু অনুভবের অগম্য নহে। বেদান্তের নিকট উহার মত স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আর কিছুই নাই—উহার নাম আত্মা। এই আত্মাই একমাত্র চেতন পদার্থ; আর অন্তর্জগতে বা বহির্জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আত্মার সমীপে জ্ঞানগম্য বলিয়া প্রকাশ পায়, যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা অচেতন জড়। জ্ঞানগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বেদান্ত বলেন, উহা আত্মারই মায়া। মায়া শব্দটার অর্থ লইয়া গোল উঠিতে পারে; আত্মার স্বভাব বলিলে কতকটা সরল হয়। বাহ্যজগৎকে কেন এমন দেখায়, অন্তর্জগৎকে কেন এমন দেখায়, তাহার উত্তর—

ঐরূপ দেখাই আমার স্বভাব। এই উত্তর সকলের সন্তোষজনক হইবে কি না জানি না; কিন্তু বেদান্ত বলেন, ইহা ভিন্ন উত্তর নাই।

বৌদ্ধ কিন্তু উত্তর দেন অন্যরূপে। তিনি ঐ অনির্ব্বাচ্য আত্মার অস্তিত্ব মানেন না। যাহা একের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা অন্যের নিকট একেবারে অসিদ্ধ। তাঁহার নিকট নামরূপই সব অর্থাৎ যে জ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের প্রতীয়মান হয়, তাহাই সব; জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই। এই পরস্পরসম্পর্করহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির পারিভাষিক নাম সংস্কার। তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে একটা সম্বন্ধের কল্পনা করা হয় বটে। জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বৌদ্ধ-ভাষায় সংস্কারগুলির মধ্যে প্রতীয়মান যে সকল সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কল্পনা করিবার জন্য বিজ্ঞাননামক পদার্থ বৌদ্ধ স্বীকার করেন। এই বিজ্ঞান বাহ্য জগতের রূপরসাদির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং প্রাকৃ-তিক নিয়ম-গুলির সৃষ্টি করে, অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত সুখদুঃখাদির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের আদানপ্রদান সম্বন্ধও স্থাপন করে। কিন্তু সেই বিজ্ঞানও একপ্রকার ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। উহাও একটা অনির্ব্বাচ্য কোন-একটা-কিছু নহে। এই সংস্কারসমূহ ও সংস্কারসমূহের উপর কর্তৃত্বকারী বিজ্ঞান উভয়েরই সমষ্টি একত্র করিয়া একটা মিথ্যা "আত্মা" বা 'আমি" কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু উহা মিথ্যা কল্পনা। ঐ কল্পনাও বিজ্ঞানের কাজ। ইহার নাম অহংবিজ্ঞান বা বৌদ্ধ পরিভাষায় আলয়-বিজ্ঞান। উহাকে বেদান্তের অনির্ব্বাচ্য চেতনস্বভাব আত্মা বলা যায় না। সংস্কার সমূহ ও তাহাদের অধিপতি বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আর আমি বলিয়া বা আত্মা বলিয়া কিছু থাকে না। উহাদের সমষ্টি করিলে যাহা হয়, তাহাই নামরূপ। কিন্তু সেই নামরূপের সাক্ষী আত্মা বলিয়া কিছু নাই।

এই সংস্কারগুলি একত্র করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলেই নামরূপ অর্থাৎ বিশ্বজগৎ প্রস্তুত হয়। কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি অর নাভি প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি, এবং সন্নিবেশের পর যে দ্রব্য দাঁড়ায়, তাহাকে রথচক্র আখ্যা দিয়া থাকি। এক একখানা কাষ্ঠকে রথচক্র বলা যায় না; কাষ্ঠ কয়েকখানা এক নির্দ্দিষ্ট বিধানে সাজাইলে তবে তাহার নাম রথচক্র হয়। সেইরূপ সংস্কার গুলি অর্থাৎ বিচার-বিতর্ক, রাগদ্বেষ, সুখদুঃখাদি চিত্তবৃত্তিগুলি বিজ্ঞান-সহযোগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে যাহা দাঁড়ায়, তাহাই জগৎ। ঐ গুলি একে একে লোপ করিলে জগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আত্মা নাই বা থাকিল? বিজ্ঞানই যেন বাহ্যজগৎকে ও অন্তর্জগৎকে এরূপ সম্বন্ধযুক্ত করিয়া এই জগতের সৃষ্টি করিল, এবং বিজ্ঞানই যেন মিথ্যা অহংপ্রত্যয়ের সৃষ্টি করিয়া আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইল; কিন্তু বিজ্ঞানই বা এরূপ করে কেন? ইহার উত্তর কি? বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নামরূপের নির্ম্মাণ করিল কেন? কাষ্ঠখণ্ডগুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধ-দর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্যা; ইহার কারণ অবিদ্যা। এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক বলিতে সাহস করিতেছি না। অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাব, অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, কেন হয় জানি না। উহা খাঁটি আগ্নষ্টিকের কথা। দ্বিতীয় অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত আছে তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে; কিন্তু সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্নের

মত বা মরীচিকার মত অলীক কল্পনা। বৈদান্তিক অন্যরূপে উত্তর দেন। তিনি বিজ্ঞানের অন্তরালে, বিজ্ঞানের উপরে, আত্মার অস্তিত্ব মানেন। আত্মা বিজ্ঞানদ্বারা ইহা করায়। কেন করায়? না, ঐরূপই আত্মার মায়া বা আত্মার খেলা বা আত্মার স্বভাব। যাহাই হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ দুরূহ।

এখন কতকটা কিনারা পাওয়া গেল। দার্শনিক অভিব্যক্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝা গেল। জগৎ এমন দেখায় কেন, জগৎ এরূপ হইল কিরূপে, জগৎ অভিব্যক্ত হইল কিরূপে, বৌদ্ধমতে তাহার উত্তর পাওয়া গেল। মূলে অবিদ্যা—জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যাবলে সংস্কারগুলি বিজ্ঞানকর্ত্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্যস্ত হইয়া নামরূপে পরিণত হইয়াছে ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নামের অর্থাৎ অন্তর্জ্জগতের ও রূপের অর্থাৎ বহির্জ্জগতের মিথ্যা মরীচিকা প্রস্তুত করিয়া উভয় নির্ম্মিত বিশ্ব জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। নামরূপের বা জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চয় সৃষ্ট হয়। কেননা, ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতের কারবার চলে, ইন্দ্রিয়দ্বারাই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইন্দ্রিয় না থাকিলে অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে রাখিয়া তাহার সহিত আদানপ্রদান করিতে পারিত না। কাজেই যখনই নাম হইতে রূপ পৃথক্ রূপে প্রতীত হইয়াছে, যখনই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে, তখনই ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইয়াছে। বলা উচিত, দর্শন শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুকর্ণাদি দৈহিক অবয়ব বুঝায় না; ইন্দ্রিয় শব্দে সেই শক্তি বুঝায়, যদ্দ্বারা রূপরসাদি উপলব্ধির বিষয় হয়। ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই অন্তঃশরীর বা অন্তর্জ্জগৎ বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই

স্বতন্ত্র? না। এই স্বতন্ত্ররূপ বোধের স্রষ্টা বিজ্ঞান; এই স্বাতন্ত্র্যবোধের হেতু অবিদ্যা। একবার উভয় জগৎ স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পিত হইলে ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের মধ্যে আদানপ্রদানের আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানের এই সম্বন্ধস্থাপনা কার্য্য ক্রমেই চলিতে থাকে; স্বাধীনরূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতে বিবিধ সম্বন্ধের স্থাপনা ক্রমেই চলিতে থাকে; বিজ্ঞান বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করে। উহাদের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ লাভ করে। এই ব্যাপারটা স্পর্শ; স্পর্শ অর্থে বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ। তাহার ফল বেদনা, অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতির নূতন নূতন বিকাশ, জগতে রূপরসগন্ধাদির নূতন নূতন আবির্ভাব। তাহার ফলে তৃষ্ণার উদ্গম; বাহ্যজগতের সহিত কারবার বজায় রাখিবার, আদান প্রদান চালাইবার, আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে উপাদান—বাহ্যজগতের প্রতি অন্তর্জগতের টান—বাহ্য জগৎকে চাপিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি—বাহ্যজগতে আসক্তি। এক্ষণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে; উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে; এখন অহংপ্রত্যয়ের বিকাশ হইয়াছে। আমিই এই জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া জগতের সহিত কারবার করিতেছি, এই বুদ্ধির উদ্গম হইয়াছে। এখন আমি হইয়াছি; ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না। আমার এই উৎপত্তির নাম ভব। সেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি বা মনুষ্য-জন্ম। মনুষ্য-জন্মের অপর অর্থ ভগবান্ সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের সহকারী শোক পরিদেবন দুঃখ দৌর্ম্মনস্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদের এইরূপ ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনোক্ত অভিব্যক্তি তত্ত্বের সহিত ইহার সঙ্গতি হয়। বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথা বলে, জ্যোতিষে নীহারিকাবাদ হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে জীবকুলোৎ-

পত্তি ও মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিণতি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র যে অভিব্যক্তির কথা বলে, এই প্রতীত্য সমুৎপাদে সেরূপ অভিব্যক্তির কথা আদৌ বলে না। ঐ সকল অভিব্যক্তি বহুকাল ব্যাপিয়া ঘটে। সৌরজগৎ কোন্ কালে নীহারিকার অবস্থায় ছিল কে জানে? ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের কত লক্ষ বা কত কোটি বৎসরে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লইয়া বিতণ্ডা এখনও চলিতেছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিণতিতে নয়মাস দশদিন সময় লাগে; সেই ভ্রূণ আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া কতদিন ধরিয়া পরিণতি পায় ও পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ যে সৃষ্টির কথা বলিতেছে, তাহা কালব্যাপী নহে। এই বিশ্ব মরীচিকা এখনই, এই ক্ষণেই, অবিদ্যা-কল্পিত হইয়া ওরূপ দেখাইতেছে। বিশ্বজগৎই যেখানে কল্পনা, সেখানে উহার সমস্ত অতীত ও সমস্ত ভবিষ্যৎ—যে অতীতের ইতিহাস বিজ্ঞানশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করে ও যে ভবিষ্যতের কাহিনী আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র হয়—সেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্পনামাত্র। ভগবান্ তথাগত বোধিদ্রুমতলে সাধনার পর যে চারিটি আর্য্য সত্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহার একটির মর্ম্ম এই যে, এই বিশ্বজগতের স্বরূপ দুঃখাত্মক। যে নাম ও রূপ লইয়া বিশ্বজগৎ, যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে আমরা সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে ভাগ করি, তাহাদের পরস্পর আদান প্রদানের একমাত্র ফল দুঃখ। জরামরণ শোক পরিদেবন দৌর্ম্মনস্য সেই দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। এই দুঃখ নিরোধের উপায়ও ভগবান্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দুঃখনিরোধের উপায়ও তদাবিষ্কৃত চারিটি আর্য্য সত্যের অন্যতম। দুঃখই ব্যাধি; প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই ব্যাধির নিদানতত্ত্ব; এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন সেই ব্যাধির মহৌষধি। তথাগত স্বয়ং সেই নিদানতত্ত্বের ও সেই মহৌষধির আবিষ্কর্ত্তা বৈদ্যরাজ। নাম ও রূপ উভয়ই পারমার্থিক অস্তিত্বহীন; উহাদের অন্তরালে অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছুই নাই; কেবল উহা ক্ষণিক

বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরামাত্র; উহারা ঐরূপ দেখায় মাত্র; কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্বপ্নের মত; এইটুকু বলাই প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য। নামরূপ অলীক হইলে দুঃখও অলীক হয়। এবং দুঃখ অলীক বলিয়া জানিলেই দুঃখ আর থাকে না। কাজেই ঐ জ্ঞান লাভই দুঃখ-নিরোধের একমাত্র উপায়। এই জ্ঞানলাভই সম্যক্ সম্বোধি—আষ্টাঙ্গিকমার্গ অবলম্বনে দুরূহ সাধনাদ্বারা এই সম্যক্ সম্বোধিলাভের আশা আছে। ইহা লাভ করিলেই নামরূপকে মিথ্যা ও দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায় এবং নির্ব্বাণ বা দুঃখবিমুক্তি ঘটে। ভগবান্ স্বয়ং সেই সম্বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের পক্ষে এই নির্ব্বাণলাভ সাধ্য নহে; তবে সেই সাধনাই নির্ব্বাণলাভের বা দুঃখনিরোধের একমাত্র পন্থা। ভগবান্ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রকে সেই পন্থা দেখাইয়া দিয়া মানবজাতির তৃতীয়াংশের নিকট জ্ঞানসিন্ধু ও করুণাসাগররূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

মুক্তি

ডাক্তার জ্বরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, তোমার কুইনাইনসেবন কর্ত্তব্য। এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনাইনসেবন মানুষের কর্ত্তব্য নহে, পরোপকারই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয় মাত্র, রোগীর কোন উপকার হয় না।

আজকাল গদ্যে পদ্যে বক্তৃতায় শব্দের অপপ্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ বা তাহা অপেক্ষাও উৎকট যুক্তিবিভ্রাট ঘটান হয়, কিন্তু তাহাতে হাস্যরসের উদ্ভব কেন হয় না, বুঝিতে পারা যায় না।

প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে কতকগুলি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবাদি সম্পাদিত হইত; উহাদিগকে যাগযজ্ঞ বলিত ও উহাদের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম্ম। তদ্দেশে তৎকালে উহাদের উপযোগিতার বিচার বর্ত্তমান সময়ে কঠিন। একালে আমরা ধর্ম্মশব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি ও গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করি ও কাব্য লিখি—"যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে।" আর যাঁহারা এইরূপ বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের আস্ফালনই বা কত!

শব্দের অপপ্রয়োগের এইরূপ আরও উদাহরণ আছে। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মুক্তিশব্দটি নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টান-দের স্বীকৃত salvation নামক একটা ব্যাপার আছে; আজকাল অনেকে উহার পর্য্যায়রূপে মুক্তিশব্দ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ উৎকট যুক্তির অবতারণা করেন।

মুক্তিশব্দের অর্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। কিন্তু এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহা খ্রীষ্টানি salvation নহে।

খ্রীষ্টানি salvation শব্দের অর্থ কি? খ্রীষ্টানিমতে মনুষ্যমাত্রই জন্মাবধি পাপী। মনুষ্য আপনার পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারক খোদা * পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য; নতুবা তাঁহার ন্যায়পরতা থাকে না। কিন্তু তিনি আবার করুণাময়। কাজেই তিনি করুণাবশে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন ও মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষ্যজাতির প্রতিভূ-স্বরূপে আপনার শোণিতপাতদ্বারা মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত

* ইংরাজি God বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের ঈশ্বরশব্দে সর্ব্বত্র তাহা বুঝায় না। এইজন্য God এর তর্জ্জমায় অগত্যা খোদা-শব্দ ব্যবহার করা গেল।

করিলেন। তাঁহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইল। যে তাঁহার শরণাগত হইয়া তৎপ্রদর্শিত পন্থায় চলিবে, [illegible]রের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া খোদাকর্তৃক গৃহীত হইবে; তাহা[illegible] আর পাপের অবশ্য-লভ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। সে তৎপরে চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে বা খোদা সান্নিধ্যে বাস করিবে। মনুষ্যের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইংরাজি নাম salvation; বাঙ্গালায় উহাকে 'পরিত্রাণ' বলা যাইতে পারে। এইরূপে খ্রীষ্টানেরা খোদার ন্যায়পরতা ও করুণাময়তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্যের পাপমোচন ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় খোদার কৃপা; যে অনুতপ্তচিত্তে সেই কৃপার ভিখারী হইয়া সেই করুণানিধান ত্রাণকর্তার শরণাগত হয়, সেই পরিত্রাণ পায়। এই ব্যাপারকে মুক্তি না বলিয়া পরিত্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। খোদার অবতার যীশু খ্রীষ্ট এই হিসাবে মানবজাতির পরিত্রাণকর্তা।

খ্রীষ্টানসমাজে এই পরিত্রাণের থিওরি কোথা হ[illegible] আসিল, বলা দুষ্কর। অতি প্রাচীন ইহুদিসমাজে এইরূপ পরিত্র[illegible]ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল কি না, সন্দেহের স্থল। ইহুদিরা আপনাদিগকে জেহোবাদেবের অনুগৃহীত জাতি বলিয়া জানিত। তাহারা প্রবলতর-প্রতিবেশিগণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ নিগৃহীত হইয়াছিল। জেহোবার (জাহবে-নামক ইহুদীগণের রাষ্ট্রীয় দেবতার) আদেশলঙ্ঘনই তাহাদের এই নিগ্রহের ও বিপৎ-পাতের কারণ বলিয়া ন[illegible]হাদের বিশ্বাস ছিল। তাহাদের জাতীয় দুর্দ্দশার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিয়া সান্ত্বনা পাইত। মনে করিত, ভবিষ্যতে মেশায়া জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের এই চিরন্তন দুঃখ মোচন করিবেন। এই মেশায়া কতকটা আমাদের কল্কি-অবতারের মত। ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছনিবহ নিধন করিয়া সনাতনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ আমাদের পুরাণে ভবিষ্যদুক্তি

আছে। ইহুদিদিগেরও সেইরূপ আশা ছিল, মেশায়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদিগের জাতীয় দুরবস্থার অপনোদন হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রফেট্ নামে একশ্রেণীর লোক প্রচুর সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবী মেশায়ায় অন্যান্য গুণ ও অন্যান্য কর্ত্তব্য অর্পণ করিতেন। কিন্তু সাধারণ ইহুদিজাতির বিশ্বাস তাহাতে অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই যখন মেরীপুত্র যীশু জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে খ্রীষ্ট ও মেশায়া বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ ইহুদিজাতির আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় দুঃখের অবসান হইল না, তখন অধিকাংশ ইহুদি তাঁহাকে মেশায়া বলিয়া স্বীকার করিল না। ইহুদিদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহা স্বীকার করিয়া একটা দল বাঁধিল মাত্র। তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার ত্রাণকর্ত্তৃত্ব ইহুদিসমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়া বৃহৎ খ্রীষ্টান সমাজের স্থাপনা করিলেন। এই খ্রীষ্টীয় সমাজ উনিশ শত বৎসর ধরিয়া যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্ত্তা ও পাপমোচন-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তিদাতা বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে মুক্তি বলে, খ্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। খ্রীষ্টানি শাস্ত্রে সেরূপ মুক্তির কথা আছে কি না, জানিনা।

যীশুর জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ভগবান্ গৌতম সিদ্ধার্থের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একটা দেশব্যাপী সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করেন ও তদ্ব্যতীত গৃহস্থলোকেও দলে দলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। গৌতম সিদ্ধার্থ অনেক সাধনার পর আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা নির্ব্বাণলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নিশ্চয় করেন, মানবজাতির নিকট সেই পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মানবজাতির দুঃখদর্শনে

তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; তাঁহার প্রদর্শিত নির্ব্বাণের পথ মানবজাতির সেই সনাতন দুঃখদূরীকরণের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। তিনি সেই দুঃখমোচনের উপায় আবিষ্কারের জন্য রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ ও ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকরূপে বেড়াইয়াছিলেন। তিনি যে নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করেন, তাহা ব্রাহ্মণশাস্ত্রসম্মত মুক্তির পথ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাণকে আমরা মুক্তির সহিত একপর্য্যায়ে গ্রহণ করিলে অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই নির্ব্বাণ বা এই মুক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহলভ্য নহে; এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে বা অনুগ্রহদ্বারা মানুষকে মুক্ত করিতে পারেন না। গৌতমবুদ্ধ এইরূপ মনুষ্যভাগ্যবিধাতা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। মনুষ্য আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। সৎকর্ম্মের ফল সদ্‌গতি ও সুখলাভ; অসৎ-কর্ম্মের ফল অসদ্‌গতি ও দুঃখলাভ। কোন ব্যক্তি কোনরূপে এই কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতিলাভে সমর্থ নহে। মনুষ্য ইহজীবনে তাহার কর্ম্ম-ফল কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার কর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না। সে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এক লোক ত্যাগ করিয়া অন্য লোকে যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। * এবং সেই দেহান্তরে ও লোকা-ন্তরে কৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে আবার নূতন দেহ ধারণ

---

* বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, অথচ জীবের জন্মান্তরপ্রাপ্তি ও বিভিন্ন দেহ ধারণ মানিতেন; এই দুই মতের অনেকে সামঞ্জস্য করিতে পারেন না। ইংরাজি soul শব্দের অনুবাদে "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করায় এই বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য soul অর্থে আত্মা নহে।

বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয়। ইহার নাম সংসার। নরদেহ-পরিত্যাগের পর মনুষ্য দেবদেহ ধারণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। ভূলোক ত্যাগ করিয়া সে কিছুদিন স্বর্লোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই দেবদেহপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি মুক্তি নহে। সেখানেও কর্ম্ম আছে ও কর্ম্মপাশের বন্ধন আছে। সে বন্ধন হয় ত সোণার শিকলে বন্ধন; আর নরদেহের বন্ধন লোহার শিকলে বন্ধন। কিন্তু উভয়ই বন্ধনদশা। স্বর্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না। সৎকর্ম্ম-ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির ও ফলভোগাবসানের পর তাৎকালিক কর্ম্মফলে আবার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিবে। কাজেই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিল না। সৎকর্ম্মই কর, আর অসৎকর্ম্মই কর, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেই হইবে; অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কোন দয়ালু পরিত্রাতা এই সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই।

তবে এক উপায় আছে। এই সংসার বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জানিলেই সকল দুঃখ দূর হইতে পারে। নির্ব্বাণ লাভের বা দুঃখবিমুক্তির এই একমাত্র পন্থা এবং ইহা জ্ঞানের পন্থা। এই জ্ঞানমার্গ ভগবান্ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষায়, এই লোক এতকাল ধরিয়া তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল; ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন। মনুষ্য যে দেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃপুনঃ কর্ম্মবশে বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ইহার মূল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। যে প্রণালীদ্বারা বা প্রক্রিয়াদ্বারা বা ধারাক্রমে অবিদ্যা হইতে এই সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। স্থলান্তরে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে। ফল কথা, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বা

অনুভূয়মান, যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি—তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব। স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, যাহা কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা কেবল সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন। উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্তই শূন্য ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই ভ্রান্তি কাটিয়া যাইবে। তখন বুঝিবে জন্মমৃত্যু সবই মিথ্যা, ইহকাল-পরকাল কিছুই নাই, সুখদুঃখও অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই নির্ব্বাণ ঘটে বা মুক্তি ঘটে। এইটুকু বুঝিলেই দুঃখ থাকে না; এইটুকু বুঝিলেই জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না। কেন না, দুঃখ অস্তিত্বহীন পদার্থ, জন্মান্তরপরিগ্রহও ভ্রান্ত বিশ্বাসমাত্র। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটাই অবিদ্যা, এই ভ্রান্তির অপনোদনই নির্ব্বাণ। ইহার ফল দুঃখনাশ।

কাজেই ঐ জ্ঞানোদয় ভিন্ন নির্ব্বাণলাভের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেই জ্ঞানোদয় অতি কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা করিলেই সেই জ্ঞানের উদয় ঘটে না। বিশ্বজগৎটা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ, ইহা মনে করিলেই করা যায় না। অন্ততঃ অনেক বড় বড় লোকে যখন এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। তবে সাধারণ মানুষে করিবে কি? তাহারা যথাসাধ্য এই জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; এই জ্ঞানলাভের জন্য যে সাধনা আবশ্যক, তাহা দ্বারা এই জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বুদ্ধপ্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সংকল্পাদি দ্বারা আত্মোন্নতি বিধানের পর শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্ সমাধিবলে ঐ জ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। মুক্তি আয়াসলভ্য; উহা জ্ঞানীর প্রাপ্য। আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে, এবং ঐ পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থায় চলিলে ফললাভের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

ভগবান্ বুদ্ধগৌতম এইরূপে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই হেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করেন নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মতে কোন মনুষ্য বা কোন দেবতা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না; সেইজন্য বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতে মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে না। বিনা অবিদ্যানাশে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনাসাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদর্শিত ত্রিশরণ মার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ পাওয়া হইতে পারে মাত্র। কিংবা এতটুকু বলা যাইতে পারে, যে বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ আশ্রয় না করিলে মুক্তির পথ জানিবার উপায় থাকে না, অতএব মুক্তিলাভের উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা অন্য পন্থা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধগণের মতে ভ্রান্ত।

বৌদ্ধগণ ভগবান্‌কে ভবব্যাধির চিকিৎসক, বৈদ্যরাজ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়াসিন্ধু ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। এই করুণানিধান মহাপুরুষের উপাসনা বৌদ্ধ সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপামাত্রে যে মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতের স্বীকার্য্য নহে।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখে আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু মুক্তিকে অনায়াসলভ্য বলেন নাই। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ অচিরে তাঁহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপে গ্রহণ করিল। যিনি মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাতা সর্ব্বসাধারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময়ত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব উভয়ের আধারস্বরূপ হইয়া ভগবান্ বৌদ্ধসমাজে অচিরে পূজিত হইতে লাগিলেন। উত্তরকালে মহাযানী বৌদ্ধেরা বিবিধ কাল্পনিক

বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। সংসারতাপক্লিষ্ট মানব সর্ব্বদাই সংসারক্লেশ হইতে ও জরামরণ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মণ এই উদ্ধার লাভের কোন সহজ পন্থা দেখান নাই। মহাযানী বৌদ্ধেরা অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া দিল। মহাযানীদের কল্পিত বোধিসত্ত্বগণ মূর্ত্তিমান্ করুণাস্বরূপ। তাঁহারা মানবকে দুঃখসাগর হইতে তরাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। সৌগতমার্গের আশ্রয় লইয়া বোধিসত্ত্বগণের শরণাগত হইলে, তাঁহাদের করুণার ভিখারী হইলে, তাঁহাদের উপাসনা করিলে, কাহাকেও এই সংসারতাপ হইতে উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। বোধিসত্ত্বগণের সহকারে তাঁহাদের পত্নীস্থানীয়া বিবিধ দেবতা কল্পিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দয়ার নিধান। তাঁহার শক্তি তারাদেবী সংসারার্ণব-তারিণী। তাঁহাদের শরণাগত হও; সংসারসাগর হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। এইরূপে উপাসকের সিদ্ধিদানে ও সংসারক্লেশ নিবারণে সর্ব্বদা উদ্যত অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমায় বৌদ্ধগণের উপাসনামন্দির সকল পূর্ণ হইতে লাগিল। দলে দলে বৌদ্ধ উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদমার্গভ্রষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাসকে দেশ পূর্ণ হইল। মহাযান আশ্রয় করিয়া সংসারবারিধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণশাসিত আর্য্য-সমাজ হইতে সনাতন বৈদিক মার্গ লোপ পাইতে বসিল।

দেখা গেল, খ্রীষ্টানগণের স্বীকৃত পরিত্রাণের পন্থার সহিত বৌদ্ধ-স্বীকৃত নির্ব্বাণের পন্থার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্তু কালের পরিণতিতে উভয়ই প্রায় তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার পরিণতি সাধনে বৌদ্ধ পন্থার কোন প্রভাব ছিল কি না, ইহা একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক সমস্যা। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধ বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য

দেখিলে এই প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কাহারও কাহারও মতে মিশরদেশের থেরাপিউটগণ ও ইহুদি দেশের এসিনিগণ বৌদ্ধ সম্প্রদায় মাত্র। ব্যাপ্‌টিষ্ট জোহন বৌদ্ধ ছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্ট বৌদ্ধ মতই ইহুদিসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। নারাজ হইবারই কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মাক্সমূলার বলিয়াছেন, বিনা ঐতিহাসিক প্রমাণে খ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব স্বীকার্য্য নহে। চীনদেশে ও তিব্বতদেশে খ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তদ্দ্বারা খ্রীষ্টানি আচারানুষ্ঠান বৌদ্ধদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারক খ্রীষ্টানের দেশে বাস করিয়া বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

কথাটা ঠিক্। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে না। আমরা ঐতিহাসিক নহি। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মুখেই শুনিতে পাই, মহারাজ অশোক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, এপাইরস প্রভৃতি যবনদেশে বৌদ্ধ মত প্রচারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন; পরবর্ত্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গ্রীক ও রোমক নৃপতিগণের সভায় দূত পাঠাইতেন; প্রাচ্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুদিন হইতে বিস্তৃত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রচলিত ছিল; যবন নরপতিরা ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন। বর্ত্তমান বিচারে এই গুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া কেন গৃহীত হয় না, ঠিক্ বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের মূলকথা, খোদার করুণা ব্যতীত পাপাত্মা মানবের মুক্তির সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবপ্রেমের বশীভূত হইয়া, স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর

গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার অবতার এবং তিনিই মনুষ্যের পরিত্রাণকর্ত্তা। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কাহারও করুণা দ্বারা মনুষ্য আপন কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। একমাত্র জ্ঞানের পন্থা ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা তিনি দেখান নাই। তবে সেই পন্থা তিনি নিজে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র; মুক্তি-দাতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই; এবং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই যে, খ্রীষ্টানের পরিত্রাণ ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণমুক্তি একবিধ পদার্থ নহে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যে ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করেন নাই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবের করুণাময় পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। বুদ্ধগণের ও বোধিসত্ত্বগণের ও বুদ্ধশক্তিগণের শরণগ্রহণ ও উপাসনা সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, "কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোকঃ" (তন্ত্রবার্ত্তিক ১১৬।১৩)—কলির বশে জীব যে সকল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত হউক, জীব সেই পাপভার হইতে মুক্ত হউক—দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত এই উক্তির সহিত দয়াময় যীশু খ্রীষ্টের উক্তির অধিক প্রভেদ নাই। এই উক্তিকে খাঁটি খ্রীষ্টানি মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি অতি দীনহীন, মুই অতি পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর—আধুনিক বৈষ্ণবেরা এ কথা আধুনিক বৌদ্ধের নিকট শিখিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহা খ্রীষ্টানের নিকট পাইয়াছিলেন অথবা খ্রীষ্টানেরা ইহা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তাহার বিচার করিবেন।

বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃত বৈদান্তিক

মুক্তিতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য নাই। কিন্তু খ্রীষ্টপ্রচারিত পরিত্রাণ-তত্ত্বের সহিত ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু কালক্রমে বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব কিরূপে বিকৃত হইয়া খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখা গেল। ব্রাহ্মণশাসিত বেদপন্থী সমাজও এই বিকার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। মহাযানী, মন্ত্রযানী, বজ্রযানী বিবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ যখন শস্তায় ও সহজে ভবসমুদ্র তরাইবার জন্য আপন আপন ডিঙ্গি হাজির করিয়া যাত্রীদিগকে টানাটানি করিতে লাগিল, তখন বেদপন্থীর জাহাজের জন্য পাথেয় সংগ্রহে কাহারও আর প্রবৃত্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে পতিত হইতে চলিল; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে চলিল; ব্রাহ্মণের যজ্ঞভূমির উপরে বৌদ্ধ-গণের চৈত্য ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল; হোমাগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া অনার্য্য দেবদেবীর প্রতিমায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; দেশ-বিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের আনীত অনার্য্য অনুষ্ঠানে আর্য্যসমাজ কলুষিত হইতে চলিল; বৌদ্ধ বিহার মধ্যে রাজশাসন সমাজশাসন ও শাস্ত্রশাসনের বহির্ভূত নরনারী দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ জুগুপ্সিত বীভৎস অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিকতার সৃষ্টি করিয়া কর্ণধারহীন সমাজের তরণিখানিকে মগ্ন করিবার উদ্যোগ করিল। তখন সেই স্রোতের গতি ফিরাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কঠোর বৈদিকমার্গকে শিথিল করিয়া সংসারতাপ হইতে পরিত্রাণের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ দ্বারা সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি প্রজাপতি, বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্রমশঃ লোকলোচন হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কপর্দ্দী পিণাকপাণি আপনার ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে আশুতোষ শঙ্কর মূর্ত্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন। জাতকোক্ত বুদ্ধাবতার-

গণের অনুকরণে নারায়ণের অবতারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্লভ মায়াসুতের স্থলে গোপীবল্লভ যশোদাদুলাল উপাসকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উপনিষদের উমা হৈমবতী ও রুদ্র-ভগিনী অম্বিকা, ধূম্রবর্ণা কালী-করালাদি যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার সহকারে, এক দিকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য নিখিল প্রপঞ্চের জনয়িত্রী মহামায়ার ও অন্য-দিকে শবরদ্রবিড়পূজিতা চামুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া, ঈশানজননী মহেশ্বরপত্নীরূপে বুদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত ও বুদ্ধশক্তি তারা-দেবীর সহিত মিশিয়া গেলেন। সিততারা উগ্রতারা ও নীলতারা, বজ্রেশ্বরী বজ্রবারাহী ও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর সহিত উপাসনাভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গৌরী-পদ্মা-শচী-মেধাদি মাতৃকাগণ ইন্দ্রাণী-কৌবেরী প্রভৃতি শক্তিগণের ও উগ্রচণ্ডা-প্রচণ্ডাদি নায়িকাগণের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেবগন্ধর্ববাঞ্ছিতা পুরাতনী বাগ্-দেবতা বীণাপুস্তকের সহিত অক্ষমালা ও মদিরাকলস গ্রহণ করিলেন। অবিদ্যানাশিনী কামবিজয়িনী মহাবিদ্যা কামোপরিস্থিতা আত্মঘাতিনী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রসাদলাভই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র সহজ উপায় বলিয়া প্রচারিত করিতে লাগিল। অব-শেষে যখন হরের্নামৈব কেবলং কলিকলুষনাশের ও পতিত উদ্ধারের সহজতম পন্থা স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন অধঃপতিত ধিক্কৃত বৌদ্ধ নামে পরিচিত হওয়া আর কেহ আবশ্যক বোধ করিল না।

এ কালের পুরাণ তন্ত্রে দেবদেবীর উপাসনা ও দেবদেবীর প্রসাদ-লাভ চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ ও মোক্ষহেতু বলিয়া অকাতরে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই মোক্ষ দর্শনশাস্ত্রের মোক্ষ নহে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাবধান, তাঁহারা অনেকটা বুঝিয়া কথা কহেন। ইষ্টদেবতার সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি তাঁহারা

প্রার্থনা করেন ; সাযুজ্য সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা কহেন ; আর নির্ব্বাণ-মুক্তির নাম শুনিলেই তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। মুক্তি, যাহার বেদান্ত-সম্মত পন্থা জীবব্রহ্মের একতানিরূপণ, তাহা আধুনিক ভক্ত বা প্রেমিক উপাসকের শিরঃপীড়াজনক। মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ চিনি খেতে ভাল বাসিতেন, চিনি হতে চাহিতেন না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অনেকে দম্ভের সহিত তাদৃশ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টানের সহিত আধুনিক দ্বৈতবাদী হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই।

বৌদ্ধ প্রতিঘাতে যখন সনাতন ধর্ম্মের তরণিখানি বিপ্লুত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। তিনি অগাধ বিদ্যা বলে ও অগাধ ধীশক্তি বলে বেদান্তপ্রতিপাদ্য মুক্তিতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করেন। তৎকালে বৌদ্ধ, জৈন, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, নগ্ন ক্ষপণক, কাপালিক প্রভৃতি বিবিধ সদাচারভ্রষ্ট বেদমার্গচ্যুত সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদকোলাহলে ভারতবর্ষের আর্য্য-সমাজ "কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়" মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের সহিত জীবনব্যাপী বিচারসমরে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতিসম্মত মুক্তিতত্ত্বের উদ্ধার করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্ত্বের নামান্তর অদ্বয়বাদ।

এইখানে বলা উচিত শঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্ত-ব্যাখ্যা সকল আচার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যরূপে বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা ; সর্ব্বস্থানে উহার অর্থবোধ সুকর নহে। আবার ঐ ভাষা অনেক স্থলে কবিতার ভাষা, কোথাও বা হেঁয়ালির ভাষা। কাজেই বেদান্তদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নিবারণের উপায় নাই। অধুনাতন কালে প্রাচীন ভাষায় নানা অর্থ আবিষ্কার করা চলিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাহাই। আচার্য্যগণের মধ্যে যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি শ্রুতি-

বাক্যমধ্যে সেই মতের অনুযায়ী অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং যে এইরূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি অদ্বয়মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে মুক্তি-লাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নবপ্রচারিত বা নবাবিষ্কৃত মত গৃহীত হওয়া উচিত নহে, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে আত্মমতের অনুযায়ী শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা যাইতে পারে, বেদান্ত বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম শঙ্কর যেমন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই। অন্ততঃ আমাদের সেইরূপ বিশ্বাস।

শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্ত ব্যাখ্যা বেদান্তসঙ্গত হউক আর না হউক, এবং শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর না হউক, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী বহু দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎ-প্রচারিত অদ্বয়বাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অন্যের প্রচারিত অন্য কোন বাদ সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অদ্বয়বাদীরা মুক্তি শব্দে কি বুঝিতেন, আমাদের এস্থলে তাহাই আলোচ্য। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহারা যাহাকে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মুক্তির প্রকৃত পথ বা প্রকৃষ্ট পথ না হইতে পারে। তাঁহারা বেদান্তবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অর্থ না হইতে পারে। অদ্বয়মতানুযায়ী মুক্তির তাৎপর্য্য কি, উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।

শঙ্করপ্রচারিত মুক্তির অর্থ সম্বন্ধে ও অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা দেখা যায়। ইংরেজি বাঙ্গালা নানাবিধ

গ্রন্থে এই অদ্বয়মতের আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই হতাশ হইতে হইয়াছে, স্বীকার করিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সমস্ত প্রচলিত আলোচনার সার সঙ্কলন করিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে অদ্বয়বাদী একমাত্র নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই একমাত্র নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইংরাজিতে ইহার Universal Soul নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইহাই বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বর-পদবাচ্য। তবে অন্য শাস্ত্রের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে। খ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর সগুণ; বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িকগণের এবং নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও সগুণ। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর—যাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়—তিনি নির্গুণ।

এই নির্গুণ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ;—তদ্ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে প্রকাণ্ড জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা মিথ্যা। ইহা সেই ব্রহ্মেরই মায়া হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম আপনার মায়া দ্বারা এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সত্যবস্তু পরমাত্মা ও তাঁহার মায়াকল্পিত এই মিথ্যা জগৎ ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না? বেদান্ত এ বিষয়ে কি বলেন? এই জীবাত্মাকে ইংরাজিতে Individual Soul বলা হয়। জীবাত্মার ভোগের জন্য এই বিশ্বজগৎ বর্ত্তমান; জীবাত্মা কাজেই ভোক্তা, কর্ত্তা, সুখী, দুঃখীরূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা জীবাত্মার বুঝিবার ভুল। জীবাত্মা বস্তুতই পরমাত্মার সহিত এক পদার্থ। পরমাত্মা নির্গুণ, কাজেই তিনি কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী হইতে পারেন না। জীব অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে সুখী দুঃখী কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান

বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে পরমাত্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে পারে; তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন উহাকে আর কর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না।

ব্রহ্ম ও জীব এক; এ কিরূপ ঐক্য? প্রচলিত মতানুসারে উভয়ই এক বস্তুতে নির্ম্মিত। তবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক; আর জীব সোপাধিক। মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্বুদের যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত—Universal Soulএর সহিত—জীবাত্মার—Individual Soulএর—কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও আকাশ বস্তুতঃ একই পদার্থ; কেবল ঘটরূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহা পৃথক্ দেখায়। বুদ্বুদ ও জল একই পদার্থ; কেবল ভিতরে বায়ু থাকায় বুদ্বুদকে জল হইতে পৃথক্ দেখায়। কিন্তু ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়; বায়ুটুকু বাহির হইয়া গেলে বুদ্বুদ যেমন জলরাশিতে মিশিয়া যায়; তখন উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না; সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়; তখন আর উহা স্বতন্ত্র থাকে না। অজ্ঞান উপাধি থাকাতে উহাকে কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, বোধ হইতেছিল। অজ্ঞানের বিলোপে উহা নিগুর্ণ নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপে লীন হইয়া যায়। উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেনা যায় না। ইহার নাম মুক্তি।

বলা বাহুল্য এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জন্ম ঘটে না; কেন না জন্মমরণ আধিব্যাধি এ সমস্ত অনিত্য অবাস্তব দেহের ধর্ম্ম; নিগুর্ণ পরমাত্মার পক্ষে এ সকলের সম্ভাবনা নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ইহাই অদ্বয়বাদ। জীব ব্রহ্মের সহিত এক

ও অভিন্ন ; অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্মও যেমন নিত্য নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ ; জীবও তদ্রূপ ; তবে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে অন্যরূপ মনে করে। যতদিন মনে করে, ততদিন সে কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিদ্যাটা কাটিয়া গেলে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায়—তখন মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

ভয়ে ভয়ে বলিতেছি ; খুব সম্ভব যে পাঠকগণের অধিকাংশেরই ইহাই অদ্বয়বাদ বলিয়া ধারণা আছে। এবং এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদের উপর খড়্গহস্ত। এ কি স্পর্দ্ধা! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি একজাতীয় পদার্থ হইতে পারে? উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর? যেরূপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয় ঘটিতেছে। সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিমিত জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধির অধীন জীবের একাত্মতা স্বীকার—ইহা বাতুলের প্রলাপ। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের, অপরিমেয়ের সহিত পরিমিতের, ঐক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। আর মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না; বড় জোর ব্রহ্ম-সান্নিধ্য-লাভ, ব্রহ্ম-সালোক্য-লাভ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। অদ্বয়বাদীর মুক্তি দ্বৈতবাদীর প্রার্থনীয় নহে ; ঐ মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্বানের মিথ্যা আস্ফালন।

মুক্তির ও অদ্বয়বাদের ঐরূপ অর্থ ধরিয়া দ্বৈতবাদী এইরূপে গর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক। অকারণে তিনি হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করেন। কেননা, অদ্বয়বাদের যে অর্থ উপরে দেওয়া হইল, আমাদের বিশ্বাস উহা প্রকৃত অদ্বয়বাদ নহে। মুক্তিতে

যে অর্থ আরোপ করিয়া দ্বৈতবাদী আস্ফালন করেন, আমাদের বিশ্বাস মুক্তির অর্থ তাহা নহে।

বর্ত্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বয়বাদ বলিয়া বিবৃত হইল, তাহা অদ্বয়বাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র। এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদেরই নিরাসের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে মত শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আরোপ করা হয়, তাহা তাঁহাদের মত নহে। বরং সেই মত নিরাসের জন্যই তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম।

Individual Soul আর Universal Soul এই দুই ইংরেজি তর্জমা হইতেই এই ভ্রমের কথা বুঝা যায়। Individual Soul বলিতে বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা; আর Universal Soul বলিতে বুঝায় একটা বৃহত্তর আত্মা—পরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর জগৎব্যাপী আত্মা। উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের তুল্য। একটা অসীম, অপরিমেয়, উপাধিবর্জ্জিত, অনির্ব্বাচ্য; আর একটা সসীম, পরিমেয়, উপাধিবিশিষ্ট, নির্দ্দেশ্য। উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ একজাতীয় পদার্থে একই বস্তুতে নির্ম্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায় জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ; জীব ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি যে এই Universal Soul ও Individual Soul ঘটিত ব্যাখ্যাটা অদ্বয়বাদ নহে; ইহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ।

তবে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি? দেখা যাক।

অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না; বিজাতীয় সজাতীয় স্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না। এক অন্যের অংশ বলিলে ভুল হয়; উভয়ই সর্ব্বতোভাবে এক। অর্থাৎ কি না জীব অর্থে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম অর্থে জীব। পরমাত্মা অর্থে জীবাত্মা

ও জীবাত্মা অর্থে পরমাত্মা। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই বাক্যের অর্থ আত্মার অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র আত্মা শব্দ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু এই কথা বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ—ইহা বরং ছিল ভাল; জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক—আত্মার অপর নামই ব্রহ্ম—ইহা যে আরও বিষম কথা! এরূপ যে বলে সে যে বাতুলেরও অধম!

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে; কিন্তু সেই হেতু তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত। তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্ম শব্দে গোঁড়া হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্ম শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। এবং আপনারা যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর ঐরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাঁহারা যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ করেন, অদ্বয়বাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন না; অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তাঁহাদের ব্রহ্ম নহে। সুতরাং অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর উক্তি তাঁহাদের ব্রহ্মকে স্পর্শমাত্র করে না। সুতরাং তাঁহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। তাঁহাদের প্রতিবাদও অদ্বয়বাদীকে স্পর্শ করে না। তাঁহাদের লড়াই হাওয়ার সহিত।

অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি যাহাই হউন, কোনরূপ সগুণ ঈশ্বর নহেন। খ্রীষ্টানেরা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, বিধাতা, অসীমশক্তিশালী, ন্যায়বান্, করুণানিধান, এক নিরাকার ব্যক্তির—Person এর—অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্মকে যথাসাধ্য সেই খ্রীষ্টানি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত—অন্ততঃ অদ্বয়বাদপ্রতিপাদ্য

ব্রহ্মের সহিত—তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িকেরা ও দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা ও ঐশ্বরকারণিকেরা ঐরূপ এক জন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করেন—তবে খ্রীষ্টানেরা তাঁহাতে যে সকল গুণ অর্পণ করেন, ইঁহারা সকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন না। অনেকের মতে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ও সগুণ; আবার অনেকের মতে নির্গুণ অথবা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই সৃষ্টি অথবা ইঁহারই মায়া। কাহারও মতে ইনিই Universal Soul, জীব ইহারই অংশ; মুক্তির পর জীব ইঁহাতে লীন হইয়া যান। কেহ বা সে কথা বলিতে গেলে মারিতে আসেন। এই Universal Soul—এই জীব হইতে স্বতন্ত্র "ঈশ্বর"—যিনিই হউন, ইনি অদ্বয় বাদীর ব্রহ্ম নহেন; এবং যাঁহারা অদ্বয়বাদকে শ্রুতি-বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে ইনি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম নহেন।

তবে এই অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? অদ্বয়বাদী ব্রহ্ম শব্দের অর্থই আত্মা। ইনি আর কেহই নহেন—ইনি আত্মা—তোমরা যাহাকে জীবাত্মা বল বা জীব বল; ইনি সেই জীবাত্মা বা জীব। অদ্বয়বাদ মতে পরমাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পরমাত্মা নাম যদি নিতান্তই ব্যবহার করিতে হয়, উহা জীবাত্মার সহিত এক অভিন্ন ও সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আর একবার এইখানে বলিয়া রাখি, অদ্বয়বাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। অদ্বয়বাদী ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে কথা তুলিবারই কোন প্রয়োজন নাই। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ স্বীকার্য্য হউক আর না হউক, তাহাতে আপাততঃ কিছুই যায় আসে না। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি, তাহা বুঝিয়া দেখাই বর্ত্তমান আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই অদ্বয়বাদকে খাঁটি Idealism বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন।

বার্কলির idealismএর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড়জগতের পারমার্থিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। অদ্বয়বাদীও স্বীকার করেন না। উভয়েরই মতে প্রতীয়মান জগৎ প্রত্যয়সমষ্টিমাত্র। এই প্রত্যয়স্বরূপ জগৎ যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত হয়, তাহার নাম আত্মা। বার্কলি ও অদ্বয়বাদী উভয়েই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের উভয়ের নিকট এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন সাক্ষী না থাকিলে জগৎ কেবল অসম্বদ্ধ প্রত্যয়পরম্পরায়, ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত হইত। বার্কলির ভাষায় এই চেতন আত্মাই রূপ দেখে ও শব্দ শুনে ও আপনাকে রূপের দ্রষ্টা ও শব্দের শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন আত্মা না থাকিলে রূপ হয়ত থাকিত, শব্দ হয়ত থাকিত; কিন্তু রূপ শব্দ শুনিতে পাইত না ও শব্দ রূপ দেখিতে পাইত না; রূপের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক থাকিত না। বৌদ্ধগণ জগৎকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি বা প্রত্যয় পরম্পরা বলিয়াই জানেন; তাঁহারা এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে হিউম স্বীকার করেন না। হিউম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাঁহারা সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান; আমি কিন্তু এই আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই। আত্মাকে খুজিতে গিয়া কেবল একটা না একটা প্রত্যয় দেখি, শীতাতপ, আলোআঁধার, সুখ-দুঃখ, এইরূপ একটা না একটা প্রত্যয় দেখি; এই প্রত্যয়, এই ক্ষণিক বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্ব্বস্ব; সুষুপ্তির সময় যখন এই প্রত্যয়গুলি লীন হইয়া যায়, তখন আমিও থাকি না। বার্কলির সহিত ঐ পর্য্যন্ত অদ্বয়বাদীর মিল আছে। কিন্তু তাহার পরে আর মিল নাই। অদ্বয়বাদীর মতে আত্মা বহু নহে, আত্মা একমাত্র। সে কোন্ আত্মা? আমিই সে

আত্মা। অন্য মনুষ্যে আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব আরোপে অদ্বয়বাদী কুণ্ঠিত। তাহার কারণ কতকটা বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। সেই প্রত্যক্ষ বিষয় দেহ দেখিয়া ও তাহার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তোমার আত্মার অস্তিত্ব আমি অনুমান করিয়া থাকি। তোমার দেহ প্রত্যক্ষ বিষয়—তোমার আত্মা প্রত্যক্ষ বিষয় নহে, অনুমান বিষয় মাত্র। কিন্তু তোমার দেহেরই পারমার্থিক অস্তিত্ব যখন আমি স্বীকার করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আত্মারও পারমার্থিক অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আমার আত্মা যেরূপ আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তোমার আত্মা সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুও নহে। এইখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, সাংখ্যদর্শনসম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়—তাহা হইলে এখানে সাংখ্যের সহিতও বেদান্তীর ভেদ। সাংখ্য বহুপুরুষবাদী; বেদান্তী একপুরুষবাদী বা একাত্ম-বাদী। বেদান্তের আত্মা আমার আত্মা—অর্থাৎ আমি। তদ্ভিন্ন অন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম জীবাত্মা বা জীব।

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ নামক একটা কল্পিত পদার্থকে আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার প্রতি আমার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। এই বিশ্বজগৎ আমার নিকট নিয়মিত সুব্যবস্থ জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। এই জগতের মধ্যে শীতগ্রীষ্ম দিবারাত্রি নিয়মমত পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদিত ও অস্তগত হয়। আগুনে হাত পোড়ে, অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি বিবিধ নিয়ম ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা এই জগতে

আমি দেখিতে পাই। এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্যা। হিউম এবং বৌদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা নাই; কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরামাত্র আছে। উহাদের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রত্যয়ের পর আর একটা প্রত্যয় আসিয়া থাকে। অন্নভোজনরূপ প্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তি নামক প্রত্যয় উপস্থিত হয় এইমাত্র—কিন্তু উপস্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কেননা উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী। একের সহিত অন্যের ঐ পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপ যে ঘটিতেই হইবে, এরূপ কোন কারণ নাই। কেন অন্যরূপ না ঘটিয়া ঐরূপই ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর্থক—কেননা ঐরূপ না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঠিক সেই প্রশ্নই উঠিত। আতাফল ভূমিতে কেন পড়ে, অগ্নিস্পর্শে কেন যন্ত্রণা হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; আতাফল যদি ঊর্দ্ধগামী হইত, অগ্নিস্পর্শে যদি আরাম হইত, তাহা হইলেও কেন তেমন হয়, এই প্রশ্ন উঠিত; তাহারও উত্তর দিতে পারিতাম না। যখন একরূপ না একরূপ ঘটিতেই হইবে, তখন যাহা ঘটিতেছে, তাহাই মানিয়া লও। কেন এরূপ হইল, কেন ওরূপ হইল না, এ তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, উহা অবিদ্যা। হিউম বলেন, ও সকল প্রশ্নের উত্তর নাই; উহা হেঁয়ালি।

বার্কলি জগতের এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এক বৃহৎ চেতন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাকে Universal Soul বা Active Reason এইরূপ একটা নাম দেওয়া হয়। বার্কলি খ্রীষ্টান ছিলেন; তিনি বলেন, এই বৃহৎ চৈতন্যময় পদার্থই খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বা খোদা—এবং ইনিই প্রতীয়মান

জগতে নিয়মের ব্যবহারের ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা। জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্পিত বিশ্বজগতে স্বেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রত্যয়গুলিকে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সেইজন্য একের পর অন্যটি ঘটে। তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই ঘটে; অন্যরূপ বিধান করিলে অন্যরূপই ঘটিত। সেইজন্য পরিমিত সঙ্কীর্ণ জীবাত্মা সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অন্যরূপ ঘটিতে দেখে না। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে সূর্য্য উঠে, যথাকালে ঋতুপরিবর্ত্তন হয়, যথাকালে জীবের জন্মমরণ ঘটে, যথানিয়মে সুখদুঃখের আবির্ভাব তিরোভাব হয়—প্রত্যয়সমষ্টিরূপ প্রত্যক্ষ জগৎচক্রের নেমি যথানিয়মে আবর্ত্তন করে।

প্রতীয়মান বাহ্য জগতে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতু প্রদর্শনের জন্য বার্কলি তাঁহার ঐশ্বরিক আত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন। অচেতন জড়জগতের প্রত্যয়স্বরূপ উপাদানগুলি আমরা নির্দ্দিষ্ট বিধানমত সজ্জিত ও বিন্যস্ত দেখিতে পাই। কে তাহাদিগকে এইরূপে সাজাইল? এই সজ্জায় ও বিন্যাসে কেবল যে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে তাহা নহে; উহাতে একটা উদ্দেশ্যের, একটা লক্ষ্যের, একটা designএর পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের স্রোত যথানিয়মে চলিয়াছে—কিন্তু একটা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীনকালের কুজ্ঝটিকাকার নীহারিকা হইতে কেমন সুন্দর সুব্যবস্থ সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ধরাপৃষ্ঠে কেমন বিবিধ জীবের বিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে; কেমন নূতন উৎকৃষ্ট জীব পুরাতন অপকৃষ্ট জীবের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত এই অত্যুন্নত মনুষ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। সমগ্র জগৎযন্ত্রটি যেমন তারে তারে চাকায় চাকায় গাঁথা; এখানের চাকাখানি কেমন ওখানের চাকাখানিকে নিয়মিত

করিয়া রাখিয়াছে। লাপ্লাসের ধীশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, সৌরজগৎ রূপ বিশাল যন্ত্রটি কেমন স্থিতিশীল ; এতগুলি বৃহৎ জড়পিণ্ড পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষাপথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জগদ্‌যন্ত্রের এই বৃহৎ উদ্দেশ্য, এই design, এই বড়হাতের-P-যুক্ত Purpose, মন্দমতিকে বুঝাইবার জন্য মহামহাপণ্ডিতে মিলিয়া এতগুলা Bridgewater Treatiseই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। যন্ত্রটির নির্ম্মাণেই কেমন মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পর্দ্ধিত মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত কোটি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার উৎপত্তির জন্য পরামর্শ চলিতেছিল। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাশ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, মনুষ্যকে কেন্দ্রগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবার জন্যই এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কারখানাটা এত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জড়জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল ক্ষতি নাই ; কিন্তু সেই প্রত্যয়-সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইল কে ? তাহারা আপনা হইতে ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে আপনাদিগকে ঐরূপ উদ্দেশ্যের অভিমুখ করিয়া ঐরূপে যথানিয়মে ব্যবস্থিত করিয়া লইয়াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন মানে না। অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, ঐরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপও হইতে পারিত। যাহা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর ; কেন হইয়াছে ওরূপ প্রশ্ন করিও না। কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না।

জড়জগৎকে ঐরূপ নিয়মে স্থাপনের জন্য, ঐরূপ একটা উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইবার জন্য, একজন নিয়ামকের প্রয়োজন, একজন

ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন, একজন উদ্দেশ্যবান্ ইচ্ছাশালী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চেতন পুরুষের প্রয়োজন; একজন Personএর প্রয়োজন। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Argument from Design. বার্কলি এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন বৃহৎ আত্মার, অর্থাৎ চৈতন্যময় জীব হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর চৈতন্যময় ঈশ্বরের, কল্পনা করিয়াছেন। ইতর লোকে এই জন্য জগৎরূপী-বৃহৎ-ঘট-নির্ম্মাতা বৃহৎ-কুম্ভকাররূপী ঈশ্বরের কল্পনা করে। চেতনাসম্পন্ন জীবের ঐরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের, ঐরূপে একটা উদ্দেশ্যের অনুকূলে সাজাইবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই এই বৃহৎ উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য বৃহৎ চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। এখন অদ্বয়বাদী বৈদান্তিক এক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা যাউক।

অদ্বয়বাদী বৈদান্তিকও জড়জগতে এই ক্ষমতা অর্পণে কুণ্ঠিত। প্রত্যয়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে ঐরূপে বিন্যস্ত ও ব্যবস্থিত করিবে, ইহা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদান্তমতে প্রত্যয়-সমূহ জড়পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড়-পদার্থ বলি, বৈদান্তিক তদ্ব্যতীত অন্যান্য পদার্থকেও জড় পদার্থ বলিতেন। একালে যাহাকে matter বলে, বেদান্ত মতে তাহা প্রত্যয়সমষ্টি—তাহা ত অচেতন জড় বটেই। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থও বৈদান্তিকের ভাষায় জড়পদার্থ—কেন না উহাদের নিজের চেতনা নাই। আত্মাই চেতন। আত্মা যাহা দেখে, যাহা শুনে, বা যদ্দ্বারা দেখে, যদ্দ্বারা শুনে, সে সকলই অচেতন জড়। চন্দ্র সূর্য্য গাছপালা প্রভৃতি যাহা দেখা যায়, যাহা প্রত্যক্ষগোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেই; ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকলের সাহায্যে আত্মা এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তাহারাও অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহারা আপনারা আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ।

আত্মাই স্বপ্রকাশ; আর সকলই তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কাজেই জগদ্‌যন্ত্র আপনা হইতে নিয়মিত, সুসংযত, সুসজ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, উদ্দেশ্যানুকূল হইতে পারে না; উহাকে সাজাইতে গোছাইতে উদ্দেশ্যানুকূল করিতে চেতন আত্মার প্রয়োজন। কিন্তু সে কোন্ আত্মা? বার্কলি বলিবেন যে সে বিশ্বাত্মা—বৃহৎ ঐশ্বরিক আত্মা—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় চৈতন্যরূপী ঈশ্বর—তিনি ঐরূপে সাজাইয়াছেন বলিয়া ইতর সঙ্কীর্ণ পরিমিত জীবাত্মা ঐরূপ সজ্জিত দেখে। হিউম এই খানে আসিয়া বলিবেন, আচ্ছা, জড়জগতের সৃষ্টির জন্য, জড়জগৎকে সুনিয়ত করিয়া সাজাইবার জন্য, যদি একজন চেতন পুরুষের নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তজ্জন্য ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি? অন্য কোন চেতন পুরুষেও সেই বিধানক্ষমতা, সেই নিয়মরচনার ক্ষমতা অর্পণকরিতে ক্ষতি কি? "Not only the will of the Supreme Being may create matter, but for aught we know a *priori*, the will of any other being might create it" বৈদান্তিক হিউমের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন; তিনিও জোরের সহিত এইখানে আসিয়া বলেন, রহ, তজ্জন্য জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার প্রয়োজন দেখি না; আমাকে ছাড়া আর আত্মা নাই এবং আমিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যরূপী মহেশ্বর। আমিই এই প্রতীয়মান বিশ্বে ঐরূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—আমিই আমার কল্পিত জগৎকে ঐরূপ উদ্দেশ্যানুকুল করিয়া সাজাইয়াছি—আমিই জগতের স্রষ্টা কর্ত্তা ও বিধাতা—আমিই পরমাত্মা ও আমিই ব্রহ্ম।

কথাটা ঠিক হউক আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর হইতে পারে না। বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোঽহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি। ইহা শ্রুতিসম্মত মহাবাক্য। ইহার অর্থ লইয়া গণ্ডগোল নিষ্ফল। ইহার অর্থ অতি

স্পষ্ট। ইহার সত্যতা লইয়া তর্ক তুলিতে পার—এই মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা লইয়া বিচার করিতে পার; কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিসংবাদের কোন অবকাশ নাই।

বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্য বেদান্তবাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা সহস্র স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজিতে যাহাকে Ego বলে বা Self বলে তাহাই; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্মা; আমা ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা কিছুই নাই। ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—ইহাই জীবব্রহ্মের অভেদবাদ। আমা ছাড়া জীব নাই—আমা ছাড়া ব্রহ্ম নাই—আমিই জীব ও আমিই ব্রহ্ম। যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই অমনি কোলাহল উঠিবে। রামানুজ স্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবেন, কেহ ভ্রূকুটী করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জ্জন করিবেন। বলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ, এই সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, সংসারচক্রে ঘূর্ণমান, জরামরণশীল, দুর্ব্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে সে জগৎকর্ত্তৃত্ব, জগৎবিধাতৃত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তার স্পর্দ্ধা করে। এই "minute philosopher, not six feet high"—এই ব্যক্তি বিশ্বভুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাহে! হা হতোঽস্মি! হা দগ্ধোঽস্মি!!

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, কে বলিল যে আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, জরামরণশীল? কে বলিল আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নহি? কেন আমাকে ঐরূপে পরিমিত বিবেচনা করিব? ঐরূপ যদি মনে করি, তাহা আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয়

হইলেই বুঝিব, অখিল প্রপঞ্চের স্রষ্টা বিধাতা নিয়ন্তা আমিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল আমি সুখদুঃখভোগী পরিমিতশক্তি জীবমাত্র? এই প্রপঞ্চ যখন আমারই কল্পনা, উহা যখন আমারই প্রত্যয়, এই স্থূলদেহ, এই জন্মজরামরণ, এই সুখদুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা। বস্তুতঃ আমি এ সকল হইতে মুক্ত; নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত মনে করাই অবিদ্যা। এইটুকু জানারই নাম অবিদ্যার ধ্বংস—তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি।

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ইহা অদ্বয়বাদীর নিতান্তই গায়ের জোর। জীবের সঙ্কীর্ণতা মানিব না বলিলেই কি চলিবে? এক মুষ্টি অন্ন যাহার জীবত্বের ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথা বাতুলের প্রলাপ। কাজেই প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; একের নাম Subject বা বিষয়ী; অপরের নাম Object বা বিষয়। যে উপলব্ধি করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা বিষয়। এই বিষয়ী আমি—অহং-পদবাচ্য; আর এই বিষয় তুমি—ত্বং-পদবাচ্য। তুমি শব্দে কেবল আমার সম্মুখবর্ত্তী তোমাকে মাত্র বুঝায় না। তুমি বলিতে, তিনি, সে, রামশ্যাম হরি, বাঘ ভালুক, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য্য, লোষ্ট্র ইষ্টক সবই বুঝায়। কেন না এ সকলই কোন না কোন সময়ে তোমার স্থলবর্ত্তী হইয়া আমার উপলব্ধির বিষয় বা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে বা হইতে পারে। কাজেই এ সকলই বিষয়-শ্রেণিভুক্ত। এমন কি আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এ সকলও আমি কোন না কোন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি।

কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমগ্র বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তুকে অর্থাৎ তোমাকে, তাঁহাকে, রামশ্যামহরিকে, আমারই মত চেতনা-সম্পন্ন বলিয়া মনে করি; আর চন্দ্রসূর্য্য গাছপালা লোষ্ট্রইষ্টকাদিকে চেতনাহীন বলিয়া মনে করি। উহা কেবল লোকব্যবহারের জন্য; উহা ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবনযাত্রার সুবিধা হয় এই মাত্র; কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই ব্যবহারমাত্র—সুতরাং পারমার্থিকভাবে অসত্য। বিষয়ী আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ—আর আমা ছাড়া যাহা কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর বা অনুমানগোচর, যাহা আমার বিষয়, তাহা চেতনাহীন পদার্থ। উহার কোন অংশে যদি চৈতন্য কল্পিত হয় বা অনুমিত হয়, সে আমারই কল্পনা বা অনুমান মাত্র; কাজেই সে চৈতন্যের স্বাধীন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। আপাততঃ এই বিষয়ী আমাকে জীব আখ্যা দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত বিষয়কে জগৎ আখ্যা দেওয়া যাউক।

এই জীবের ও এই জগতের পরস্পর সম্বন্ধ কি? আপাততঃ মনে হয়, জগৎ আমার বাহিরে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। সাংখ্যবাদী তাহাই বলেন; জড়বাদিগণও তাহাই বলেন। আরও মনে হয়, এই বিষয়ের সহিত আমার নিত্য আদানপ্রদান কার-বার চলিতেছে; শব্দস্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার চেতনায় আঘাত করিতেছে; তজ্জন্য আমার সুখদুঃখ ভোগ ঘটিতেছে। মনে হয়, আমি সর্ব্বতো-ভাবে বিষয়ের অধীন ও বিষয়ের বশীভূত; বিষয়ের কোন কোন ক্রিয়া আমার প্রাণযাত্রার অনুকূল; কিছু বা প্রতিকূল। যাহা অনুকূল, তাহা আমার উপাদেয়; যাহা প্রতিকূল, তাহা আমার হেয়। উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার জন্য, হেয়কে বর্জ্জন ও পরিহার করিবার জন্য, আমি সর্ব্বদা কর্ম্মশীল; তদর্থ আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা চেষ্টাশীল ও

কর্ম্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন। বিষয়ের সহিত আমার যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণকে আমি আমার জন্মকাল বলি; বিষয়ের সহিত কারবার যত দিন চলিতে থাকে, ততদিন আমার বৃদ্ধি বিপরিণাম ক্ষয় ঘটে; ও যে সময়ে কারবার থামে, সেই সময়কে মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই সমগ্রকাল ধরিয়া আমি বিষয়াধীন থাকিয়া হেয় বর্জ্জন ও উপাদেয় গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন হইয়া আমাকে বিবিধ কর্ম্ম করিতে হয় ও সেই সকল কর্ম্মের যথানিয়মে ফল ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষয়ের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তৎপরেও অন্যস্থানে অন্য দেহ ধারণ করিয়া আমাকে অন্য কর্ম্ম করিতে হয় ও তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ আমার জন্মের পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ অন্য স্থানে অন্যদেহে বিষয়ের সহিত আমার কারবার চলিয়াছিল; তাহার স্মৃতি এখন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহার ফলভোগ হয়ত অদ্যাপি করিতে হইতেছে। এইরূপ মনে না করিলে, জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া না বুঝিলে, এ জন্মের সকল সুখদুঃখের হেতু নির্দ্দেশ হয় না। জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য—moral justification—ঘটে না।

এইরূপে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবারের আরম্ভ, আমার এই সুখদুঃখভোগ, আমার এই কর্ম্মপরতা, কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহাও বলা দুষ্কর। এই জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী বিষয়-বিষয়ীর পরস্পর আদানপ্রদান—ইহার নাম সংসার। ইহাতে কখন বা আমি বিষয়কে আত্মজীবনের অনুকূল করিয়া লইয়া সুখী হই, কখনও বা বিষয়কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখ ভোগ করি। চক্রনেমির আবর্ত্তনের সহিত আমার এই দশাবিপর্য্যয়কে উপমিত করা চলে। আমাকে আমি এই সংসার চক্রে

ঘূর্ণমান পরিমিত কর্ম্মবন্ধনবদ্ধ বিষয়াধীন জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ঐ বিষয় সর্ব্বতোভাবে আমা হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বহিঃস্থ, ও আমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা আপন নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার প্রভুত্ব নাই; কখন বা আমি চেষ্টা দ্বারা নিয়মকে আমার অনুকূল করিয়া লই বটে, কিন্তু সেই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে আমার অনধীন ও শেষ পর্য্যন্ত উহা আমাকে পরাভব করে; তখন আমি জগদ্‌যন্ত্রের চাকার তলে দলিত পিষ্ট অভিভূত হইয়া থাকি।

আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ আপাততঃ আমার ঐরূপ বোধ হয়। বোধ হয়, জীব ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ। জীব জগতের অধীন এবং জগতের অধীনতাবশে সুখদুঃখভাগী ও জরামরণশীল। বৈদান্তিক এইখানে আসিয়া বলেন, যাহা মনে করিতেছ, তাহা ভুল। জীবের স্বভাব ঐরূপ নহে, জগতের স্বরূপও ঐরূপ নহে; এবং উভয়ের সম্বন্ধ যাহা ভাবিতেছ, ঠিক্ তাহার উল্টা। ঐ যে জগৎ, ঐ যে বিষয়, উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; উহা বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত পদার্থ। পরমার্থতঃ উহা স্বপ্নবৎ অলীক পদার্থ। এ কথা যে বৈদান্তিক একা বলেন, তাহা নহে। ইহা প্রাচ্য দার্শনিকের আজগুবি নহে। বার্কলি ও হিউম হইতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও টমাস হেনরি হক্‌সলী পর্য্যন্ত সকলেই জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন, তিনি করুন। আমরা সেই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা তাঁহাদের সহিত মানিয়া লইব, বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহা বিষয়ীর কল্পনামাত্র। বিষয়ী উহাকে সৃষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এই খানে সৃষ্টি শব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। ইংরেজিতে যাহাকে creation বলে, আজকাল আমরা সৃষ্টি শব্দ সেই

অর্থে ব্যবহার করি। ইংরেজি creation শব্দে কখনও গঠন বা নির্ম্মাণ বুঝায়, কখনও অভিব্যক্ত করা বা মূর্ত্ত্যন্তর দেওয়া বুঝায়, আবার কখনও বা অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপাদন বুঝায়। কিন্তু বিষয়ী যে অর্থে বিষয়কে সৃষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ঐরূপ creation বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি শব্দের অর্থ কি, তাহা ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহার সাংখ্যদর্শন পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। "সৃজ ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। যেমন গুটিপোকাতে রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ নরনারী যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্তজগতের বা স্থূলভূতসংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি" (সাংখ্যদর্শন ৩৬ পৃঃ)। আমরাও সৃষ্টি শব্দ ঠিক্ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম। বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে তিনি সাংখ্যমত বুঝাইতেছেন; আমরা বেদান্ত মত বুঝাইতেছি। সাংখ্য বহু জীবের, বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈদান্তিক এক জীবের, এক পুরুষের, এক আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বটব্যাল মহাশয় যেখানে 'নরনারী' বলিয়াছেন, বেদান্তী সেখানে কেবল 'জীব' অথবা 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করিবেন। অপিচ সাংখ্য জ্ঞেয় নামক পদার্থের—প্রকৃতির—স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন; তবে এই জ্ঞেয় প্রকৃতি তাঁহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে; উহা কোন অনির্ব্বাচ্য

বস্তু, যাহা আত্মার বা পুরুষের সন্নিধানে আসিয়া আত্মার সৃষ্টিক্ষমতা-বলে পরিদৃশ্যমান প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয়। বেদান্ত সেই স্বতন্ত্র অনির্ব্বাচ্য জ্ঞেয় প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না। কাজেই যিনি বৈদান্তিক, তিনি বটব্যাল মহাশয়ের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিবেন, "যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয় পদার্থে পরিণত করে, তদ্দ্বারা ব্যক্ত জগতের নির্ম্মাণ করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়,—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি।"

বেদান্ত মতে জ্ঞেয় ব্যক্ত প্রতীয়মান জগতের স্বরূপ কি, তাহা বলা হইল। উহা আত্মারই সৃষ্ট, আত্মারই কল্পিত ; উহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। এ বিষয়ে প্রাচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য দর্শন এক মত।

তৎপরে কথা, আত্মার স্বরূপ কি ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদী প্রাচ্য দার্শনিক ও হিউম ও হক্সলির ন্যায় প্রতীচ্য দার্শনিক এই আত্মারও অস্তিত্ব মানেন না। বেদান্ত উহার অস্তিত্ব মানেন ; ভুলই হউক আর ঠিক্ই হউক, মানেন ; এবং বলেন এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ ; ইহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এখন এই আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। বেদান্তমতে আত্মাই যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সেই বিশ্বজগৎ যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারেই অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, তখন আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিতে হয়। বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন। বেদান্ত আত্মাকেই পুনঃ পুনঃ ঐ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আত্মা সর্ব্বজ্ঞ—নতুবা অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্‌যন্ত্র চালান সম্ভবপর হইত না ; আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, নতুবা পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান,

সে সকলেরই তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। এইরূপে আত্মায় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা আরোপ করিয়া বেদান্ত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে ঈশ্বর এই নাম দিয়াছেন। এখন বলা বাহুল্য, এই বেদান্তের ঈশ্বর খ্রীষ্টানসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃত ঈশ্বর নহেন। নৈয়ায়িকাদি ঐশ্বরকারণিক দার্শনিকেরা জীব হইতে স্বতন্ত্র যে জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বরও নহেন। বৈষ্ণবদিগের ভাষা সকল সময়ে বুঝা যায় না। বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও অনেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব ও সেব্যসেবকসম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এরূপ ভাষায় কথা কহিয়াছেন, যে তাঁহারা বেদান্ত স্বীকৃত আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহা বলা দুষ্কর। বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহতত্ত্বের সহিত বৈদান্তিক অদ্বয়তত্ত্বের সমন্বয়-চেষ্টা দেখিয়াছি। তবে বৈষ্ণবসমাজের নেতৃগণের নিকট এই সমন্বয়-চেষ্টা অনুমোদিত হইবে কি না, জানি না। অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, অদ্বয়মতে আমিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের স্রষ্টা বিধাতা ও সংহর্ত্তা। পরিদৃশ্যমান চরাচরের "জন্মাদি" আমা হইতেই।

এইরূপে বেদান্ত আত্মায় জগৎকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরপদবাচ্য করেন ও সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি তাঁহাতে অর্পণ করেন। আবার অন্য দিকে তিনিই আত্মাকে সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত নিরুপাধিক শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই একটা মহা সমস্যা। আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাৎপর্য্য আগে বুঝা যাউক। আমি আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। ইহা আমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংস্বরূপ, আমি কেমন, ইহা বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না যাহা কিছু জ্ঞান-গম্য, তাহাই ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য ও বর্ণনীয়; কিন্তু যাহা জ্ঞানগম্য,

তাহা বিষয়শ্রেণিভুক্ত, তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থাৎ বিষয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে আত্মা বিষয়ী না হইয়া বিষয়ের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম, কোন ভাষায় বর্ণনীয় গুণ, আত্মায় আরোপ করা চলে না। কাজেই আত্মাকে ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের সহিত আত্মাকে না পাইয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। বড় জোর তাহা বিশুদ্ধ চেতনাস্বরূপ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু সেই চেতনা আবার কি, তাহা বুঝান চলে না।

এইরূপে বেদান্ত আত্মাকে নির্গুণ নিরুপাধিক অনির্ব্বাচ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। হিউমের ন্যায় প্রপঞ্চ-মাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়া বলেন, যাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার উপায় নাই, তাহার অস্তিত্ব-স্বীকার বৃথা জল্পনা। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই বলেন। তিনি বলেন, যদি বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্ব্বাচ্য পদার্থ থাকে, ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহাকে শূন্য বলাই ভাল। বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, আমি উহাকে শূন্য বলিতে প্রস্তুত নহি। শূন্য বলারও যে ফল, নাস্তি বলারও সেই ফল। উহা নাস্তি, ইহা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। উহা নাস্তি নহে; আমি জানিতেছি, উহা অস্তি; উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি। অথচ উহা কেমন, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাষা পাই না, অতএব নাই—নাস্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ। বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে পারি না, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ দিব।

মনে কর, সবুজ রঙ ; সবুজ রঙ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি ; উহা আমার একটা পরিচিত প্রত্যয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে সবুজ রঙ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশা নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অন্ধ নহে, অথচ সবুজ রঙ কখনও দেখে নাই, তাহাকেও আমি বর্ণনা দ্বারা, সবুজ রঙ কি তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে একটা গাছের পাতা তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারি, যে ইহাই সবুজ রঙ। জন্মান্ধকে যেমন রঙ বুঝান যায় না, তেমনি জন্মবধিরকে শব্দ বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা আমি জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি ; উহার একটা নাম দিতেও পারি ; কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে পারি না। হিউমের মত যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহাকে আমরা জোর করিয়া উহা উপলব্ধি করাইতে পারি না। আবার আত্মা যদি একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য কিছু থাকিত, তাহা হইলেও সেই বস্তু নাস্তিককে দেখাইয়া বলা যাইতে পারিত, এই আত্মা, অথবা আত্মা ইহারই মত। কিন্তু আত্মা বহু নহে ; উহার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য কোন বস্তু নাই ; উহা এক অদ্বিতীয় চেতন পদার্থ ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। কাজেই যতক্ষণ নিজে না বুঝিবে, ততক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইবার উপায় নাই।

তবে গোল এই যে বেদান্ত এক মুখে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অন্য মুখে আবার তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ-কারণ ঈশ্বর বলিয়া বিবৃত করেন, এ কিরূপ? ইহার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঐ প্রকাণ্ড উপাধি বর্ত্তমান থাকিতে আত্মাকে নিরুপাধিক বলিব, একি ব্যাপার? একবার বলিতেছি আমি জগতের স্রষ্টা ; আবার বলিতেছি, আমি গুণবর্জ্জিত ; এ কিরূপ ব্যাপার?

বেদান্ত এইরূপে উত্তর দেন। বেদান্ত বলেন, এই সর্ব্বজ্ঞতা

সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি ভুয়া উপাধি—উহা অধ্যাস। যাহা যা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নহে; উহাকে সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ। আত্মায় কোন গুণ নাই, কোন উপাধি নাই; উহাতে যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উপাধি আরোপ করা হয়, উহাও অধ্যাস বা মিথ্যা ধর্ম্মের আরোপ। রজ্জু সর্পের মত দেখাইলে উহা সর্প হয় না; আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও উহা সোপাধিক হয় না; প্রকৃত পক্ষে উহা নিরুপাধিক। উপাধি কেবল ভ্রম।

কি সর্ব্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, তবে এতক্ষণ ধরিয়া এত দুন্দুভিধ্বনি সহকারে প্রতিপক্ষসহ এত বিতণ্ডার পর, আত্মাকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এই যে প্রতিপাদন করিলে, বিশ্বজগতের কর্ত্তা আর কেহ নহে, আমি স্বয়ং; বিশ্বজগতের আমিই সৃষ্টি করিয়াছি; আমিই আমার উদ্দেশ্যানুরূপ করিয়া চালাইতেছি; এসব কি নিরর্থক? এতক্ষণ বলিতেছিলে সত্য, এখন বলিতেছ মিথ্যা; তোমার কথার মানে বোঝাই দায় হইল। তোমার কোন্ কথাটা গ্রহণ করিব?

বেদান্তী বলেন, বন্ধু হে, একটু স্থির হও। আমার ভাষাটা হেঁয়ালি গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে হেঁয়ালি থাকিবে না। ভাষাটা বড় অদ্ভুত জিনিষ; সত্য মিথ্যা এই শব্দ দুটাই অনেক সময় গণ্ডগোল বাধায়। যাহাকে সত্য বলা যায়, তাহা এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যাহাকে মিথ্যা বলা যায়, তাহা একার্থে মিথ্যা, অন্য অর্থে সত্য। মনে কর মরীচিকা—মরুভূমিতে জলভ্রম—ইহা সত্য না মিথ্যা? এক হিসাবে ইহা সত্য। যাহাকে আমরা জল বলি, তাহা একটা প্রত্যয়মাত্র বা কতিপয় প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র—কতিপয় প্রত্যয় যুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ হইলে উহাকে

জল বলা যায়। বস্তুতঃ জল বলিয়া আমার বাহিরে কিছু নাই। কিন্তু জলবুদ্ধি আছে; জলের প্রত্যয়টা আছে। মরীচিকাতে যে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে, উহা জলেরই প্রত্যয়। যতক্ষণ ঐ প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা জলেরই প্রত্যয়—যে প্রত্যয়সমষ্টিকে আমি জল নাম দিই, উহা সেই প্রত্যয়সমষ্টি। কাজেই উহা সত্য; অন্ততঃ যতক্ষণ মরীচিকা থাকে, যতক্ষণ ঐ জল প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা সত্য। তার পর যখন অন্য প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রত্যয়কে ধ্বংস করে, জলপ্রত্যয় নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বলা যায়, ঐ পূর্ব্ববর্তী প্রত্যয় মিথ্যা। যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় ছিল, ততক্ষণ উহা সত্যই ছিল; ততক্ষণ তুমি মাথা খুঁড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য প্রত্যয় বলিতাম না। এখন যখন সে প্রত্যয় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত আছি। এতক্ষণ উহাকে সত্য বলিতেছিলাম; কিন্তু এখন জানিতেছি, উহা স্থায়ী সত্য নহে, উহা তাৎকালিক সত্য। যাহা স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তৎকালে যে সত্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারই নাম অধ্যাস। এখন নূতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নূতন বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; অধ্যাস কাটিয়া গিয়াছে। সেইরূপ রজ্জুকে যখন সর্প বোধ হয়, ঐ বোধও একটা প্রত্যয়; তৎকালে উহা সত্য। কিন্তু সর্পবুদ্ধি কাটিয়া গেলে জানিতে পারি, ঐ বুদ্ধি তাৎকালিক সত্য মাত্র। এইরূপ স্বপ্ন এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই নাই। কাহারও সাধ্য নাই, উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত হইলে সে অধ্যাস যায়; তখন উহা সত্য নহে, জানিতে পারি।

আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য মিথ্যা ঠিক্ এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

এই যে জড়জগৎ, যাহা আমার বাহিরে আমি দেখি, উহাও একার্থে

সত্য, অন্য অর্থে সত্য নহে। যতক্ষণ উহাকে আমি আমার বাহিরে আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখি, ততক্ষণ উহা সত্য—কাহার সাধ্য উহাকে মিথ্যা বলে। তখন উহা সত্য—উহা তাৎকালিক সত্য—উহা ব্যাবহারিক সত্য—কেন না উহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বুদ্ধিগোচর প্রত্যয়ের সমষ্টি। উহার এই সত্যতা স্বীকার করিয়াই আমার জীবন-যাত্রা চলিতেছে; নতুবা আমার জীবন কোথায় থাকিত; আমার প্রাণ যাত্রা অসম্ভব হইত। যতক্ষণ উহাকে ঐরূপ সত্য মনে করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য, উহা কোথা হইতে আসিল বুঝাইবার জন্য, উহার নির্ম্মাতার, উহার সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বকল্পনা আবশ্যক হয়। তা ত হইবেই। উহা যখন সত্য—তাৎকালিক সত্য, তখন উহার উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেই হইবে। তখন আমরা অন্য কারণের সন্ধান না পাইয়া, প্রচলিত কারণের অসঙ্গতি দেখাইয়া, আত্মাকেই উহার কারণ, আত্মাকেই জগতের স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যতক্ষণ এই জগৎ সুব্যবস্থ সুনিয়ত উদ্দেশ্যানুযায়ী বৃহৎ যন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ যাহাকে সেই যন্ত্রের নির্ম্মাতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই। অচেতন জড়জগৎ যখন আপনাকে আপনি উদ্দেশ্যমুখে চালাইতে পারে না, তখন যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমি জানি, সেই চেতন আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। জড়জগৎ যে হিসাবে সত্য, আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও ঠিক্ সেই হিসাবে সত্য। ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের কারণ নাই।

কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ স্বপ্নসদৃশ, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি উহা একটা অধ্যাসমাত্র। যাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি-

য়াছি, তখন সেই আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন বুঝিতে পারি যাহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, উহা তাৎকালিক ব্যাবহারিক সত্য মাত্র, স্থায়ী পারমার্থিক সত্য নহে। সেই কল্পিত জগতে যে নিয়মের, যে ব্যবস্থার, যে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দেখিতেছিলাম, জগৎই যখন কল্পনা, তখন সে সকলই কল্পনা। জগৎই যখন অধ্যাস, সে সকলই তখন অধ্যাস। তখন সেই মিথ্যা জগতের স্রষ্টা বিধাতা নিয়ন্তা কল্পনারই বা প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার সৃষ্টি কি? তাহার আবার নিয়ন্তা কি? ঐ সকল বিশেষণ তখন অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়।

বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্য, ঘোড়ার ডিমের যেমন অর্থ হয় না, অস্তিত্বহীন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা তেমনই অর্থশূন্য। জ্ঞানোদয়ে এই অর্থশূন্যতা বুঝিতে পারি। তখন আর আত্মায় কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপের আবশ্যকতা থাকে না। জগৎকে সত্য ধরিয়াই আত্মাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছিলাম। জগতের সত্য যখন ব্যাবহারিক সত্য হইল, তখন আত্মারও ঈশ্বরত্ব ব্যাবহারিক ভাবে সত্য। লোকব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য, আমি জগৎকে সত্য ও আত্মাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। জগৎকে যদি সত্য বল, আত্মাকেই উহার কর্ত্তা বলিতে হইবে। অন্য কর্ত্তা কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখন জগৎকেই মিথ্যা বলিয়া জানি, তখন আত্মাতে আর জগতের কর্তৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না। যাহা নাই, তাহার আর কর্ত্তা কি? কাজেই ব্যাবহারিক হিসাবে আত্মা ঈশ্বর ও সোপাধিক; পরমার্থতঃ আত্মা কর্তৃত্বহীন নির্গুণ ও নিরুপাধিক।

বেদান্তমতে আমি পরমার্থতঃ উপাধিশূন্য, কিন্তু ব্যবহারতঃ উপাধিযুক্ত। একভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত নাই, অন্য ভাবে দেখিলে আমিই জগৎকর্ত্তা। এই জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি,

যাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎকল্পিত সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখ্যা করি, ইহার পারিভাষিক নাম মায়া। বেদান্তের ভাষায়, আত্মা মায়োপাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায়া নামক উপাধি আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি। ঐন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে; সে ব্যক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শূন্যমধ্যে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে, কাটামুণ্ডে কথা কহায়, আমগাছে নারিকেল ফলায়, সেই ক্ষমতার নাম মায়া। বাহ্য জগৎ এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল; কাজেই যে পুরুষ সেই ইন্দ্রজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়া-নামক উপাধিযুক্ত। ঐন্দ্রজালিকের উৎপাদিত ঐ সকল অদ্ভুত দৃশ্যের বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই; ঐন্দ্রজালিকেরও বস্তুগত্যা আমগাছে নারিকেল ফলাইবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞলোকে ঐন্দ্রজালিকে যে অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, ঐন্দ্রজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই নাই। তবে যে সে ঐরূপ আশ্চর্য্য কৌশল দেখায়, তাহা দর্শকগণেরই অজ্ঞতার ফল। যে জানে, সে ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় প্রতারিত হয় না; সে ঐ সকল কৌশলকে মিথ্যা দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই জানে ও ঐন্দ্র-জালিককেও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে না। সেইরূপ আত্মা যে জগতের সৃষ্টি করে, সে জগৎও অলীক পদার্থ; যে ইহা জানে না, সে প্রতারিত হয়; তাহার নিকট আত্মা মায়াবী, অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ; আর যে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া জানে, সে জানে, আত্মায় ঐরূপ ক্ষমতার আরোপ আবশ্যক নহে। আত্মা প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ ও উপাধিশূন্য। যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে না, সে বদ্ধ; আর যে জানিয়াছে, সে মুক্ত।

বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহা এখন বুঝা যাইবে। উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝা গেল। বিষয় একটা অধ্যাস; উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষয়ীর ব্যাবহারিক ও পার-

মার্থিক উভয়বিধ অস্তিত্বই আছে; তবে ব্যবহারতঃ উহা মায়াবলে বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু পরমার্থতঃ উহা উপাধিরহিত নিষ্ক্রিয় কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হইতে পারে? আমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধীন সসীম সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখভাগী জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহা অধ্যাসমাত্র। প্রকৃত সম্বন্ধ ঠিক ইহার বিপরীত। আমিই বরং জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, বিধাতা, বলিলে ঠিক্ হয়। আমিই জগৎকে ঐরূপ ভাবে গড়িয়াছি ও ঐরূপ ভাবে চালাইতেছি, তাই জগৎ ঐরূপ দেখায় ও ঐরূপ চলে; এইরূপ বলিলে বরং ঠিক্ হয়। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে। পরমার্থতঃ আমি ঐরূপ কিছুই করি না। আমি ঐরূপ করি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আমি কিছুই করি না। ঐন্দ্রজালিক কাটামুণ্ডে কথা কহায় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধমাত্র; ঐন্দ্রজালিক তাহা করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীব।

এ পর্য্যন্ত যে আত্মার কথা বলা গেল, যাহাকে বিষয়ী বা জীব এই নাম দেওয়া হইল, সে আমি; আর কেহই নহে। আমিই একমাত্র জীব, এবং এই জীবই ব্রহ্ম, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন আবার পরমাত্মা নামটা বেদান্তের ভাষায় ব্যবহৃত হয় কেন? আত্মা বা জীবাত্মা বা জীব শব্দ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ চলে, তখন পরমাত্মা নামক আর একটা আত্মার কল্পনা করিয়া শেষে সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতিপাদনরূপ উৎকট পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাত্মা এই পৃথক্ নামকরণের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন কি, তাহা শারীরক ভাষ্যের আরম্ভেই একটি কথা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী ও বিষয় এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—বিষয়ী আমি, আর বিষয় আমাছাড়া আর সব। এই দুয়ের সম্বন্ধ আলো আর আঁধারের মত সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যাহা বিষয়ী, তাহা বিষয় নহে; যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে। যে দেখে সেই বিষয়ী, যাহা দেখা যায় তাহা বিষয়। কিন্তু তার পরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—এই বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমি যেমন তোমাকে জানি, রামকে জানি, শ্যামকে জানি, তেমনি আমি আমাকেও জানি। আমাকে আমি জানি না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। আমি একদিকে জ্ঞাতা, অন্য দিকে আমারই জ্ঞেয়; আমিই আমার অহংবৃত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগম্য, যাহা জানা যায়, তাহাকেই যদি বিষয় বলা যায়, তাহা হইলে আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও Ego নামক আমাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একেকে বলা হয় Empirical Ego—অর্থাৎ বিষয় আমি; অন্যকে বলা হয় Pure Ego বা Transcendental Ego—অর্থাৎ বিষয়ী আমি। বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয় আমার বা জ্ঞানগম্য আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা; আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা।

এই উভয় আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বলা বাহুল্য ইনিও যে আমি, উনিও সেই আমি। আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা আমি ও কর্ম্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। ইহাতে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা নাই। অথচ অন্যভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিরূপে, দেখা যাক।

আত্মা একাধারে বিষয়ী ও বিষয়—ভাষ্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। এই বিষয়ীর নাম পরমাত্মা ও বিষয়স্বরূপে প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্মা। আমিই আমাকে দেখি; যে আমি দেখে, সে পরমাত্মা; যে আমাকে দেখা যায়, সে জীবাত্মা। এই জ্ঞাতা আমি নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়; আর জ্ঞানের বিষয় আমি পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, জড়ের ঘাতপ্রতিঘাতে মুহ্যমান, জড়জগৎ কর্ত্তৃক অভিভূয়মান, জরামরণশীল, কর্ম্মপর, সংসারে ভ্রমমাণ। এইরূপে দেখিলে উভয়ে ভিন্ন, আবার উভয়েই এক। পরমাত্মাও যে জীবাত্মাও সে, বেদান্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত আক্রোশ। কিন্তু এই আক্রোশের কোন কারণই নাই। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে দ্বৈতবাদী হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির সরল অর্থ যে বিষয়ী আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি। যে দেখে ও যাহাকে দেখে, সে একই ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমিই আমাকে দেখি, এখানে দেখা ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েই এক অভিন্ন ব্যক্তি। ইহারই নাম অদ্বয়বাদ। আমি একজন ব্যতীত আর দুই জন নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ইংরেজিতে personal identity নামে একটা কথা আছে। উহার অর্থ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি। কিন্তু এই ঐক্য জ্ঞেয় আমার ঐক্য; জ্ঞাতা আমার ঐক্য নহে। কাল আমি আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক্ সেইরূপ দেখিতেছি না, কিন্তু বস্তুগত্যা সেই আমি অবিকৃত আছি, ইহা বুঝানই ঐ উক্তির তাৎপর্য্য।

উভয়েই এক, কেন না কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক্ সেই আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের ঐক্যে কেহ সন্দেহ করেন না। বাল্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার

বৃদ্ধ আমি একই আমি; সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। বোধ হইতেছে যেন আমার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বেও যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি।

জ্ঞেয় আমার বিকার সত্ত্বেও এই ঐক্য অর্থাৎ personal identity কিরূপ ঐক্য, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই ঐক্যকে ঐক্য বলা যাইতে পারে না। কাল যে গাছটি দেখিয়াছিলাম, আজও সেই গাছটি দেখিয়া আমি বলি, উহা সেই একই গাছ। কালিকার গাছে ও আজিকার গাছে এই ঐক্য প্রকৃত ঐক্য নহে। কাল উহাতে যে পাতা যে ফুল ছিল না, আজ সে পাতা সে ফুল জন্মিয়াছে। কাল উহাতে যটা ডাল ছিল, তাহা আজ নাই; ঝড়ে একটা ডাল ভাঙ্গিয়াছে। কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্ব্বাংশে এক নহে, উহা অংশতঃ এক। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে ঐ পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। একবারে অধিক পরিবর্ত্তন হইলে হয়ত বলিতাম, এ গাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থলে আর একটা গাছ কেহ বসাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমিক পরিবর্ত্তন, এই আংশিক পরিবর্ত্তন, ঘটিতে দেখিলে আমরা তাহা না বলিয়া বলি, সেই গাছই আছে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই গাছ নাই। কাজেই কালিকার গাছের ও আজিকার গাছের ঐক্য সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। সেইরূপ কালিকার আমার ও আজিকার আমার ঐক্য পূরা ঐক্য—ষোল আনা ঐক্য—নহে। কাল যে আমাকে জানিতাম সে আমি ও আজ যে আমাকে জানিতেছি সে আমি, কখনই সর্ব্বতোভাবে এক আমি নহে। কাল আমি সুখী ছিলাম, আজ আমি দুঃখী; কাল আমি ধনী ছিলাম, আজ গরিব; কাল মূর্খ ছিলাম, আজ পণ্ডিত। তবে কতক মিলও আছে। কালিকার আমায় যে যে গুণ ছিল, আজিকার আমায় তাহার অনেক আছে, তবে সব নাই।

কাজেই জ্ঞেয় আমার এই ঐক্য পূর্ণ ঐক্য নহে, উহা আংশিক ঐক্য। আমার এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে, ক্রমশঃ ঘটিয়াছে; সেইজন্য আমি বলি, সে আমি ও এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ প্রায় এক; পূরা এক নহে। এ বিষয়ে যিনি আলোচনা চাহেন, তিনি হক্সলীর লিখিত হিউমের জীবনবৃত্তান্তের ঐ অংশ পাঠ করিবেন।

আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক তেমনিটি ছিলাম? আমার স্মৃতি কি বলে? আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, কাল আমি দুঃখে অভিভূত ছিলাম; শোকে ম্রিয়মাণ ছিলাম; আজ আমার সে অবস্থা নাই। সে অবস্থার স্মৃতি আছে বটে; কিন্তু দুঃখের সে তীব্রতা নাই। আবার কাল আমার জ্ঞানের সীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, আজ তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আমি ম্যাকবেথ পড়িয়া ফেলিয়াছি, ইতোমধ্যে জয়চন্দ্র ও শ্যামচাঁদের সহিত আমার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, ইতোমধ্যে আমি দূরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। ইতোমধ্যে আমি রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়া উল্লসিত হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কালকার আমি আর আজকার আমি ঠিক্ সমান নহি। কাল আমার সহিত জগতের ঘাতপ্রতিঘাত যেরূপ বলিয়াছিল, আজ ঠিক্ সেরূপ চলিতেছে না। কাল আমি আমাকে যে ভাবে, যে মূর্ত্তিতে, জানিতাম, আজ আমি আমাকে ঠিক্ সে ভাবে সে মূর্ত্তিতে জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের আমাতে ও বার্দ্ধক্যের আমাতে, সুস্থ আমাতে ও রুগ্ন আমাতে, সুখী আমাতে ও দুঃখী আমাতে, অনেক প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার জ্ঞানগম্য। অতি শৈশবকালে যখন আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম, সে কালের স্মৃতিটুকু সে কালের আমার যে অস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, সেই আমি ও আজকার প্রৌঢ় দৃপ্ত কর্ম্মপর আমি কত ভিন্ন।

তার আগে আরও শৈশবে আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা ত মনেই হয় না; স্মৃতি কোন কথাই বলে না; অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম ঠিক বলিতে পারি না; এমন ছিলাম না, তাহা নিশ্চয়। কাজেই যে আমি আমার বিষয়, সে আমি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল; সে আমি কাল এক রকম ছিলাম, আজ অন্য রকম আছি; সম্ভবতঃ আগামী কাল অন্যরূপ হইব। ক্ষণে ক্ষণে সেই আমার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কোন দুই ক্ষণে সে আমার মূর্ত্তি ঠিক্ এক রকম থাকে না। বলা বাহুল্য এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আমি বিষয় আমি। এই আমি আমার জ্ঞানগম্য; ইহাকে আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, মনে করিতেছি। এই জ্ঞেয় আমার বৈদান্তিক নাম জীব। জীব নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এবং এই পরিবর্ত্তনের হেতু অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে বাহ্য জড়জগতের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতই তাহার এই বিকারের হেতু। বাহ্য জগতের অধীন বলিয়াই জীব কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কখন মূর্খ, কখন পণ্ডিত, কখনও দুর্ব্বল, কখনও সবল, কখন শিশু, কখন বৃদ্ধ। জীবের এই বিকারপরম্পরা সত্য বলিয়া এখন মানিয়া লওয়া গেল।

কিন্তু তার পরে প্রশ্ন, জ্ঞেয় আমি সবিকার, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি সবিকার? যে আমি আমার এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী, যে ইহা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে, তাহারও কি বিকার আছে, পরিবর্ত্তন আছে? সেও কি জড় জগতের অধীন?

ইহার স্পষ্ট উত্তর—না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জীবের এই পরিবর্ত্তনপরম্পরা ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বিষয় আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয়া বসিয়া স্থিরভাবে এই সকল পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেছে—সেই আমা স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার না

পরিবর্ত্তন নাই। সে বসিয়া বসিয়া এই বিষয় আমার নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিতেছে, নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নির্বিকার ভাবে দেখিতেছে ;—এই নিত্য পরিবর্ত্তনের সে চিরন্তন বিনিদ্র সাক্ষী, অথচ এই পরিবর্ত্তন ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, উদাসীন সাক্ষী আমি, বিষয়ী আমি ; সে সর্ব্বদা বিষয় আমাকে নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াছে। জড়জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষয় আমি নাচিতেছি, কাঁদিতেছি, হাসিতেছি,—কখন চেতন ও জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থ, কখন বা সুষুপ্ত,—ক্রীড়াপর, কর্ম্মশীল,—দুঃখী, সুখী,—রাগী দ্বেষী ঈর্ষী ঘৃণী,—এখন এমন, তখন তেমন,—কাল এইরূপ, আজ অন্যরূপ ;—কিন্তু বিষয়ী আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ, সদা জাগ্রত, সদা প্রকাশমান থাকিয়া এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চল্যের, এই বিকারের নিত্য সাক্ষী। বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয়ী আমার নাম পরমাত্মা।

বিষয় আমি ও বিষয়ী আমি উভয়ের স্বরূপ কি তাহা যথাশক্তি বুঝাইলাম। বিষয় আমি আজ যেমন আছে, কাল তেমন ছিল না ; যৌবনে যেমন, বাল্যে তেমন নয়, শৈশবে আবার অন্যরূপ। জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে ? যদি থাকে, কিরূপ ছিল, তাহা আমি জানি না। শৈশবের অতি অস্পষ্ট স্মৃতি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু জন্মান্তর যদি থাকে, সেই পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি কিছুই নাই। তখন আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি ছিলাম কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাঁচ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বিষয়রূপী জড় জগৎ কিরূপ ছিল, তাহা আমি কতক বলিতে পারি। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমানবলে বা শাব্দপ্রমাণ বলে বলিতে পারি। সে সময়ে

আমার জন্মের পূর্ব্বে, জগতের মূর্ত্তি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহা আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, বিষয়ী আমি—এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ঐ ক্লাইব পলাশী বাগানে লড়াই করিতেছেন,—ঐ জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন,—ঐ দিগ্বিজয়ী সেকন্দার সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইতেছেন,—ঐ আর্য্যগণ হলস্কন্ধে গোধনসঙ্গে ভারত প্রবেশ করিতেছেন,—ঐ ধরাপৃষ্ঠে মাষ্টোডন মেগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,—ঐ মহাসাগরে বৃহৎ কুম্ভীর বৃহৎ মীন চরিয়া বেড়াইতেছে, স্তন্যপায়ী তখনও আবির্ভূত হয় নাই;—ঐ উত্তপ্ত ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পে আন্দোলিত হইতেছে, তখন প্রাণীর আবির্ভাব হয় নাই;—ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী নীহারিকা সৌর জগতের পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ঘূর্ণমান, কেহ তাহা দেখিবার নাই;—কিন্তু আমি এখান হইতে বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতেছি;—আমি জড় জগতের এই কল্পব্যাপী পরিবর্ত্তনের সাক্ষী। বিষয়ী আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকারভাবে, নির্নিমিষে, উদাসীনের ন্যায় বিষয় আমার অতীত যৌবনের, অতীত শৈশবের, 'রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙ্গিত দুঃখসুখ' এর অবেক্ষণ করিতেছি। আবার বিষয় আমি যখন ছিলাম না, অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন বিষয় জড়জগৎ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘুরিতেছিল, ফিরিতেছিল, অভিব্যক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি। সে কোন্ কালের কথা—সূর্য্যমণ্ডল তখন ছিল না—চন্দ্রমণ্ডল তখন ছিল না—আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত না—অচেতন ঘূর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয় ত তখন ছিল না—আসীদিদং তমোভূতং—সেই জগতের আদিম অবস্থা—তার পর কতকাল অতীত হইয়া গেল, মাস গেল, অব্দ গেল, যুগ গেল, কল্প গেল, আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়, প্রশান্ত

নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ—স্বয়ংপ্রকাশ চেতনাস্বরূপ আমি এইখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি; সমগ্র অতীতের আমি সাক্ষী—আমি বিষয়ী—আমি আত্মা—আমি পরমাত্মা—আমি ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি।

এখন বেদান্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জড়-জগৎ ত বিষয়,—উহা অধ্যাস—উহা মায়া। কাহার মায়া? উত্তর, আমার মায়া। আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড়জগতের অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। কিন্তু সেই আমিই বা কিং-স্বরূপ? বেদান্ত বলেন আমারও দুই মূর্ত্তি—আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। আমি আমাকেই দেখি। যে দেখে সে বিষয়ী; যাহাকে দেখে সে বিষয়। যে বিষয়ী তাহার নাম দাও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, যে বিষয়, তাহার নাম দাও জীবাত্মা বা জীব। জীবাত্মা নিত্য বিকারশীল, জড়জগতের অধীনতায় উহাতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে। পরমাত্মা নির্ব্বিকার, সে জীবাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীন ভাবে দেখিতেছে। অতএব দুই ভিন্ন বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয়। অথচ দুই অভিন্ন। দুই আমিই এক আমি। আমি আমাকে দেখি, এ স্থলে যে কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম। আমি আমাকেই দেখি—অন্য কাহাকেও দেখি না। আমি যখন সুখী হই, তখন আমি আমাকেই সুখী মনে করি, অন্যকে সুখী মনে করি না। ইহা অতি সহজ কথা। দ্রষ্টা আমি ও দৃশ্য আমি, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, ব্রহ্ম ও জীব, উভয়ই এই, সর্ব্বতোভাবে এক। ইহাই জীবব্রহ্মের অভেদবাদ। ইহাই অদ্বয়বাদ। অদ্বয়বাদ আর কিছুই নহে। ইহাতে রাগ করিবার কিছুই নাই।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেম্‌সের নাম খ্যাতি লাভ করিতে চলিয়াছে। ইনি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব। আশা করি, বেদান্তের

অভিপ্রায় যাহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে; তাঁহার Textbook of Psychologyর দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আত্মতত্ত্বের বিচার আছে। তিনি গোঁড়াতেই আরম্ভ করিয়াছেন—"Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of *myself*, of my *personal existence.* At the same time it is *I* who am aware ; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it, of which for shortness we may call one the *Me* and the other the *I*" (পৃঃ ১৭৬)। ইহার অর্থ, আমি যেমন অন্য বিষয় জানি, তেমনি আমাকেও জানি। এবং সে কে জানে? আমিই জানি। জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম আমার নাম দেওয়া হইল Me—বেদান্তের বিষয় আমি অথবা জীব। আর কর্ত্তা আমার নাম হইল I—বিষয়ী আমি অথবা ব্রহ্ম। তৎপরে বলিতেছেন—I call these 'discriminated aspects,' and not separate things, because the identity of *I* with *me*, even in the very act of discrimination, is perhaps the most ineradicable dictum of common sense, and must not be undermined by our terminology here" (পৃঃ ১৭৬) অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি একই আমি—ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহারা ভিন্ন নহে—ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই বেদান্তের অদ্বয়বাদ। বেদান্তও বলেন, যে জীব, সেই ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম; কিন্তু উভয়ই এক। দুই নাম বলিয়া দুই নহে।

ঐ জ্ঞেয় আমার স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেমস্ বলিয়াছেন যে এই জ্ঞেয় আমার ঐক্য—personal identity—পূরা ঐক্য নহে। এই জ্ঞেয় আমি বস্তুতঃ বিকারশীল। "If in the sentence "I am the same that I was yesterday," we take the 'I' broadly, it is evident that in many ways I am *not* the same. As a concrete Me, I am somewhat different from what I was: then hungry, now full; then waking, now at rest; then poorer, now richer; then younger, now older; etc. So far, then, my personal identity is just like the sameness predicated of any other aggregate thing. It is a conclusion grounded either on the resemblance in essential aspects, or on the continuity of the phenomena compared. The past and present selves compared are the same just so far as they *are* the same, and no farther." (পৃঃ ২০১—২০২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ আর আজিকার গাছ, যেমন এক গাছ হইলেও পূরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল যে আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহারা এক আমি হইলেও পূরাপূরি এক নহে।

কাজেই জ্ঞেয় আমি বিকারশীল। কিন্তু জ্ঞাতা আমার স্বরূপ কি? লেখকের মতে—"The 'I', or 'Pure Ego,' is a very much more difficult subject of inquiry than the Me. It is that which at any given moment *is* conscious, whereas the Me is only one of the things which it is conscious *of*. In other words, it is the *Thinker*. Is it the passing

state of consciousness itself, or is it something deeper and less mutable? The passing state we have seen to be the very embodiment of change. Yet each of us spontaneously considers that by 'I', he means something always the same. This has led most philosophers to postulate behind the passing state of consciousness a permanent Substance or Agent whose modification or act it is. This Agent is the thinker. 'Soul' 'transcendental Ego'' Spirit' are so many names for this more permanent sort of Thinker." (পৃঃ ১৯৫-১৯৬)। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমার বিকারের ও চাঞ্চল্যের সাক্ষী, সে যেন নির্ব্বিকার। সেই Permanent Agent এর বৈদান্তিক নাম পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের মতে ঐ passing state of consciousness—ক্ষণিক বিজ্ঞানই—সমস্ত।

এই জ্ঞাতা আমি নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে বিষয়ে জেমসের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বৌদ্ধের দিকে না বেদান্তের দিকে? তাঁহার প্রশ্ন—"Does there not then appear an absolute identity [with regard to the thinker] at different times? That something which at every moment goes out and knowingly appropriates the Me of the past, and discards the non-me as foreign, is it not a permanent abiding principle of spiritual activity identical with itself wherever found?" (পৃঃ ২০২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে ঝোঁক দিয়া বলিয়া-

ছেন—"The states of consciousnens are all that psychology needs to do her work with. Metaphysics or Theology may prove the Soul to exist; but for psychology the hypothesis of such a substantial principle of unity is superfluous" (পৃঃ ২০৩)। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নির্ব্বিকার আত্মার বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক নহে। কেন না "Successive thinkers numerically distinct, but all aware of the same past in tne same way, form an adequate vehicle for all the experience of personal unity and sameness which we actually have." (পৃঃ ২০৩) অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ পূর্ব্বাপর ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রবাহ বর্ত্তমান; প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞান তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানের নিকট হইতে তাহার অতীত প্রত্যভিজ্ঞার সমষ্টি ধার করিয়া লয়; ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন নিত্য ও নির্ব্বিকার বলিয়া বোধ হয় তাহা বুঝা যাইবে। ইহা খাঁটি বৌদ্ধের কথা। বৈদান্তিক বলেন, তথাস্তু। ক্ষণিক বিজ্ঞান পর পর উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি বা প্রত্যভিজ্ঞা উদরসাৎ বা আত্মসাৎ করিয়া লয়, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এখানে থামা চলিবে না। কেননা ঐ "পর পর" কথাটায় গোল আছে। পর পর বলিলেই একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পৌর্ব্বাপর্য্য, ব্যাপারখানা কি? আমি যেমন জড়জগৎকে আমার সম্মুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেশে বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্তু সেই দেশ কেবল কল্পিত দেশ; দর্পণের পশ্চাতে কল্পিত দেশের সহিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দেশের সহিত উহার পারমার্থিক ভেদ নাই; সেইরূপ এইক্ষণে বসিয়াই জ্ঞেয় আমাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করিয়া একটা অতীত কালের কল্পনা করি—মনে করি, কাল

আমি এমনি ছিলাম, পরশু আমি ইহা করিয়াছি, চল্লিশ বৎসর আগে আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম—তারও আগে আমি ছিলাম না, তবে তখন আমার পিতাপিতামহ ছিলেন, ম্যামথম্যাষ্টোডন ছিল—ইত্যাদি; এই কালও ত আমারই একটা কল্পনা। দেশও যেমন কল্পনা, কালও তেমনি কল্পনা। দেশ কাল উভয়ই আমার আমাকে দেখিবার দ্বিবিধ রীতি। দুইটা ভিন্ন রকমের উপায়। আমার বাহিরে যেমন দেশও নাই, তেমনি কালও নাই। আমার দেশব্যাপ্তি কেহই স্বীকার করিবেন না। আমার কালব্যাপ্তিই বা কেন স্বীকার করিব? বস্তুতঃ আমি দেশেও ব্যাপ্ত নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি।

বস্তুগত্যা আমি এখন এইক্ষণে বর্ত্তমান, এইটুকু স্বীকার করিতে আমি বাধ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বা পরবর্ত্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ, স্বীকারে আমি বাধ্য নহি। আমি অতীত কাল কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র ব্যাপিয়া আমাকে বর্ত্তমান মনে করি; কিন্তু মনে করি মাত্র। আমি অনাগত কালের আশা করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকিব, এইরূপ প্রতীক্ষায় রহিয়াছি—কিন্তু উহা আমার আশামাত্র ও প্রতীক্ষামাত্র। সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, আশা ও প্রতীক্ষা। পরমার্থতঃ উহা অস্তিত্বহীন। জ্ঞেয় আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব নাই।

কালই যেখানে কল্পনা—উহা জ্ঞাতা আমি কর্ত্তৃক জ্ঞেয় আমিকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া ছড়াইয়া দেখিবার একটা ফন্দিমাত্র—সেখানে কালের পরম্পরা—ইহা আগে, ইহা পরে—এই সকল উক্তি লোকব্যবহারমাত্র। উহা ব্যাবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। বিষয়ী আমি—সাক্ষী আমি—জ্ঞাতা আমি—পরমাত্মা আমি—ব্রহ্ম আমি—কালোপাধিশূন্য; আমি কালের বাহিরে।

তাই যদি হইল, তবে আমি permanent—নিত্য—কিনা, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায়। কিন্তু জ্ঞাতা আমি কালব্যাপক নহে, উহা নিত্যও নহে। উহা এখন আছে, ইহা ঠিক। অতীত কালে উহা ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না।

এইরূপ উত্তর যে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেম্‌সের কতক সংশয় ছিল। তাই তিনি হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর এইরূপ; তবে Metaphysics কিংবা Theology অন্যরূপ উত্তর দিতে পারেন। বেদান্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন না। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র ব্যাবহারিক শাস্ত্র; জেমস্ স্পষ্টাক্ষরে উহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। পরমার্থান্বেষী বেদান্তের নিকট সাক্ষী পরমাত্মা এখনি বর্ত্তমান;—অতীতে উহা বর্ত্তমান ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত। পরমাত্মা স্বয়ং কালোপাধিবর্জ্জিত; উহা অদ্বয়; উহা অখণ্ড। উহার এক টুকরা কাল ছিল, এক টুকরা আজ আছে, এমন মনে করা চলে না। অধ্যায়ের উপসংহারে লেখক বলেন—"This *Me* is an empirical aggregate of things objectively known. The *I* which knows them cannot itself be an aggregate" (পৃঃ ২১৫)। অর্থাৎ জ্ঞেয় আমাকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাবা চলে না। অপিচ, "For psychological purposes it (the I) need not be an unchanging metaphysical entity like the Soul, or a principle like the transcendental Ego, viewed as out of time" (পৃঃ ২১৫) বেদান্তী বলেন, তথাস্তু। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রের

পক্ষে উহাকে unchanging entity বলিতে চাহি না—কেননা unchanging বলিলে কালব্যাপ্তি আসে,—তবে উহাকে out of time বলিতে পারি।

এখন বুঝা যাইবে বেদান্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য নির্বিকার বলেন, পরে আবার যেন সহসা সাবধান হইয়া বলেন, না, না, ব্রহ্ম তাহাও নহেন। যাহার নিকট অতীত ভবিষ্যৎ অর্থশূন্য, তাহাকে নিত্য বলাও চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশে অবশেষে, ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়।

আশা করি, এখন অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্য বুঝা গেল। আমি তোমাকে জানি। যে জানে সে নিরুপাধিক ব্রহ্ম। যাহাকে জানে, সে সোপাধিক জীব; সে ক্ষুদ্র, চঞ্চল, বিকারশীল, জরামরণের অধীন। অথচ উভয়ই এক। যে জানে ও যাহাকে জানে, সে একই ব্যক্তি। যে নিরুপাধিক সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্যার পূরণের উপায় কি? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, ঐ উপাধি কল্পিত উপাধি। মায়াকল্পিত জগতের যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনতা প্রকৃত অধীনতা নহে। ঐরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আবার কাল যখন একটা কল্পিত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে পরিবর্ত্তন, যে বিকার দেখা যায়, উহাও কল্পিত। কাজেই জীব বিকারশীল নহে, চঞ্চল নহে, ক্ষুদ্র নহে। বিকারশীল বোধ হয়, কিন্তু উহা বোধমাত্র। উহা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির নামান্তর অবিদ্যা। ঐ বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞানাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল মনে করি ও উহাকে দেশ জুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল জুড়িয়া কল্পিত সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি, উহা তেমন নহে। কেননা আমিই আমাকে জানি; এখানে জ্ঞাতা আমারও যেমন কোন উপাধি নাই, জ্ঞেয় আমারও তেমনি কোন

বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না। কেননা উভয় আমিই এক আমি। ইহা যে জানে, সে মুক্ত। যে জানে না, সে বদ্ধ।

এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয়? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই গোঁড়ার কথাটুকু মানা কঠিন। জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী এইখানে আসিতে পিছলিয়া পড়েন। এইটুকু পর্য্যন্ত আসিলে আর বাকি সব আপনি আসে। জগৎ কল্পনা; কিন্তু সেই কল্পনায় ব্যবস্থা দেখি, শৃঙ্খলা দেখি। সেই সুব্যবস্থ সুশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে একজন চেতন সৃষ্টিকর্ত্তা—Personal Intelligent God—আবশ্যক। এইজন্য বার্কলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। হিউম বলিয়াছেন, ঐ জাগতিক ব্যবস্থা কেন এমন, তাহা জিজ্ঞাসায় লাভ নাই। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদান্ত বলেন—তজ্জন্য স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক নহে। যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমরা জানি, তাঁহাকেই জগৎ-কর্ত্তৃত্ব দিতে কোন বাধা নাই। সেই জগৎ-কর্ত্তৃত্বের নাম মায়া। আত্মাতে মায়া আরোপ করিলে উহার ঈশ্বরত্ব জন্মে; উহা সৃষ্টিক্ষম হয়। তবে জগৎ যখন অধ্যাস, সেই মায়াও তেমনি অধ্যাস। আবার যদি তর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব, যে জগতের অধীন, সে জগতের কর্ত্তা হইবে কিরূপে, তদুত্তরে বলা হয়, এই ক্ষুদ্রত্ব আত্মায় আরোপের প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভুল, তাহা অবিদ্যা। ক্ষুদ্রত্ব জগতের অধীনতার ফল; জগৎই যখন কল্পনা, তখন সেই ক্ষুদ্রত্বও কল্পনামাত্র, অবিদ্যামাত্র। যতক্ষণ সেই ভুল থাকে, অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই আমি বদ্ধ। সেই ভুল গেলেই আমি মুক্ত।

কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান—এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটিবে—মরণকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিতেই মুক্তি ঘটিবে—জীবন্মুক্তিই মুক্তি।

সচরাচর বলা হয়, মুক্তির পর আর সুখদুঃখ থাকে না, মুক্তির পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই সকল বাক্যও সরল ভাবে গ্রহণ করা উচিত। মুক্তির পর, অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর, সুখদুঃখ কেন থাকিবে না? সুখদুঃখ থাকিবে বৈ কি। বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে। মুক্ত হইলেও যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, আগুনে হাত পুড়িবে, বাঘের সম্মুখে পড়িলে পলাইতে হইবে। বেদান্তের ভাষায় প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল আমাকে ভুগিতেই হইবে; তবে সেই সকল আর আমাকে বাঁধিতে পারিবে না, ফলভোগী হইয়াও আমি নির্লিপ্ত থাকিব। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে সুখদুঃখের বোধ ঘটিবেই; তবে জ্ঞানোদয়ের পর সেই সুখকে ও সেই দুঃখকে ব্যাবহারিক মনুষ্যজীবনের আনুষঙ্গিক প্রত্যয় পরম্পরা বলিয়া জানিব। মুক্তির পূর্ব্বে উহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, এখন উহাকে ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া জানিব।

আর জন্মান্তরপরিগ্রহ? মুক্ত পুরুষকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, এই বাক্যের মর্ম্ম কি? যে মুক্ত, তার পক্ষে দেহটাই কল্পনা; তার পক্ষে দেহ-ধর্ম্ম মরণ ঘটনাটাও কল্পনা; তাহার পক্ষে মরণ একটা প্রত্যয়মাত্র। মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্মান্তরপরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে ইহলোকই বা কি আর পরলোকই বা কি? স্বর্গ, নরক, পরকাল, এমন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ, তাহার নিকট অবিদ্যমান। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আপনাকে কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে; কিন্তু অবিদ্যামুক্ত জীব, যে বিষয়ী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, সে

স্বয়ং দেশকালনিরপেক্ষ। তাহার পক্ষে সম্মুখ পশ্চাৎ নাই; তাহার পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় শব্দই অর্থশূন্য।

মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিবেন কিনা, ইহার উত্তরও এখন সহজ হইবে। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগে সে যেমন বাধ্য, তেমনই সে তাহার ব্যাবহারিক ইহজীবনে হেয় বর্জ্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করিতেও বাধ্য। ক্ষুধা পাইলে যখন আহার করিতে হইবে, তখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কন্থা গায়ে জড়াইয়া ধর্ম্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'—কর্ম্ম করিয়াই শত বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে—বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের প্রতিই বেদান্তের এই আদেশ; মুক্তের কামনা নাই, কেন না তাহার নিকট পরকাল অর্থশূন্য। কাজেই মুক্তের কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম; উহা তাহাকে বাঁধিতে পারে না।

মুক্তির অর্থ বুঝা গেল, ও মুক্তির উপায়ও বুঝা গেল। মুক্তির উপায় জ্ঞান—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অন্য অর্থে প্রযুক্ত অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থা থাকিতে পারে, কিন্তু বেদান্তে যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তির জন্য কেবল জ্ঞানের পন্থা; ইহার জন্য কর্ম্ম আবশ্যক নহে, ইহার জন্য ভক্তি আবশ্যক নহে। তাহা বলিলে কর্ম্মের বা ভক্তির নিন্দা করা হয় না। কর্ম্মের পন্থার বা ভক্তির পন্থার অন্য স্থলে অন্য উদ্দেশ্যে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানের পন্থা কিছুই নহে। মুক্তির জন্য কিন্তু জ্ঞানের পন্থা। সেই জ্ঞান কোন আজগুবি জ্ঞান নহে; উহা নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞান—সেই জ্ঞানলাভের জন্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ ও শমদমাদি সাধনা আবশ্যক; শ্রবণমননাদি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করে; শ্রুতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে সাহায্য করে। ইহার অর্থ অতি সরল অর্থ—ইহার ভিতরে কোন বুজরুকি নাই।

বেদান্তের স্থূল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক।

(১) একমাত্র চেতন পদার্থ বর্ত্তমান—উহা আমি—উহার অস্তিত্ব জ্ঞানগম্য ও স্বতঃসিদ্ধ। উহা দেশকালনিরপেক্ষ নির্গুণ নিরুপাধিক পদার্থ; কাজেই উহার স্বরূপ ভাষাদ্বারা অপ্রকাশ্য। ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ অভাববাচী বিশেষণে উহা বুঝাইতে হয়।

(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা করিয়া সেই দেশে আমার কল্পিত জড়জগৎকে প্রক্ষেপ করি ও কল্পিত দেশ মধ্যে তাহাকে ব্যবস্থা করিয়া সাজাই। এখানে সূর্য্য রাখি, ওখানে চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি। এবং সেই সূর্য্যচন্দ্রপৃথিবীকে বাঁধা নিয়মে ঘুরাই।

পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত কালে আমার সৃষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি। তাহার কিয়দংশকে বলি অতীত, কতকটাকে বলি বর্ত্তমান, ও বাকিটাকে বলি ভবিষ্যৎ।

পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে পরিচালনা করি।

(৩) এই দেশকালে সজ্জিত ব্যবস্থানুযায়ী ও উদ্দেশ্যানুসারী জগতের সৃষ্টির জন্য আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়, উহার নাম দেওয়া হয় মায়া। কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই সৃষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপমাত্র বা অধ্যাসমাত্র। উক্ত মায়া আরোপে নিরুপাধিক আত্মা সোপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু সেও প্রত্যয়মাত্র। এই সোপাধিক রূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াযুক্ত আত্মার নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর; কেননা ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনা-কারক, সৃষ্ট জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। জগতের কল্পিত প্রকাণ্ডত্ব ও বৃহত্ত্ব দেখিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাতেও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তি-মত্তা প্রভৃতি আরোপ করা হয়।

(৪) আর একটি অদ্ভুত কথা এই, যে আমি যেমন আমা হইতে পৃথক্ জড়জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে আমা হইতে পৃথক্ রূপে দেখিয়া থাকি। উক্ত কল্পিত জড়জগৎ যেমন আমার জ্ঞানগম্য বিষয়, এই আমিও তেমনই আমার জ্ঞানগম্য বিষয়। অধিকন্তু এই বিষয় আমাকে আমি আমা হইতে পৃথক্ দেখিয়া তাহার সহিত মৎকল্পিত জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। আমাকে সর্ব্বাংশে সেই জগৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন্ন, সেই জগতের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য হেয় বর্জ্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে সর্ব্বদা ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিয়াশীল, জড়জগতের আঘাতসহ ও সেই আঘাতে পরিবর্ত্তনশীল, সুখদুঃখ-ভোগী, জরামরণশীল, বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। এই ভ্রান্তির নাম দেওয়া হয় অবিদ্যা;—বস্তুতঃ জড় জগৎই মিথ্যা ও জড় জগতের সহিত আমার এই কল্পিত সম্বন্ধও মিথ্যা। আমি বিকারশীল বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলেও এই জ্ঞানগম্য আমি জ্ঞাতা আমি হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। অবিদ্যাবশে আমি নিরুপাধিক হইয়াও আমাকে সোপাধিক ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি।

(৫) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনির্ব্বাচ্য চৈতন্যস্বরূপ পদার্থকে আমি নাম দেওয়া হয়, তিনিই এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে জীব। মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্ত্তা জগতের প্রভু ঈশ্বর;. আর অবিদ্যার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগতের অধীন জগতের দাস জীব। কিন্তু স্বরূপতঃ যে ঈশ্বর, সেই জীব।

(৬) এই তত্ত্ব জানিলেই মুক্তি ঘটে; অর্থাৎ জগৎকে কল্পনা মাত্র বলিয়া বুঝা যায় ও জীবকে তাহার অনধীন বলিয়া বুঝা যায়।

তখন সুখদুঃখ, ইহ-পরকাল, জন্মমরণ, সংসার, সমস্তই প্রত্যয়মাত্র বলিয়া জানা যায়। তখনই পূর্ণ জাগরণ হয় ;—তাহার পূর্ব্বে স্বপ্ন। কাজেই যে মুক্ত, সে বুদ্ধ।

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিদ্যার আরোপ করিয়া জগতের দাসত্ব করি, তাহার উত্তর বোধ করি নাই। এখানে সকলেই নিরুত্তর। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব ; বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল ; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তরে ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহা করিয়াছেন বা তিনি ইহা করেন নাই ; যিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করিয়া ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই তাহা জানেন, অথবা তিনিও তাহা জানেন না।

প্রকৃতি-পূজা

মানুষ মানুষের সহিত যুঝিয়া আসিতেছে ও মানুষ প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া আসিতেছে। অতি পুরাকাল হইতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে ; অদ্যাপি এই সংগ্রামের পর্য্যবসান হয় নাই। ভবিষ্যতে কবে এই সংগ্রামের পর্য্যবসান হইবে, তাহা বলা যায় না।

প্রকৃতির সহিত মানুষের চিরন্তন মহাসমর চলিতেছে ; মানুষ সেই সমরে চিরকাল দলিত, পীড়িত ও বিক্ষত হইয়া ত্রাহিস্বরে ক্রন্দন

করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী সমানধর্ম্মা মানুষের সহিতই যে তাহার তুল্যভাবে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, বোধ করি কতকটা লজ্জার খাতিরে সে তাহা স্বীকার করিতে চায় না।

কিন্তু কথাটা অতিশয় সত্য, এবং এই সত্য কথাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্ সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হবসের মতে রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক মনুষ্য অপর মনুষ্যকে আক্রমণের ও বিনাশের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। রাষ্ট্রমধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য অপ্রতিহতপ্রভাব ও নিষ্করুণ রাজশক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে এতদিন সকলে নখানখি ও দন্তাদন্তি করিয়া উচ্ছিন্ন হইত।

ডারুইন সেদিন দেখাইয়াছেন, মানুষে মানুষে এইরূপ ভীষণ বিসংবাদ চলিতেছে সত্য বটে, তবে তজ্জন্য মনুষ্যচরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। এ বিষয়ে মনুষ্য প্রকৃতির হাতে ক্রীড়াপুতুল। জীবনরক্ষার জন্য একটা প্রচণ্ড স্পৃহা মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রকৃতি ঠাকুরাণী নিহিত করিয়াছেন এবং অন্নকেই সেই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৎসর বৎসর যতগুলি মানবশিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাদের সকলের অন্নসংস্থানের কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। মানুষে কি করে; জীবনরক্ষার্থ সেই মুষ্টিমেয় খাদ্যসামগ্রী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে তাহার দোষ কি?

দোষ থাক্ আর নাই থাক্, মনুষ্যসমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই এইরূপ একটা নিষ্ঠুর নিষ্করুণ বিসংবাদ যে সর্ব্বদা চলিতেছে, তাহা দেখা যায়। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল ব্যক্তি জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন হইয়া সমাজের প্রান্তদেশে লুক্কায়িত থাকিতেছে, কেহ তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ আবশ্যক বোধ করিতেছে না,

ইহা সত্য কথা। অগত্যা দুর্ব্বল আত্মরক্ষার জন্য সবলের উপাসনায় বাধ্য হয়।

মানুষের উপর প্রকৃতির অত্যাচার অধিক কি মানুষের অত্যাচার অধিক, বলা কঠিন।

সবল প্রকৃতির পীড়নে দুর্ব্বল মানুষ চিরদিন পীড়িত; এবং সবল মানুষের পীড়নে দুর্ব্বল মানুষ চিরদিন ধরিয়া ততোধিক নিগৃহীত। আত্মরক্ষার জন্য দুর্ব্বলের উভয়ত্র একমাত্র পন্থা সবলের উপাসনা। মনুষ্যের উপাসনা এ প্রস্তাবের বিষয় নহে। প্রকৃতির উপাসনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব প্রকৃতিপূজায় নিযুক্ত। এই প্রকৃতি-পূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পণ্ডিতে নানা কথা কহিয়াছেন। মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত এক রকম; হর্বার্ট স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। অন্য পণ্ডিতে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেই সকল বিচারে আমা প্রবৃত্ত হইব না। মানুষ আপনাকে জড় জগতের অধীন বলিয়া ভাবে। জড় জগৎ তাহার প্রভু; মানুষ তাহার দাস। প্রভুর ক্ষমতার সীমা নাই; প্রভুর খেয়াল নিরঙ্কুশ। সে ক্ষেত্রে উপাসনাই শ্রেয়ঃকল্প।

অব্যবস্থিতচিত্ততায় প্রকৃতির সহিত অন্য কোন প্রভু তুলনীয় নহে। কখন কিরূপ খেয়াল থাকিবে, হিসাব করিয়া গণনা চলেনা। তাই সর্ব্বত্র উপাসনাই শ্রেয়ঃকল্প।

সুতরাং প্রকৃতিতে যাহা কিছু প্রবল ও শক্তিশালী বলিয়া বোধ কর, তাহারই উপাসনা কর। সূর্য্যের পূজা কর, চন্দ্রের পূজা কর, মেঘের পূজা কর, বায়ুর, জলের, আগুনের সকলেরই পূজা কর। বৃক্ষ পর্ব্বত নদী সমুদ্র, কেহই যেন ফাঁক না যায়। কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? কাহার শক্তি কিরূপ তাহা কে জানে? যাহাকে সম্মুখে

দেখ, তাহারই উপাসনা কর। সাপ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, ইট, পাথর, কেহ যেন বাদ না পড়ে। সাবধান ব্যক্তি কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া চলেন; কেহ যেন বাদ না পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডময় দেবতা প্রতিষ্ঠা কর। শস্যশালিনী পৃথিবী অখিল ভূতের জননীস্বরূপা; তাঁহার পূজা কর। ঊর্দ্ধ হইতে আকাশ পৃথ্বীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন; তিনি পরম পিতা, তাঁহার পূজা কর। দেবতার সংখ্যা কত, কে জানে? তিন, কি তেত্রিশ, কি তেত্রিশ কোটি, কে বলিতে পারে? প্রত্যক্ষে না পোষায়, কল্পনার আশ্রয় লও।

জগতের কাণ্ডকারখানা সবই অপূর্ব্ব। কোথা হইতে কি হয়, মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত, মানুষের গণনার অতীত। সূর্য্যদেব কোথা হইতে একচক্র রথে হরিদশ্ব যোজিত করিয়া অরুণ সারথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জগতের তিমিররাশি ভেদ করিতে উপস্থিত হয়েন; অগ্রে চারু-হাসিনী ঊষা বনের ফুল ফুটাইয়া, মন্দমারুতে বনস্থল প্রকম্পিত করিয়া সুপ্ত জীবকুলকে প্রবোধিত করেন। এই বা কি অদ্ভুত! নৃত্যপরা ঊষাসুন্দরী বর্ণকান্তিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলো করিয়া চঞ্চলচরণে উপস্থিত হইতেছেন; উঠ উঠ, সুপ্ত মানব অর্ঘ্যপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কর; তাঁহার চরণতলে শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাঁহার নিশ্বাসসৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে; তাঁহার অনাবৃত বক্ষোদেশ হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে। দেখ, হরিদশ্ব রথে আরোহণ করিয়া ঊষাদেবীর রূপরাগে আকৃষ্ট হইয়া দিবা-কর তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রূপমুগ্ধ দিবাকর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; সমুদয় আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া চলিলেন। পশ্চিমা-কাশে যখন সন্ধ্যার রক্তিমরাগে জগৎ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে, তখন দিবাকর ঊষার সহিত সঙ্গত হইলেন। সন্ধ্যা ত ঊষারই অন্ত

মূর্ত্তি! কিন্তু হায় এ কি হইল! উষা যে দিবাকরের দুহিতা। দিবাকর প্রজাপতি; কিন্তু উষাদেবী যে তাঁহার দুহিতা। প্রজাপতি ঋষ্যরূপ ধারণ করিয়া রোহিতরূপিণী রক্তবর্ণা উষাদেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবগণ লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। জগৎ অন্ধকারে ডুবিল, ব্রহ্মাণ্ড আঁধারে মুখ লুকাইল। পরে কেবল আঁধার আর আঁধার। কোথা সেই শোভা, কোথা সেই বৈচিত্র্য! পরিণাম বিরস; হরিষে বিষাদ। সবিতা উষাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়বীর সীতাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছিলেন। হেলেনিক বীরগণ সাগরপারে হেলেনাসুন্দরীর অন্বেষণে চলিয়াছিল। সর্ব্বত্র একই পরিণাম। দিবাকর পশ্চিমাকাশে দেবীর সহিত মিলিত হইলেন। ফুলশয্যা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হায় সেই ফুলশয্যাই অস্তিমের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইবে কে জানিত! উহা সন্ধ্যা নহে; দিবাকরের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়া পৃথিবী আলোকিত করিয়াছে মাত্র; পরক্ষণেই বসুন্ধরা গভীর শ্বাস ফেলিয়া বিষাদের কালিমা ধারণ করিল। মহাবীর হীরাক্লীস বিজয়ান্তে প্রণয়িনীর নিকট আসিলেন। প্রণয়িনী তাঁহাকে অঙ্গরাখা কবচ পরিতে দিলেন। কে জানে সে কবচ প্রাণহন্তারক হইবে। মহাবীর কবচ পরিধান করিয়া চিতারোহণ করিলেন। ঈজীয় সাগরের পশ্চিম কূলে মহাবীরের চিতা জ্বলিল। সমুদ্রের জলরাশির উপরে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই চিতাবহ্নির রক্তরাগ পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত দীপ্ত করিল। বালডারের মৃতদেহ বহন করিয়া সমুদ্র বাহিয়া পশ্চিমমুখে তাঁহার নৌকাখানি চলিতেছে। নৌকার উপরে সজ্জিত চিতানলে বালডারের দেহখানি ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। বালটিক সাগরের আঁধার পৃষ্ঠ সেই চিতালোকে দীপ্ত হইতেছে। রাবণের চিতা আজও নিবায় নাই। বালডারের চিতা কি নিবাইয়াছে? দুরন্ত শীতের

মধ্যভাগে যখন পৃথিবীর উত্তরভাগ দিবালোকবর্জ্জিত হয়, ক্ষীণপ্রভ দিবাকর যখন দক্ষিণাকাশে দেখা দেন বা দেখা দেন না, সেই সময়ে নোর্স জর্ম্মানেরা সেদিন পর্য্যন্ত বালডারের চিতা জ্বালিত। সে দিনও ঠিক্ সেই সময়ে খ্রীষ্টানেরা জোহনের স্মরণার্থ সেই আগুন জ্বালাইত। অদ্যাপি যখন মার্ত্তণ্ড গ্রীষ্মঋতুর মাঝখানে দক্ষিণায়নগামী হয়েন, তখন ইউরোপের লোকে সেই চিতার অনল জ্বালাইয়া থাকে।

দিবাকর অস্ত গেলেন, আর কি ফিরিবেন না? বালডারের দেহ ভস্মীভূত হইল, আর কি তিনি পুনর্জ্জীবন পাইবেন না? পাগল! অমরের কি মৃত্যু আছে? দেব গিয়াছেন অধোভুবনে পাতালপুরে,—পতিতের উদ্ধারের জন্য, মৃতের পুনর্জ্জীবনের জন্য। আপোলো পাতালপুরে নামিয়াছিলেন, আলকেষ্টির উদ্ধারার্থ; দায়োনীসস্ নামিয়াছিলেন, জননীর উদ্ধারার্থ। থর অধোভুবন গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন; ওধিন অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন; খ্রীষ্ট নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন, আশ্রিতগণকে তুলিয়া আনিবার জন্য। ভয় নাই, আপোলো ফিরিয়াছিলেন; বালডারও ফিরিবেন।

মেশায়া আবার আসিবেন। কল্কিদেব আবার আসিয়া ভূভার হরণ করিবেন। বুদ্ধ গিয়াছেন, মৈত্রেয় আবার আসিবেন। জোহন বলিয়াছিলেন, আমার পরে তিনি আসিবেন, আমার পূর্ব্বে তিনি স্থান পাইবেন। মহাবীর অদুসীয়স ত্রয়নগরে পরস্ত্রীহারকের দমনের জন্য গিয়াছেন। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মহাসাগর পার হইয়া, স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পেনিলপী, তোমার চিন্তা নাই; তোমার পাণিস্পর্শলোভী দুরাত্মাদিগের যথাকালে দমন হইবে। আর্থর কি মরিয়াছেন? পৃথিবীর প্রান্তদেশে আবালন দ্বীপে তিনি বাস করিতেতেছেন; সেখানে মর্ত্ত্যভূমির ঝঞ্ঝাবায়ু বহে না, সেখানে সারা বৎসর সমীরণ সুরভি বহন করে, সারা

বৎসর সেখানে বসন্তের ফুল ফুটে। সময় হইলে আর্থর আবার ফিরিবেন।

দিবাকর চিরতরে অস্ত যান নাই। কাল আবার ফিরিবেন। আবার তাঁহার মস্তকোপরি কনক মুকুট জ্বলিবে; আবার স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলে তাঁহার শিরোদেশ শোভিত হইবে। আঁধার ও মেঘ ও কুজ্ঝটিকা তাঁহার উদয়ে বাধা দিবে; কিন্তু তীব্র করজালে বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া আকাশপথে হরিদশ্বরথে আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনি চলিতে থাকিবেন। আকাশপটে কি দেখিতেছ? সিংহ-রাশির পর কন্যারাশি। কন্যারাশিতে দিবাকরের উদয়। মিশরবাসিগণ, প্রবুদ্ধ হও; আনন্দোৎসবে মত্ত হও; ভবিষ্যতের মানব তোমাদের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কন্যাগর্ভে দেবের উৎপত্তি। সিংহপৃষ্ঠে কন্যাকুমারী। তাঁহার গর্ভে দেবসেনাপতির উদ্ভব। কৃত্তিকাগণ তাঁহাকে স্তন্য দিয়া পালন করিবেন। সেনাপতি অসুর বধ করিবেন। দেবগণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কন্যাগর্ভে তনয়েশ্বরের জন্ম হইয়াছে। বেথলহীমে তারকার উদয় হইয়াছে। সপ্তর্ষি অর্ঘ্যহস্তে পূজা করিতে যাইতেছেন। শয়তান তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। খল সরীসৃপের মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন। মায়াদেবীর অঙ্কে শিশু শাক্য শোভা পাইতেছেন। অসিতদেবল শাক্য শিশুর পূজা করিতে যাইতেছেন। শিশু শাক্য বুদ্ধ হইবেন, জগৎকে প্রবোধিত করিবেন। মারবধূ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। দেবকী-গর্ভে ভগবানের জন্ম হইয়াছে। যশোদা তাঁহার মুখগহ্বরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। গোপী তাঁহার ভজনা করে; গোপীর অভিলাষ তিনি পূর্ণ করেন। ধর্ম্মরাজ্য তাঁহাকে সংস্থাপন করিতে হইবে। ভূভার তাঁহাকে হরণ করিতে হইবে।

মানবজাতি, উত্থান কর; দিবাকর উদিত হইয়াছেন; তিনি জগতের

চক্ষুঃস্বরূপ; তিনি ধীশক্তির প্রেরণা করেন। তাঁহার উপাসনায় অগ্রসর হও। অদ্য ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী, সুখের শরতের আরম্ভ; গোকুলবাসী নন্দোৎসবে প্রবৃত্ত। অদ্য শরতের মহাষ্টমী; বর্ষাপগমে বসুধা নির্ম্মল মুখশ্রী ধরিয়া হাসিতেছে; মহাশক্তির বোধন হইয়াছে, প্রবুদ্ধশক্তির আরাধনা কর। অদ্য কোজাগরী পূর্ণিমা; মহালক্ষ্মীর চরণক্ষেপে জগৎ-শতদল বিকশিত হইয়াছে; এমন রাতে কি ঘুমায়? নারিকেলোদক পান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় আজি রাত্রি যাপন কর। অদ্য শারদোৎফুল্ল-মল্লিকা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী; বসুন্ধরা জ্যোৎস্নাবিধৌত শুভ্রবসন পরিধান করিয়া যৌবনরাগ বিকাশ করিয়া প্রিয়তমের প্রতি অভিসারে চলিয়াছে এবং প্রিয়সঙ্গমে রাসরসে হাসিতেছে ও তরলতরঙ্গে নাচিতেছে। অদ্য উত্তরায়ণসংক্রান্তি; হিমঋতু অবসানোন্মুখ; দেবগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। নববর্ষের আগমন হইবে; মানবের উদ্ধারার্থ ঈশ্বর তাঁহার তনয়কে পাঠাইয়াছেন। অর্দ্ধ পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল; ঘরে ঘরে আলো জ্বাল, সুরাপাত্রে মদিরা ঢাল। আজি বাসন্তী পঞ্চমী; মলয় বহিয়াছে, কুহুস্বর শোনা গিয়াছে, বাগ্বাদিনী বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন, অর্দ্ধ ভূমণ্ডল সেই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইতেছে। আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমা, মদনের মহোৎসবদিন। গোপীসখা সেই মহোৎসবে যোগ দিয়াছেন। আজি বহ্ন্যুৎসবের দিন; আকাশে ধূপ উৎক্ষেপ কর। ফাগ কই, রঙ কই, নরনারী যে হোলিরঙ্গে মাতিয়াছে।

দিনের পর রাত্রি; রাত্রির পর দিন। জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য; কিন্তু মৃত্যু হয় আবার জন্মের জন্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। মনুষ্য, চিন্তা করিও না; প্রকৃতির এই বিধান; প্রকৃতির উপাসনা কর। প্রকৃতি তোমাদের জননী; প্রকৃতিজননী তোমাদের জন্য আত্মোৎসর্গ-পরায়ণা। বিশ্বসৃষ্টি এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞে সহস্রশীর্ষা পুরুষ আত্মোৎ-সর্গ করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পশু কল্পনা করিয়া সেই যজ্ঞে

আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার শীর্ষ হইতে দ্যুলোক, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, পদদ্বয় হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন, দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছিলেন। দক্ষকন্যা যজ্ঞে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার শবদেহ স্কন্ধে লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিন্ন অঙ্গ পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। তিনি হৈমবতী উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মানবের জন্য অসাইরিস তাইফনের হস্তে জীবন দিয়াছিলেন। তিনিও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মের পুরস্কার, পাপের তিরস্কার, আজিও তাঁহাব করায়ত্ত। আত্মোৎসর্গ বিনা যজ্ঞ হয় না; যজমান যজ্ঞে আপনাকে পশুরূপে উৎসর্গ করেন; যজ্ঞে তিনি আত্মনিষ্ক্রয়স্বরূপে পশু বধ করেন। যজ্ঞের বধ বধ নহে। মানবের পাপপ্রক্ষালনের জন্য বলির প্রয়োজন। বিধাতা নিজ পুত্রকে বলিস্বরূপ ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রক্তে মানববংশ পবিত্র হইয়াছে; মানবের পাপরাশি ধুইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর তিনি উঠিয়াছিলেন। শেষের সেই দিনে তিনি পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিবেন। অতএব বলিদানের আবশ্যকতা। শুনঃশেপের কাহিনী মনে আছে? আইফিজিনিয়ার কথা মনে আছে? জেফথার দুহিতার কথা কি মনে নাই?

মরণের রহস্য সকলের উপর। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? জীয়ন্তে কি সেখানে যাওয়া যায় না? সে পুরী কোথায়? বৈতরণীর অপর পারে, বালটিক সাগরের অপর পারে। জাহ্নবী-নীরে প্রিয়তমের ভস্মরাশি ভাসাইয়া দাও; দেহখানি ভেলায় চাপাইয়া আগুন ধরাইয়া বালটিকের জলে ভাসাইয়া দাও। হয়ত সেই পুরীতে পৌছিতে পারে।

শোভাময়ী শরৎ উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর মত বনস্থলী আলো

করিয়া বিচরণ করে। কোথা হইতে দারুণ শীত আসিয়া সুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। জননী বসুন্ধরা কাঁদিতে থাকেন। জননী তাঁহার নন্দিনীর শোকে বিষাদের কুজ্ঝটি-কায় মুখ ঢাকিয়া, সর্ব্বত্র তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান। সুন্দরী পার্সি-ফনী সহচরীপরিবৃতা হইয়া বনে বনে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ ধরাতল বিদীর্ণ হইল। ভূগর্ভ হইতে কোন্ অদৃশ্য পুরুষের হস্ত উঠিয়া কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সখীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। পৃথিবীমাতা হাহাকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষী ছিলেন চন্দ্রমা,—তাঁহার তমসাবৃত গুহার মধ্য হইতে; সাক্ষী ছিলেন সূর্য্য,—তাঁহার সুদূর নির্জ্জন শিবিরাবাসে। জননী পৃথিবী কন্যা-শোকে জলে স্থলে কাননে আলো হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্ধান দিলেন। অধোভুবনে দেবরাজ তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। জননী দীমীতীর ক্রোধ করিলেন। সংসার হইতে লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিলেন। গাছে আর ফুল হয় না; ভূমি আর শস্য দেয় না; জীবকুল নিরানন্দ হইল। দেবরাজ ভীত হইলেন। মাতার হস্তে কন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই অবধি বৎসরের মধ্যে আট মাস কন্যা মায়ের নিকট থাকে; চারি মাস অধো-ভুবনে দেবরাজের নিকট বাস করে। চারি মাস পৃথিবী শ্রীহারা হইয়া কাঁদে; আট মাস পৃথিবী শ্রীযুতা হইয়া হাসে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দীমীতীর কন্যা পাইয়াছিলেন। এমনি করিয়া দেবী আইসিস্ স্বামী অসাইরিস্কে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। সহজে কি তিনি স্বামী পাইয়াছিলেন? আইসিস্কেও তাঁহার অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সাবিত্রী সতীও সত্যবান্কে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনেন; সেও কি সহজে? তিনি ভর্ত্তৃবিনা সুখ প্রার্থনা করেন নাই, ভর্ত্তৃবিনা তিনি দ্যুলোক প্রার্থনা

করেন নাই। ঋষির শাপে দেবগণ লক্ষ্মী হারাইয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণ তাঁহার উদ্ধার করেন। লক্ষ্মী অমৃতভাণ্ড হাতে লইয়া উঠিয়াছিলেন। অমৃতের সহিত হলাহলও উঠিয়াছিল।

বালডার মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করিতেছেন? সহজে কি তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন? যে যেখানে আছ, রোদন কর; বনের পশু, গাছের পাখী, তরুলতা, যে যেখানে আছ, রোদন কর। মাটি ফাটিয়া শোকাশ্রুর উৎস উঠিতেছে; বালডারের জন্য নির্জীব শিলা দ্রবীভূত হইতেছে।

যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম, তাহারা কোথায় আছে, কে জানে? কোন্ আঁধার পুরে তাহারা বসতি করিতেছে; আঁধারে কি তাহারা পথ চিনিতে পারিবে? হাতে হাতে মশাল ধর। ঘরে ঘরে আলো জাল। আজি কার্ত্তিকী অমাবাস্যা; প্রিয়গণ গন্তব্য পথ চিনিতে পারিবে না; দীপমালায় অন্ধকার বিনষ্ট কর। গঙ্গাস্রোতে দীপগুলি ছাড়িয়া দাও। স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাক্। প্রেতপুরুষগণ তাহা ধরিয়া লইবেন। ব্যোমবহ্নি ঊর্দ্ধমুখে ছাড়িয়া দাও। যমলোক ত্যাগ করিয়া যাঁহারা মহালয়ে আসিয়াছেন, তাহারা উজ্জ্বলজ্যোতি ব্যোমবহ্নির সাহায্যে পথ চিনিয়া লউন।

শুধু শোক করিলে যে যায়, সে কি ফিরিয়া আসে? মৃত্যুর উপরে যে-রহস্যের আবরণ আছে, তাহা উন্মোচন করিতে হইবে। সে বড় দুর্ভেদ্য রহস্য। বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে; তবে মরণতত্ত্ব জানিবে। যদি মরণতত্ত্ব জানিতে চাও, নিজে অমৃত পান কর। ঋষিগণ সোমপান করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন। সোমলতা হইতে অমৃত নিষ্কাশন কর; দ্রাক্ষালতা হইতে অমৃতরস বাহির কর। গৌড়ী-পৈষ্টীও অভাবে চলিতে পারিবে। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিবে, বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইবে, আবরণ অপসৃত হইবে, রহস্যের উচ্ছেদ হইবে। ইহার নাম গুপ্ত

বিদ্যা ; এই বিদ্যালাভে যথাবিধি দীক্ষা চাই। যে সে ইহাতে অধিকারী নহে। দীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ নাই ; ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম। সাবধান, অনধিকারী যেন এখানে প্রবেশলাভ না করে। পশু যেন বীরত্বের প্রয়াসী না হয়।

শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া, ঢাকঢোল বাজাইয়া, নৃত্যগীত-উৎসব হাসি-কান্না দ্বারা দেবীর উপাসনা কর। ধূপধূনা জ্বালাও ; পশুরক্তে, নররক্তে, মহীতল সিক্ত কর ; তাহাতে দেবীর তৃপ্তি হইতে পারে। প্রাচীন ফিনিশিয়ায় দেবতার তর্পণ কিরূপে হইত? স্বয়ং এল দেব জগতের হিতের জন্য আপন পুত্রের কণ্ঠশোণিতে মহীতল সিক্ত করিয়াছিলেন। ফিনিকেরা তাহা জানিত ; যখনই কোন দৈবী অথবা মানুষী আপৎ আপতিত হইয়া স্বদেশের জন্য আশঙ্কা জন্মাইত, তখনই পিতা আপন পুত্র আনিয়া দিত, মাতা আপন কন্যা আনিয়া দিত। নরকণ্ঠনিঃসৃত তপ্তশোণিতে দেবীর তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা হইত। কিন্তু তাহাতেও বুঝি মহাদেবীর তৃপ্তিলাভ ঘটিত না। তিনি অন্যবিধ বলি উপহার চাহিতেন। সে উপহার বীভৎস।

গুপ্তবিদ্যায় যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া অনধিকারীর চক্ষু হইতে সাধনাকে গুপ্ত রাখেন। সেই দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়োজন নাই। গুপ্ত সাধনা গুপ্ত থাকুক। ফিনিকেরা এষ্টার্টির মন্দিরে যাহা অনুষ্ঠান করিত, সাইপ্রস্ দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী সাগরফেনোদ্ভবা আফ্রুজিৎ দেবীর উপাসনায় যাহা অনুষ্ঠিত হইত, পার্সিফনীর বিরহবিধুরা দীমীতীরের শোকবার্ত্তার স্মরণার্থ সমগ্র আথেন্স ইলিউসিসে সমবেত হইয়া অষ্টাহ ব্যাপিয়া যে অনুষ্ঠান করিত, বৌদ্ধবিহারমধ্যে আর্য্য তারা ও অনবদ্যাঙ্গী প্রজ্ঞাপারমিতার উপাসনার্থ সমবেত ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা মানবের ইতিহাসে অতীত ঘটনা নহে। এখনও অন্তঃ-

স্রোতস্বিনী ফল্গুধারার মত, নরসমাজে সেই স্রোত বহিয়া আসিতেছে ; কবে তাহার গতি রুদ্ধ হইবে জানি না। তবে শুষ্ক বালুকা উৎখাত করিয়া সেই প্রবাহের আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিপূজার মন্দিরদ্বার অর্গলরুদ্ধ রহুক।

প্রকৃতি

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.
প্রণীত

সূচী

সৌরজগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—হর্ম্মান্ হেলমহোলৎজ—ক্লিফোর্ডের কীট—প্রাচীন জ্যোতিষ—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ, দ্বিতীয় প্রস্তাব—আর্য্যজাতি—প্রলয়।

(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।)

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভারতী

বৈশাখ, ১৩০৪

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত)

বঙ্কিম বাবু তাঁহার কোন এক লেখায়—যতদূর মনে পড়িতেছে কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনীর ভূমিকায়—বলিয়াছেন, একদিন তাঁহারা গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, একজন মাঝি জলের উপর দিয়া গাহিয়া যাইতেছিল—

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।

মাতৃভাষার এই সরল সহজ গানটি শুনিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ ভক্তি-রসে উথলিয়া উঠিয়াছিল—এমন ইংরাজি কিম্বা আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চতর মহত্তর ভাবযুক্ত কবিতাতে হয় নাই।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক এইরূপ।—প্রকৃতিতে যে সকল প্রাকৃতিকজ্ঞানের কথা আছে তাহা কিছু নূতন কথা নহে; পাশ্চাত্যজ্ঞানের সারসঙ্কলনমাত্র। এ সকল তত্ত্বের সহিত অল্পবিস্তর পরিমাণে ইতিপূর্ব্বেই যে আমাদের আলাপ পরিচয় না হইয়াছে এমন বলিতে পারি না। অথচ সেই সব কথাই এই বইখানিতে পড়িতে যত-খানি আনন্দ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিলাম, এমন পূর্ব্বে করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কারণ আর কিছু নহে—কেবল ভাষার গুণে। বিদেশীয় ভাষায় এ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে যে শ্রম যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, ইহাতে সে ক্লেশ নাই সে শ্রম নাই; আছে শুধু জ্ঞানলাভের আনন্দ—আর কাব্যপাঠের মুগ্ধতা। বস্তুতঃই প্রকৃতি পড়িতে এতই ভাল লাগে যে ভুলিয়া যাইতে হয় ইহা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—মনে হয় যেন কাব্যপাঠ করিতেছি। লেখক ভূমিকায় হতাশভাবে বলিয়াছেন "বাঙ্গালা-ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্য সাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।। কিন্তু আমরা অস-ঙ্কোচে বলিতেছি—ইহা যদি অসাধ্য সাধন হয় ত তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। জগৎ-অভিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আলোক, তাড়িত-

তরঙ্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগূঢ় কঠোর তত্ত্ব সকল বাঙ্গালা ভাষায় যে এমন সংক্ষেপে অথচ জলের মত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যায়, এ বইখানি না পড়িলে তাহা ধারণা করা যায় না। লেখকের ভাষার সরলতা ও প্রকাশসৌন্দর্য্য দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি একস্থানে আক্ষেপ করিয়াছেন "দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গ-সাহিত্য; অন্যদেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে—এদেশে তাহা বর্ণনারও উপায় নাই।" একথা অস্বীকার করিবার নহে—কিন্তু প্রকৃতির ভাষা দেখিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আশা হয় যে লেখকের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ বিজ্ঞান প্রচার উদ্যমে জীবন উৎসর্গ করেন—তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নে বঙ্গভাষার এ কলঙ্ক একদিন মোচন হইবে, বিজ্ঞানের কোন কথা কহিতেই তখন আর শব্দের অভাব হইবে না। * *

এত অল্পদিনের শিক্ষাতেই আমরা যে এখনি জগদীশ বাবুর মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাই, ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নহে; এবং রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর মত কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিককে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করিতে দেখিতে পাই—ইহাও আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। জগদীশ বাবু আমাদের গৌরবভাজন—কেননা তাঁহার প্রতিভা দূরবিস্তৃত—তাঁহার কার্য্য জগৎ সম্পর্কে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর নিকট বঙ্গবাসী ঋণী অধিক,—কেননা তাঁহার কৃত উপকার কেবল আমাদিগতেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্য জগৎ বহুকষ্টে এ কয় শতাব্দী ধরিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা যতক্ষণ সাধারণভাবে আমাদের দেশের আয়ত্তীভূত না হইবে, ততক্ষণ তাহারি ধারাবাহিক উন্নতি স্রোতের নব নব সূক্ষ্মলহরী দেখিয়া দিব্য দৃষ্টি সে পাইবে কোথা হইতে? সুতরাং বিজ্ঞান চর্চ্চার এই প্রথম যুগে যাঁহারা দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করেন—এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন, তাঁহারা আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন; এবং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রকৃতির প্রকৃত সমালোচনা। প্রবন্ধগুলির বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র—কেননা আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নির্ব্বাচন কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, বঙ্গবাসীর প্রকৃতিতে বিজ্ঞানের প্রতি প্রীতিকারিতা বৃদ্ধির

পক্ষে ইহা যথেষ্ট অনুকূল,—জ্ঞানলাভ ছাড়া ইহাতে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কল্পনারও যথেষ্ট অবসর আছে। প্রলয়, মৃত্যু, ক্লিফোর্ডের কীট, জ্ঞানের সীমানা, প্রকৃতির মূর্ত্তি—প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে মস্তিষ্কের স্থূলাবরণ পর্য্যন্ত সহসা যেন অনুভূতিময় হইয়া পড়ে, তাহাতে জ্ঞানের তরঙ্গ কল্পনাবর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন দিব্য চিন্তা দিব্য দর্শন সৃজিত করে—সে অপূর্ব্ব ভাব আশা বিস্ময় জ্ঞান কল্পনার সমবায় চিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাইসম্যানের থিওরি সম্বন্ধে আমাদের মনের চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। * * *

সাহিত্য

পৌষ, ১৩০০

(শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত)

অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "প্রকৃতি" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, এই কথা শুনিলে অনেকেই আমাদিগকে উপহাস করিতে ছাড়িবেন না, তাহা জানি। তাই প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, আমরা বাস্তবিক তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসি নাই; কিন্তু পুস্তকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে বলিয়া সমালোচনা নামে গুণবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি;—তবে, যদি অল্প বিস্তর মতভেদ ঘটে, তাহাও এই অবসরে বলিয়া লইব।

এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া সম্প্রতি স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হওয়াতে, বিজ্ঞান-পিপাসুমাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবে। রামেন্দ্র বাবু যেরূপ বিজ্ঞানবিশারদ, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে যে এরূপ প্রবন্ধ সকল প্রসূত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই। আমরা ইহাতেই আশ্চর্য্য যে, তিনি ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সেই সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের "দীনা বঙ্গভাষায়" এত সরল ও সরস ভাবে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ সুমিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

বঙ্গভাষায় অল্পই আছে, এ কথা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া তবে লিখিয়াছেন; এবং এই কারণেই সেগুলি এত প্রাঞ্জল ও সরস হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবু প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি এত প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্বগুলির বিষয় কিছু জানেন শোনেন, তাঁহারাই এই পুস্তকে তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসা বহুল পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিয়া রামেন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রবন্ধগুলি যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিক, অপরদিকে তেমনি কবিত্ব-পূর্ণ। বোধ হয়, এই বিষয় আমি ঘোষণা না করিলেও গ্রন্থের নামেই পাঠকগণের নিকট সুব্যক্ত হইবে। "প্রকৃতি" নাম এক দিকে কঠোর বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণ-গৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়, অপর দিকে মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল হস্তের সাক্ষীস্বরূপ এই অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত, অনন্ত আকাশে বিধৃত, এই শোভনসুন্দর জগতের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাঁহার প্রবন্ধগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি আবার নানাবিষয়ক। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে এক দিকে তিনি যেমন সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, প্রাচীন জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে লিপিকুশলতা প্রদর্শন করাইয়াছেন, অপর দিকে পৃথিবীর বয়স, ক্লিফোর্ডের কীট, মৃত্যু প্রভৃতির ব্যাখ্যাকালেও তাঁহার সিদ্ধহস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। লিপি-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে গবেষণার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার পরিশ্রমের ফলে অনেক নূতন তথ্য সহজে জানিতে পারিতেছি। * * *

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, রামেন্দ্র বাবুর এই পুস্তক খানি বিজ্ঞান-গ্রন্থ হইলেও নীরস হয় নাই, প্রত্যুত কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। এই কবিত্ব কেমন এক প্রকার ছায়াময় কবিত্ব, অতৃপ্তির কবিত্ব। সমস্ত পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির ভাব, আতঙ্কের ভাব দুঃস্বপ্নের মত বুকের উপর চাপিয়া নৃত্য করিতে চাহে। যখন তিনি শেষপ্রবন্ধে প্রলয়ের ভীষণ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত কথায় উপসংহার করিলেন—"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার

হুইবেল তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন, ভয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমণ্ডলী এক রকম একবাক্যে বলিতেছেন, ভরসাও নাই"—এ কথা পড়িয়া আমাদেরও কেমন এক আতঙ্ক আইসে, শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় মন শুকাইয়া যায়। আমাদের মনে হয় যে, তবে কেন বৃথা এত অধ্যয়ন অধ্যাপন, বৃথা অর্থচেষ্টা এবং বৃথায় এত স্বার্থত্যাগ। রামেন্দ্র বাবুও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় যেন এক প্রকার ছায়াময় আবরণের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে যেন কি একটা "ভরসা নাই" এর ভাব, সুতরাং অতৃপ্তির ভাব জাগিয়া আছে, এবং আমরাও তাহার অংশ পাইয়া চারিদিক আরও অন্ধকার দেখিবার উদ্যোগ করি—আমাদের সেই আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, অন্তরের কথা অন্তরেই থাকিয়া যায়। এই অতৃপ্তির ভাব, আমাদের বোধ হয়, কঠোর বিজ্ঞানালোচনার ফল। বিজ্ঞানরাজ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই আরও অধিক রাজ্য আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা হয়, সুতরাং অতৃপ্তি আসা স্বাভাবিক; এবং আমাদের ইহাও বোধ হয় যে, এই প্রকার অতৃপ্তির ভাব অন্ততঃ আংশিকরূপে না থাকিলে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য রাশি রাশি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা দুরূহ হইয়া উঠে।

উপসংহারে রামেন্দ্র বাবুর উপর আমাদের আশা ভরসার দুই চারিটি কথা বলিব। তিনি অবশ্য তাঁহার পুস্তকে আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্যদেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।" আমরা তাঁহার দুঃখের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমাদের কি ইহা কম আশার কথা যে, রামেন্দ্র বাবু প্রভৃতির ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আমাদের মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন? ইংরাজদিগের মধ্যে যদি হক্সলি স্পেন্সর প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিগণ ইংরাজি ভাষাকে এত সমুন্নত না করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহারা কিসের গৌরব করিতেন? তেমনি আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন বলিয়াই আমরা আজ গৌরব করিতেছি যে, ভারতের সকল ভাষার মধ্যে বঙ্গভাষা সমধিক পরিপুষ্ট। বিশেষতঃ 'আজ

কাল কয়েক ব্যক্তির প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসাহিত্যের মৌলিকতা ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সমধিক আশান্বিত হইতেছি। তন্মধ্যে পুনরায় উল্লেখ করিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবুর ন্যায় সিদ্ধহস্ত আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের কোন বিলাত-প্রত্যাগত সুবিদ্বান্ বন্ধু আমার সহিত এই বিষয়ের আলাপে বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্র বাবুর অনেকগুলি প্রবন্ধ নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরীর ন্যায় সাময়িক পত্রে হক্‌স্‌লি প্রভৃতির লিখিত প্রবন্ধগুলির সহিত সমান আসন প্রাপ্ত হইতে পারে।

দাসী

আগষ্ট ১৮৯৭

(সম্পাদক লিখিত)

প্রকৃতি—এই গ্রন্থখানিতে বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব সরল ভাষা ও ভাবের সমাবেশে অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে, অথচ সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে যাইয়া, মূলতত্ত্বের বিবৃতিকে কোথায়ও অঙ্গহীন করা হয় নাই। বলিতে কি—রামেন্দ্র বাবুর "প্রকৃতি"র সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম—এ সুধু প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির রম্য কানন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে এখানি কোন অংশে হীনতর নয়। যাঁহারা উপন্যাস পাঠে অতিশয় আগ্রহান্বিত, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—একবার তাঁহারা এই "প্রকৃতির" উপন্যাসখানি পড়িয়া দেখুন। তাঁহাদের মনে হইবে—যেন তাঁহারা কোন জ্ঞানপ্রবীণ ঋষিমূর্ত্তির নির্দ্দেশ অনুসারে হঠাৎ সংসার কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রকৃতির নিভৃত কক্ষ হইতে নিভৃততর, নিভৃততম নীরব গম্ভীর কক্ষে কক্ষে ভয়চকিত-নেত্রে প্রবেশ লাভ করিতেছেন, আর প্রকৃতির নিয়ম প্রবাহের গম্ভীর নাদে সৌন্দর্য্যে অলঙ্ঘ্য শক্তিমত্তায় ও মহিমায় প্লাবিত হইতেছেন। মানব জাতির নিকট এত দিন প্রকৃতি আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ধরা দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইতেছে।

তাঁহার পাশ্চাত্য ভক্তগণ, উপাসকগণ, তাঁহার গভীর রহস্য লীলার নিভৃত প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া কি কি রচনাপ্রণালী কি বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিয়াছেন, কি গভীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়াছেন, রামেন্দ্র বাবু ললিত ভাবে ও ভাষায়, তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। আমাদের বিশ্বাস—রামেন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় এবং বঙ্গীয় পাঠকদিগের রুচি ও প্রবৃত্তিতে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ জ্ঞানাভিমানরূপ বায়ু-বিকারে অতি অস্বাভাবিক রূপে স্ফীতোদর। এই বিষম রোগে, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে, ভয়ানক জ্ঞানাগ্নিমান্দ্য উপস্থিত। আমরা বিশ্বাস করি—রামেন্দ্র বাবুর "প্রকৃতি"র আশু ফলপ্রদ মহৌষধিসেবনে অচিরে এই অগ্নিমান্দ্য ও অভিমানবিকার প্রশমিত হইবে। * *

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

February 27, 1887.

The book contains thirteen carefully written essays on various scientific subjects traversing such diverse departments of science as astronomy, geology, physics, biology, &c. The author is a well known Professor of Science in one of the local colleges and is a most distinguished graduate of the Calcutta University and a Raichand Premchand Scholar. He seems to have a genuine love and admiration for European science and has attempted in the present volume to present to Bengali readers some of the master ideas of science in an attractive and interesting form. We find that to a rare knowledge and deep insight into various departments of science, the author adds a felicitous simplicity of style which enables him to popularize abstruse and recondite scientific ideas and make them acceptable to the general reader who has not the advantage of a previous scientific training. The book is unique of its kind in Bengali literature. It is true that we have in the language some elementary treatises in the simpler

branches of science, but we have nothing like an advanced handbook on any subject, not to speak of popular essays on miscellaneous scientific topics like the volume before us. We have much pleasure in commending the book to the notice of our readers.

THE INDIAN MIRROR.

April 17, 1897,

This is a collection of the writer's contributions to the pages of some of the Bengali monthly periodicals. The papers deal with astromony, geology, ethnology and a variety of other subjects and embody the results of the most recent investigation of European scientists on the themes discussed. The articles are written with remarkable lucidity and in a style that compels perusal. * *

THE BENGALEE.

September 4, 1897.

The public ought to be grateful to Babu Ramendra Sundar Trivedi for his *Prakriti*—a collection of philosophical and scientific essays. It is a work of its own kind. Never before in Bengali literature was there such a laudable and successful attempt made by any one to explain scientific theories in such a plain and lucid manner. The mode of treatment is superbly admirable, and bears unmistakable testimony to the author's thorough and masterly grasp of the subjects he has dealt with. Such a book as Babu Ramendrasundar Trivedi's deserves every possible encouragement, in as much as it is one of the most important scientific works we have come across in Bengali. We are quite sure that *Prakriti* will occupy a permanent place in the history of vernacular scientific literature.

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতি।—যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইহাতে বিজ্ঞান ও দর্শনের কতকগুলি নিগূঢ় তত্ত্ব বিশদ বাঙ্গালা ভাষায় এত সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে যে তজ্জন্য বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালি

সমাজ আপনার নিকট বিশেষ ঋণী, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ গ্রন্থপাঠে একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হয়। এরূপ গ্রন্থের প্রচার যত অধিক হয় ততই সুখের বিষয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি. এল.

•I cannot call to mind any other Bengali work of equal dimensions in which instruction and entertainment are so far mixed up as in Prof. Trivedi's প্রকৃতি। Being a solid and substantial scientific work, it at the same time ought to be as pleasant reading as any work of fiction. Of its scientific merit, I cannot presume to be a judge; but the unprecedentedly brilliant academic career of the author is a sufficient guarantee for it. *Its language has a peculiar charm* ; the author rather suggests than beats out a thought ;—a charm which according to certain eminent critics constitutes *the special attribute of poetry* as distinguished from prose. *Besides this, a quiet humour pervades almost every line of the book*. These are merits discoverable by every one who with some care will read Prof. Trivedi's book ; it is needless to add how valuable an addition it must be to our rather poor store of readable Bengali books. I only trust his contribution to his literature of the country will not prove too good for his ordinary readers.

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ. বি. এল.

প্রকৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ ইতি পূর্ব্বে পড়িয়াছি : দুইটি প্রবন্ধ সম্প্রতি পড়িলাম। 'প্রকৃতি' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব জিনিষ। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উচ্চতত্ত্ব সকল এরূপ সরল ও সরস ভাষায় ইতি-পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই। 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়া আপনি বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আপনার লেখার যখন সমালোচনা করিতেছি, তখন আর একটা কথা বলিয়া লই। আপনার লেখায় কিছু materialistic tendency

দেখিতে পাই। ইহা বোধ হয় অত্যধিক বিজ্ঞান আলোচনার ফল। আপনার প্রতিভায় ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা সম্মিলিত হইলে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়। এই সংযোগ দেখিবার জন্য আমার হৃদয় লালায়িত। ইতি।

সময়

৩০এ মাঘ, ১৩০৪ সাল

প্রকৃতি।—এখানি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকুসুমের একটি সুন্দর গুচ্ছ। গুচ্ছকার মালী বিজ্ঞান-শৈলে আরোহণ করিয়া তজ্জাত বৃক্ষরাজির পুষ্প চয়ন করতঃ এই পুষ্পগুচ্ছ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। যোগ্য হইলেই যোগ্যতা প্রকাশ হইয়া পড়া অস্বাভাবিক নহে। এই পুষ্পগুচ্ছের সংগ্রহ ও সমাবেশে মালীর যোগ্যতা প্রকাশ হইয়াছে, এবং মালী যে একজন উত্তম কারিকর, তাহাও ইহার রচনা চাতুর্য্যে উপলব্ধি হয়। স্থূল বুদ্ধির লোকের বিশ্বাস, বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস; কিন্তু বিজ্ঞানামোদী লোকে বিজ্ঞানে কত রস পান, তাহা অন্যে কি প্রকারে জানিবে? আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা বিজ্ঞানের স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহারা রামেন্দ্র বাবুর "প্রকৃতি" পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, বিজ্ঞান সরস কি নীরস, বিজ্ঞান মিষ্ট কি তিক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নভেল নাটক অপেক্ষা কতগুণ অধিক আমোদপ্রদ ও শিক্ষাবাহক। বঙ্গীয়-সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট পুস্তক অতি আদরের সন্দেহ নাই। "প্রকৃতি" মধ্যে এক স্থলে রামেন্দ্র বাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গ-সাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এদেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।" যে অভাব অনুভব করিয়া রামেন্দ্র বাবু এই আক্ষেপ করিয়াছেন, সে অভাব মোচন করিবার [illegible] চেষ্টা করিলে আমরা সুখী হইব। তিনি ঐ অভাব মোচন করিবার অযোগ্য ব্যক্তি নহেন।
